দেবতা ও আরাধনা।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

পঞ্চম সংস্করণ।

শ্রীহরিদাস বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩২ সাল।

নিবেদন।

মানুষকে যত প্রকার শক্তি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে হয়, সে সমস্তই দৈবীশক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন,—তিনি নিজে কি? চৈতন্য পুরুষ। চৈতন্য পুরুষই কেন্দ্র;—ঐ কেন্দ্রতেই উহাদিগকে একত্রিত করিতেছেন। তারপরে খুব প্রবল তরঙ্গাকারে উহাদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছেন। এইরূপ যিনি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। শক্তিকে স্ববশে আনা—শক্তির দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া লওয়াই মানুষের কাজ। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আরাধনার প্রয়োজন। তাই হিন্দুর দেবতা ও আরাধনা।

দেবতা অসীম, শক্তি অসীম—সাধনা অনন্ত। মানুষের ক্ষুদ্র শক্তিতে এই সমস্ত শক্তির আলোচনা-আন্দোলন ও তত্ত্ব নিরূপণ করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্ত নহে। তবে দেবতা ও আরাধনার মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মন্ত্রের স্বর-কম্পন, ভাব ও তত্ত্বেরও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, ব্যাপার অতীব গুরুতর। ইহাতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র; তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক কোন পথহারা ব্যক্তির যদি এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে, দেবতা ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

অনন্তপুর।
২৩শে মাঘ ১৩১৪ বঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দেবতা ও আরাধনা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্দেহের কথা।

শিষ্য। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া, কত যুগ-যুগান্তর হইতে হিন্দুধর্ম্ম তাহার বিমল-স্নিগ্ধ-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে,—কত অতীত কাল হইতে এই ধর্ম্মের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধন-রহস্য উদ্ভেদ হইতেছে, কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ, তর্কবিতর্কাদি করিয়াছেন, কিন্তু এই ধর্ম্ম এখনও কি অসম্পূর্ণ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে?

গুরু। এ প্রশ্ন কেন?

শিষ্য। বর্ত্তমান যুগের সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দৃপ্ত-ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক,—জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

গুরু। হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়া জড়বৎ হইয়াছে, কাজেই হিন্দু জড়োপাসক হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে,—নতুবা যে সকল ধর্ম্মের অস্থি মজ্জায় পৌত্তলিকতা, সেই সকল ধর্ম্মযাজকগণ হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে! যাহাদের ধর্ম্ম এখনও খঞ্জ বালকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান-সম্মত। হিন্দুধর্ম্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। আশা করি, অতি-অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের অমল-ধবল কৌমুদীতে সমগ্র দেশের, সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি উদ্ভাসিত এবং প্রফুল্লিত হইবে। সকলেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইবে।

শিষ্য। হিন্দু জড়োপাসক,—হিন্দু পৌত্তলিক; অনেকেই একথা বলিয়া থাকে।

গুরু। হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে পারে না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকে।

শিষ্য। হিন্দু, খড় দড়ী মাটী রং ও অভ্র রাংতা দিয়া ছবি প্রস্তুত করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহারই পূজা করিয়া থাকে।

গুরু। তাহাতে কি দোষ হয়?

শিষ্য। সেই যে পুতুল প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয়, তাহার কি কোন ক্ষমতা আছে? আমরাই তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকি,—আমরাই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া থাকি,—আমরাই তাহার কর্ত্তা। তাহার কোন জ্ঞান নাই,—কোন শক্তি নাই,—তবে তাহার পূজা বা আরাধনা করিবার উদ্দেশ্য কি? তৎপরে অগ্নি, জল, বাতাস, দিক্ ও কাল প্রভৃতি

জড় পদার্থের পূজাতেও আমরা শরীর পাত করিয়া থাকি। কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ, ঐ সকল ব্যাপারে ব্যয় করিয়া থাকি। অধিকন্তু, মূঢ় বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া অগ্নিপূজারূপ যজ্ঞকার্য্যাদি করিয়া অগ্নি, জল, মেঘ, আকাশ, বায়ু, এমন কি, আধিব্যাধি মহামারী প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এ সকল আমাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও কুসংস্কার; তাহা হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন।

গুরু। তুমি যদি হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্দু যাহা করে, তাহার একবিন্দুও কুসংস্কার বা মিথ্যা নহে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার ত্রিসীমায় পঁহুছিতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের বড় বিলম্ব। হিন্দুধর্ম্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ,—ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর; জানিতে পারিবে, তোমাদের জড় বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য দেশের অথবা অস্মদ্দেশের হিন্দুধর্ম্ম-নিন্দুকগণ সুশিক্ষিত ও সজ্জন হইলেও তাঁহাদিগের দৃষ্টি, চিরপ্ররূঢ় সংস্কারের শাসনে স্থূল গঠিত জড় প্রাচীরের পর পারে যাইতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা জানেন না যে, এই অতি বিচিত্রতাময় সৃষ্টি-রাজ্যের সীমা কোথায়? তাঁহারা জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝেন না বলিয়াই, হিন্দুকে জড়োপাসক বলিয়া থাকেন।

শিষ্য। আমাদের শাস্ত্রে তেত্রিশকোটী দেবতার কথা আছে,—তাহা কি সত্য? যথার্থই কি দেবতা আছেন?

গুরু। দেবতা নাই? ধর্ম্ম নাই? তবে আছে কি?

শিষ্য। দেবতারা কোথায় থাকেন?

গুরু। স্বর্গে।

শিষ্য। স্বর্গ কোথায়?

গুরু। সূক্ষ্মের রাজ্যে।

শিষ্য। সে কোথায়?

গুরু। তাহা বলিবার আগে, তোমাকে অন্য কতকগুলি বিষয় জানিতে ও শিখিতে হইবে, নতুবা বুঝিতে পারিবে কেন ?

শিষ্য। দেবতাগণ থাকেন স্বর্গে, আমরা থাকি মর্ত্ত্যে,—এখান হইতে আমরা মন্ত্রাদি পাঠ করি, আর তাঁহারা সেখান হইতে কার্য্য করেন কেমন করিয়া ? আমাদের কথা কি তাঁহারা শুনিতে পান ?

গুরু। এ সকল বিষয় তোমাদের বোধগম্য হয় না, কাজেই বিশ্বাসও কর না। ভারতের পুরাতনকালের ঋষিগণ বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, আরও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এত দিন পরে এখন বলিতেছেন,—এমন হইতে পারে।* বায়ুর কম্পনে চিন্তা শক্তি দূর হইতে বহুদূরে গিয়া পঁহুছে। আমেরিকা হইতে ভারতে সংবাদ পাঠাও—টেলিগ্রাফের তার নাই থাকুক,—কোন যন্ত্র-শক্তির সাহায্য নাই থাকুক, চিন্তাশক্তি সেখানে যাইয়া পঁহুছিবে। দেবতায় চিন্তাশক্তি আরোপণ করিলে, দেবতার দ্বারা কার্য্য করাইয়া লওয়া যায় ; কিন্তু সে সকল জানিবার আগে, তোমাকে বুঝিতে হইবে, দেবতা কি, স্বর্গ কি,—মানুষ কি, মর্ত্ত্য কি। ইহা না বুঝিলে, কেমন করিয়া দেবশক্তি বুঝিতে পারিবে ? কেমন করিয়া দেব-শক্তি-বশীকরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া তাঁহাদের দ্বারায় আপন অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে হয়,—এ সকল বুঝিতে পারিবে না। অতএব, সর্ব্বাগ্রে সেই বিষয়ের একটু আলোচনা করিতে হইবে। ভরসা করি, তুমি সমাহিত চিত্তে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্বালোচনায় যত্নবান্ হইবে।

* Eather vibrations have power and attributes abundantly equal to any demand—even the transmission of thought.—Sir William Crookes.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকট ভাব।

শিষ্য। সর্ব্বাগ্রে আমাকে দেবতা কি, তাহাই বুঝাইয়া বলুন। তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। দেবতা কি, তাহা বলিতে হইলেই আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনাও একটু করিতে হইবে। এ বিষয় তোমাকে পূর্ব্বে বিস্তৃত-রূপেই বলিয়াছি, * বোধ হয়, তাহা তোমার স্মরণ-পথারূঢ়ই আছে। তথাপিও সংক্ষিপ্তরূপে এস্থলেও তাহার একটু উল্লেখ করিতে হইতেছে।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্ব্বত বল, জল বায়ু অগ্নি যাহাই কিছু বল,—সমস্তই ব্রহ্ম। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্ত তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥

পঞ্চদশী।

"এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে নামরূপাদি বিবর্জ্জিত কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। আর এখনও তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সেই ভাবেই অবস্থিত আছেন।"

শিষ্য। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। সৃষ্টির আগে নামরূপবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম ছিলেন, এবং এখনও সেই ভাবে আছেন,—

* মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" নামক পুস্তকে।

একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ ব্রহ্মই ত মায়াদ্বারা অন্বিত হইয়া জগদ্রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। একথা ত আপনারই নিকটে শ্রুত হইয়াছি। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মহদাদি অণু পর্য্যন্ত, যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ব্রহ্ম। ভাগবতেও পাঠ করা গিয়াছে,—

"এই বিশ্ব, ভগবান্ নারায়ণে অবস্থিত করিয়াছে, সেই ভগবান্ সৃষ্টি কার্য্যাদির জন্য মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া বহু গুণান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং অগুণ হইয়া আছেন।" †

গুরু। আমি পূর্ব্বে সেইরূপ কথাই বলিয়াছি। তবে একটু বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বটুকু এই যে, বিশ্ব, ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্ম, বিশ্বে পরিবর্ত্তিত; একথা যদি বলা যায়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব থাকে না। ঘটাদির মুখ্য কারণ মৃত্তিকাদি যেমন ঘটত্বে পরিণত হইলে মৃত্তিকাত্ব থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম যদি জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনাতে এই দেদীপ্যমান জগতের প্রকাশ করেন; তাহা হইলে, তিনি আপনি বিশ্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন, বুঝিতে হইবে। যদি ব্রহ্মের এই পরিবর্ত্তন নিত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব থাকে না,—একেবারে তিনি গিয়া জগৎ হন; প্রলয়ে বিশ্বসমুদয়ের সহিত তিনিও লয় প্রাপ্ত হয়েন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকের অনুবাদ পাঠ করিলে, তাহাতেও ঐকথাই আছে—"তিনি অগুণ হইয়া আছেন।"

শিষ্য। কোন পদার্থই স্বভাবে থাকিয়া অপর পদার্থের উৎপত্তি করিতে পারে না। সমস্তই ক্রমবিবর্ত্তনে (Evolution) অন্বিত হয়। ফুলের কুঁড়ি শতদলে পরিণত হইয়া সৌরভ-সৌন্দর্য্যে জগৎ মাতায়।

† শ্রীমদ্ভাগবত, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৩১ শ্লোঃ, অনুবাদ।

আবার ফলের সৃষ্টি করিয়া ফুল মরিয়া যায়। ব্রহ্ম, স্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া, কি প্রকারে বিশ্বের বিকাশ করিলেন।

গুরু। ব্রহ্ম কি কোন দ্রব্য? দ্রব্য-ধর্ম্মত্ব তাঁহাতে নাই। নাই বলিয়াই, জড়-বিজ্ঞান তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারে যে, যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পরে আরও কিছু থাকিল,—আলোচনার শেষ হইল, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের শেষ হইল না। যাহা খুঁজিয়াছি—তাহা পাই নাই; কিন্তু খোঁজা শেষ হইয়া গিয়াছে। এত খুঁজিয়া খুঁজিয়া জড় বই আর কিছুই পাইলাম না; কিন্তু শেষ মিটিল না। যে অন্ধকার লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়া ফিরিয়া গেলাম।

ইহার কারণ এই যে, যে বস্তু খুঁজিতে হইবে, তাহার মত দর্শন-শক্তির আবশ্যক হইবে। ব্রহ্মবস্তু-তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, ব্রহ্ম-তত্ত্বের সত্ত্বা-সম্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। যোগী ভিন্ন তাহা সম্ভবে না।

ব্রহ্ম নামরূপবিবর্জ্জিত। তিনি কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার শক্তি কাহারও নাই। কেহ তাহা অনুভবও করিতে পারে না। বেদান্ত বলেন,—"তিনি সকলের শুধু, সকলি তাঁহার।" কিন্তু সেই তিনি যে কেমন তাহা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি অবাঙ্-মনসগোচর।

পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার একথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন,—"শেষ রহস্য যেমন, তদ্রূপই থাকিয়া গেল। জৈবনিক কূট প্রশ্নাবলীর মীমাংসা হইল না, কেবল মাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করা হইল। আকাশব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত ভৌতিক পদার্থ কোথা হইতে আসিল, নেবুলার মত উহার প্রকৃত কারণ দেখাইতে পারে না। যৌগিক পদার্থ ও বিক্ষিপ্ত পদার্থের কারণ নির্দ্দেশ করা সমান ভাবেই আবশ্যক। একটি পরমাণুর উৎপত্তি সেইরূপ রহস্যময়, যেরূপ একটি গ্রহের উৎপত্তি রহস্যময়। প্রকৃত কথা বলিতে

তিনি নির্গুণ অবস্থায় থাকিয়া সগুণাবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেমন করিয়া করেন, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

"উর্ণনাভ যেমন স্বশরীরাভ্যন্তর হইতে তন্তু বাহির করিয়া আবার পুনরায় গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধি জন্মে, জীবিত মানুষ হইতে যেমন কেশলোম উদ্গত হয়, তেমনি সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুদয় ক্ষর বা বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে।

তিনি কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ সমাবৃণোৎ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

"উর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন আপন শরীর হইতে সূত্র বাহির করিয়া আপনার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, পরমাত্মা তদ্রূপ স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বের বিকাশ করিয়া তদ্দ্বারা আপনি আচ্ছন্ন অর্থাৎ আবৃত হইয়া আছেন।"

কি আমি যাহা লিখিলাম—তাহা হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের উচ্ছেদ হইল না, অধিকন্তু উহাকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া ফেলিলাম।" ইহার ইংরাজিটুকু এই—

"The ultimate mystery continues as ever. The problem of existence is not solved, it is simply removed further back. The Nebular hypothesis throws no light on the origin of diffused matter and diffused matter as much needs accounting for as the concrete matter. The genesis of an atom is not easier to conceive than the genesis of a planet. Nay, indeed so far from making the universe a less mystery than before it makes it a greater mystery.

"আমি বহু হইব" অথবা "বিশ্ব রচনা করিব" ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলেই তিনি প্রকট চৈতন্য হইলেন ও সেই বাসনা মূলাতীতা মূলপ্রকৃতি হইলেন। এই মূলপ্রকৃতিরূপিণী আদ্যাশক্তিই জগতের আদিকারণ,—কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রা। সূর্য্য যেমন আপনতেজে নিজ হইতে স্থূলরূপ জল প্রকাশ করেন, এবং সূক্ষ্মভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ব্রহ্ম তটস্থ হইয়া ঈশ্বর রূপে চৈতন্যের আকর হইলেন। তাঁহার শক্তির ভাব বাসনা, তাঁহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে বাসনা নাই অর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্ব্বাধার রূপে বর্ত্তমান। ইহা বুঝিতে হইলে, যোগ-শক্তি থাকিবার প্রয়োজন। ইহা তোমার আমার মত বদ্ধ জীবের না বুঝিলেও চলিতে পারে। ব্যক্তজীব, অব্যক্তের ভাব লইয়া কি করিবে? আর বুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমাদের সম্মুখে অহো-রাত্র যে অণু সকল ঝিলিমিলি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের স্থূলচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না,—পাই না এই জন্য যে, তাহাদিগের রূপের অনুরূপ চক্ষুর সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ আমাদিগের নাই ;—বিকাশ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইব।

গুণ অতিশয় সূক্ষ্মতম পদার্থ,—কাজেই আগে সূক্ষ্মের রাজত্ব, সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের বিকাশ হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"হে নারদ! যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, এই ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মক বিরাটরূপী বিশ্বপ্রকাশ হইয়াছে,—তিনিই ঈশ্বর। সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াও সকল হইতে অতিক্রান্ত ভাবে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন, ঈশ্বরও সেই প্রকার এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী দ্রব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অতিক্রান্ত ভাবে রহিয়াছেন।" শ্রীমদ্ভাগবত, ২য়। ৬ষ্ঠ। ২৩ শ্লোঃ। অঃ।

কাল, চৈতন্য, সদসদাত্মিকাশক্তি—ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও

মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের প্রকাশ হয়। ঐ তিনগুণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ঐ অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদির প্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ-চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড বলে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। তদনন্তর ঈশ্বর স্বরূপ-চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে ও বিশ্বে এইমাত্র প্রভেদ। ঈশ্বরের কারণাবস্থার পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্য্যাবস্থার পরিণতির নাম বিশ্ব। সূর্য্য যেমন সকলের প্রকাশক, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি সত্ত্বে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন; ঈশ্বরও তদ্রূপ আপনার শক্তিসমূহ হইতে বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রকাশ হইয়া স্বরূপে আপনাতে রহিয়াছেন;—

এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখনই প্রকট অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর হইলেন। আর জগতের উপাদান কারণ হইলেন প্রকৃতি। অব্যক্ত সৃষ্টিবীজ ব্রহ্ম-সত্ত্বে নিহিত ছিল,—সেই বীজ হইতে বিশ্বের বিকাশ হয়, এ কথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। *

* An entire history of any thing must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible. Be it a single object or the whole universe, any account which begins with it in a concrete form, is incomplete; since there remains an era of its knowalbe. existence undescribed and unexplained"—H. Spencer.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আদ্যাশক্তি।

গুরু। আমি ইতঃপূর্ব্বে পুরুষ ও প্রকৃতি কি, কিপ্রকারে তাঁহারা সৃষ্টি কার্য্য করিয়া থাকেন, কিপ্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি হয়,—সে সমুদয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, বর্ত্তমানে কেবল দেবতা কি এবং কি প্রকার আরাধনায় তাঁহাদিগকে স্ববশে আনিয়া সাধন সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই বলিব; ইহা তুমি স্মরণ রাখিও। যেহেতু সে সকল বিষয়ের যখন একবার মীমাংসা করা হইয়াছে, তখন আর তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল নহে,—কেননা, একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে গেলে, অনেক সময় নষ্ট হইয়া থাকে। *

শিষ্য। আমি পুনরায় আর সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপেই স্মরণ রাখিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি যে পুরুষ ও প্রকৃতির কথা বলিলেন, সেই প্রকৃতিই কি আদ্যাশক্তি মহামায়া?

গুরু। বোধ হয়, তোমার বুঝিতে বাকি নাই যে, ব্রহ্ম যখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম,—আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা বা বাসনা-শক্তিই প্রকৃতি বা

---

* এই গ্রন্থ পাঠ করিবার আগে, মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" নামক পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে ভাল হয়। তাহাতে প্রলয় হইতে জীব-সৃষ্টি কাল পর্য্যন্ত বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সে গুলি না বুঝিলে, এ সকল কথা বুঝিতে গোল বা সন্দেহ হইতে পারে।

আদ্যাশক্তি মহামায়া। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ সংসারে তদুভয় বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর হইলেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ সমন্বিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহ সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ত্রিগুণ বিশিষ্ট। দৃশ্য অথচ নির্গুণ, এপ্রকার বস্তু জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না;—পরম প্রকৃতি-রূপিণী মহামায়া সৃজনাদির সময় সগুণা, আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্য্যরূপ হয়েন না। তিনি যখন কারণরূপিণী হয়েন, তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষসন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাহেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নির্গুণা হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্দ-স্পর্শাদি গুণসমুদয় দিবারাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না। অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি পরাহন্তারূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই সেই পরাহন্তা সৎপদার্থরূপিণী; বিচারতত্ত্ব-নিপুণপণ্ডিতগণ সেই পরাহন্তারূপা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব প্রকৃতিই জগতের কারণ,—অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য্য; প্রকৃতি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরাহন্তা

(সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব) হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ। পরন্তু মহত্তত্বজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এই পঞ্চ তন্মাত্রের সাত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং রজসাংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চ ভূতের মিলিত সাত্বিক অংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরুষ সনাতন কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন।—এই প্রপঞ্চ সমুদয়ের কারণ প্রকট পুরুষ এবং মায়া বা আত্মাশক্তি কার্য্য।

কিন্তু, এই আত্মাশক্তি কি প্রকার, তাহা বুঝিবার বা তাঁহার স্বরূপতত্ব জানিবার শক্তি সাধারণ মানবের নাই। জড়শক্তি তত্বে যত পাণ্ডিত্যই থাকুক, জড়াতীত জ্ঞান-শক্তির বিশিষ্ট উন্নতি না হইলে, কেহই এই মূলপ্রকৃতি মহাশক্তির তত্ব অবগত হইতে পারে না। তোমাদের পাশ্চাত্যজড়বিজ্ঞানের গুরু হার্ব্বাটস্পেন্সার কঠোর জড়শক্তির সাধনাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর জড় আছে, ততদূর আলোচনা করিয়াছেন—কিন্তু সে যে কি, তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "জড়ও শক্তি, তাহা বুঝিয়াছি,—কিন্তু শক্তি কি তাহা বুঝি নাই"। * না বুঝিবারই কথা, যোগিগণের ধ্যান ধারণা ব্যতীত এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পুরুষ-প্রকৃতির সন্ধান মিলে না।

---

* Supposing him (the man of science) in every case able to resolve the appearances, properties and movements of things into manifestations of Force in Space and time; he still finds that force, Space and Time pass all understanding......First principles. page. 66

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পঞ্চীকরণ।

শিষ্য। গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদয়ের স্বরূপগত প্রকারভেদ, গুণত্রয়ের লক্ষণ এবং পঞ্চীকরণ আমাকে একবার বিশদ করিয়া বলুন।

গুরু। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ইচ্ছাজনিকাশক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকাশক্তি এবং তামসের অর্থজনিকাশক্তি জানিবে। তামসাহ-ঙ্কার সম্বন্ধিনী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ, এই সূক্ষ্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদিরূপ কার্য্যজনিকাশক্তি বিশিষ্ট হয়; পরে, পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে, দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুবৃত্তি যুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু—এই সমুদয় মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলে। এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ কারণ-সংজ্ঞক ইন্দ্রিয় সকল, আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি বলে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনী-

কুমারদ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ মন ইহাই সাত্ত্বিকী সৃষ্টি!

পূর্ব্বে যে সূক্ষ্ম ভূতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়াদ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পঞ্চীকরণ কি তাহা বলিতেছি,—

মনে কর, উদক নামক ভূত সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রস-তন্মাত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারিভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে। এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃ রূপে চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে 'আমিই পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ, এইরূপ তাদাত্ম্য ভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয়। আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণদ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বায়ুতে দুই, এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে আকাশের এক শব্দ-গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের মিলন-প্রক্রিয়া-দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ [illegible] হইয়াছে।

শিষ্য। এইরূপ পঞ্চীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল?

গুরু। না,—ইহারা পরস্পর কম্পনাভিঘাতে এইরূপ হইয়াছিল; আর মূলে সেই পরমা প্রকৃতি ছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে,—

ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।

ছন্দের দ্বারা এই বিশ্ব-রূপ প্রকাশ। ছন্দইত স্বর-কম্পন। বেদেও উক্ত হইয়াছে—

'পৃথিবী ছন্দঃ। অন্তরিক্ষং ছন্দঃ। দ্যৌশ্ছন্দঃ। নক্ষত্রাণি ছন্দঃ। বাক্ ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। গৌশ্ছন্দঃ। অজা ছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ।'—শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কৃষি, গরু, ছাগল, অশ্ব এ সমুদয় আর কি? ছন্দ বা স্পন্দন ভিন্ন আর ত কিছুই নহে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, স্বর-কম্পন—"হংস" ইহাই ত জীবাত্মা। শ্বাস বহির্গত হইবার সময় হং; আর যখন স্পন্দিত দেহে প্রবেশ করে—তখন সঃ। মানব হইতে সমস্ত পদার্থেই এই স্বর-কম্পন। স্বর-কম্পনরোধ হইলেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আবার গঠিয়া নূতন স্বর-কম্পনের আশ্রয়ীভূত হয়।

স্পন্দনবাদ দ্বারা সৃষ্টি-রহস্য সহজেই বুঝা যাইবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে স্পন্দনবাদদ্বারাই সৃষ্টি-রহস্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কুম্ভকার যষ্টিদ্বারা তাহার কুলালচক্রকে বেগে কাঁপাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা মৃত্তিকাদিকে ঘট সরাবে পরিণত করে। কুলালচক্রের অতিরিক্ত কম্পন-কালে বোধ হয় যেন তাহা ঘুরিতেছে—কিন্তু বস্তুতঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থামিয়া আসিবার সময় দেখিবে, তাহা কাঁপিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ অতি-শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার

এবং এতদ্দ্বারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। এবং ইহার উপরেই ধর্ম্মতত্ত্বকে সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ প্রসব করিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও জননী হইতেছেন মহামায়া। কিন্তু মায়ার আবার দেবত্ব কি? মায়ার আবার আরাধনা কি? মায়া ত মিথ্যা।

গুরু। মহামায়ার দেবত্ব নাই,—কিন্তু দেবতার উপরেও তিনি। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরি, হর এবং ব্রহ্মারও জননী তিনি,—তিনিই পরব্রহ্মের বাসনা বা চিচ্ছক্তি।

মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি, সর্ব্বমিদং রক্ষতি, সর্ব্বমিদং সংহরতি; তস্মাৎ মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ। য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি, স পাপ্মানং তরতি, সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে॥

তাপনীয়শ্রুতি।

"এই নরসিংহ-শক্তিরূপিণী মহামায়াই এই সমুদয় বিশ্বজগতের সৃষ্টি,

* The vibratory theory explains all the various potencies of creation. In fact, I believe it to be the key that unlocks the great secret of nature. It explains the nature of love, hate friendship, light, heat, electricity, chemical combination, mesmerism and in short, every thing when properly understood.—The Religion of the Stars, page. 34.

পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব সাধকের এই মহতী মায়াশক্তিকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই মায়াশক্তি জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন।"

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া, সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ।

"হে দেবি। তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনন্তবীর্য্যরূপিণী মহাশক্তি, তুমিই এই বিশ্বের কারণস্বরূপা; তুমিই মহামায়া, এই সমুদয় সংসার তোমারই মায়াতে বিমোহিত।"

শিষ্য। অনেকে বলেন, ঐ যে মায়াশক্তি, তাহা জড়মায়া স্বরূপা বৈষ্ণবীশক্তি।

গুরু। তাহা নহে।

অথাতোঽধ্যোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামোঽথ য়েনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণী-মাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধিশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্বমোহিনীতি।

ভুবনেশ্বরী উপনিষৎ।

"হে সৌম্যগণ। তোমরা যখন সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছ, তখন আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সেই পরম সগুণ-নির্গুণাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ বলিব। যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয়ন্ত্রী সেই বিশ্ববিমোহিনী স্বরূপতঃ তুরীয়চৈতন্যরূপিণী। অতএব সেই ব্রহ্মরূপা তোমাদের এই দেহ মধ্যেই বিরাজ করেন, এজন্য এই শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে।"

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্॥

সূত সংহিতা।

"অতএব, সংসারনাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষিমাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জ্জিত আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে।"

পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা।
সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগদ্‌ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনি॥

স্কন্দপুরাণ।

"চিদাত্মাতে যে এই জগতের ভ্রান্তি হয়, তদ্বিষয়ে সেই সচ্চিদানন্দ-রূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠান স্বরূপা জানিবে।"

এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
সর্ব্ব-বেদান্ত-বেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥
পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জ্জিতম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥

কূর্ম্ম পুরাণ।

"হে বিপ্রগণ! দেবীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবিদৃঋষিগণকর্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বত্রগামী নিজ কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ, কেবল যোগিগণই তাঁহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। প্রকৃতি-পরিলীন অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ দেবীর সেই পরাৎপর তত্ত্ব পরমপদ যোগিগণই নিজ হৃদয়-কমল-মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। হে মহর্ষিবৃন্দ! দেবীর সেই অতীব নির্ম্মল সতত বিশুদ্ধ সর্ব্বদীনতাতিদোষ-বর্জ্জিত নির্গুণ নিরঞ্জন ভাব কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয়; একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই সেই পরমধাম দর্শন করিয়া থাকেন।"

নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ॥

দেবীভাগবত।

"হে মুনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদিমনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সংসারআসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণভাব, আর বাসনা-বর্জ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণভাব সমাশ্রয়পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন।'

চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থাচিদেকরসরূপিণী।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

"চিতি, এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক, অতএব তিনি এক মাত্র চিদানন্দস্বরূপা।"

এতাবৎ তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহাতে তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ, ত্রিগুণপ্রসবিনী সনাতনী মহামায়া প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এবং হরি-হরাদি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিষ্য। তাহা স্মরণ আছে, কিন্তু এখনও আমার কথা আছে। কথাটা এই;—আপনি পূর্ব্বে বলিলেন, নিরুপাধিক নির্গুণব্রহ্মের সৃষ্টির বাসনাই মায়া বা আদিশক্তি;—কিন্তু এক্ষণে শাস্ত্রের যে সকল প্রমাণ শুনাইলেন, তাহাতে একেবারে সেই মহামায়াকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া গেলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। নির্গুণব্রহ্ম, আর মায়া একত্বসম্পাদক বাক্যার্থ; তাই ঐরূপ বুঝাইয়াছে;—কিন্তু ফলে দোষ হয় নাই। বিশেষতঃ বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—মায়া মিথ্যা,—কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায়া কল্পিত হইয়া থাকে। কাজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার

পৃথক্ সত্তার প্রতীতি হয় না। তবে এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানভূত সত্তারূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম-উপাসনাস্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া, যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার আরাধনা করিলেই পরব্রহ্ম সত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে। ফল কথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া, কেবল মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু, কেবল মায়ার আশ্রয় নাই। তিনি ব্রহ্মেরই আশ্রিতা।

পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা।

"যেমন অগ্নির উষ্ণতা, কিরণমালীর কিরণমালা, নিশাকান্ত হিমাংশুর জ্যোৎস্না প্রভৃতি স্বভাবশক্তি, সেইরূপ সেই পরাৎপরা পরমাশক্তি শিবময় পরব্রহ্মের স্বভাবশক্তি।"

স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে।
পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কলা॥

"যেমন কোন লোক নিজ পদদ্বারা নিজমস্তকের ছায়া লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে, প্রতিপদনিক্ষেপেই মস্তকছায়ার বিদ্যমানতা থাকে না, তদ্রূপ এই বিন্দু সম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না।"

চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিৎ নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা॥
সদাকারা সদানন্দা সংসারচ্ছেদকারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥

"হে দ্বিজোত্তমগণ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অনু প্রবিষ্ট যে সদ্রূপা সদানন্দময়ী সংসার-উচ্ছেদকারিণী কল্পনাদি বিরহিতা স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তি, সেই পরমদেবীই পরমশিবরূপিণী।"

শিষ্য। আরও একটি দুর্ব্বোধ্য কথা আছে।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণে যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল,—মায়া নির্গুণ পরব্রহ্মেরই শক্তি। কিন্তু প্রকট বা সগুণ ঈশ্বরই পুরুষ এবং প্রকৃতিই তাঁহার শক্তি; ইহা আগে বলিয়াছেন,—এইরূপ উভয় প্রকার কথাতে আমার ভ্রম জন্মিতেছে।

গুরু। ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না বলিয়াই কথা গুলায় গোলযোগ লাগিয়া থাকে। কাষ্ঠখণ্ডে আগুন আছে, কিন্তু যতক্ষণ সে অগ্নি বাহির না হয়, ততক্ষণ কাঠ,—কাঠ কিন্তু ঘর্ষণেই হউক, আর অন্যবিধ কারণেই হউক, যেই কাঠ জ্বলিয়া উঠে, সেই সে আগুন। মায়াশক্তি ব্রহ্মে আছে—কিন্তু স্তিমিত ভাবে, যেই মায়াশক্তির বিকাশ হয়, সেইতিনি প্রকট।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। প্রকট হইলেন কি ব্রহ্ম?

গুরু। হইলেন, কিন্তু স্বরূপে থাকিয়া।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ব্রহ্ম বস্তু বুঝিবার উপায় নাই। তুমি এখন সেই চিৎঘন প্রকট ঈশ্বর, আর চিচ্ছক্তি মহামায়াকে জানিয়া রাখ। জীবের ইহার অধিক বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়া সাংখ্যকার কপিলদেব এই পর্য্যন্তই খুঁজিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ত্রি-গুণ।

গুরু। আমি তোমাকে যে আদ্যাশক্তি মূলা প্রকৃতির কথা বলিলাম, তাহা অব্যক্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা। মানুষ উহা ধারণাও করিতে পারে না, মানুষের নিকট উহা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত। স্ত্রী-অণু যেমন পুংঅণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া স্থূল প্রকৃতিতে পরিণত হয়। জড় বিজ্ঞানের মতে জড় পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ যে প্রকার জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, মূলপ্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণামবিকার এবং বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তুমি স্মরণ রাখিও—এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা প্রকৃতি আর স্থূলা প্রকৃতি পৃথক্। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্টা) এতদ্ভিন্ন আমার আর একটী জীব স্বরূপ পরা (উৎকৃষ্টা চেতনময়ী) প্রকৃতি আছে; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

আমি তোমাকে এই পরা প্রকৃতির কথা বলিলাম,—এবং ইহাই

বলিয়াছি যে, পরা প্রকৃতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে অপরা প্রকৃতি হয়েন।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"হে ভারত! মহৎপ্রকৃতি আমার গর্ভাধান-স্থান, আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি সমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা।"

প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড যখন কারণার্ণবে প্লাবিত, ভগবান্ সমস্ত পদার্থের কর্ম্মবীজ বা জীব-বীজ নিজ অঙ্গে সংহৃত করিয়া, সেই কারণ-বারিতে শায়িত থাকেন, তখন এই পরা প্রকৃতিও নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং উহার গুণও ক্ষোভিত হয় না, কাজেই পরিণামও প্রাপ্ত হয় না। সে সময়ে ঐ গুণ স্পন্দন রহিত ও মৃতবৎ থাকে। তৎপরে, সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন পুরুষের তেজ, মূল প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, তখনই উহার গুণক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রম বিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।

ঐ মূল প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই তিন গুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এক কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একট ঈশ্বরের তিনটি গুণ-বিভাগ। ঈশ্বরকে

জানিতে হইলে ঐ দেবতাত্রয়কেই জানিতে হইবে। তিনগুণকে না জানিতে পারিলে, সগুণ অর্থাৎ পূর্ণ গুণাভিষিক্ত ঈশ্বরকে জানিবে কি প্রকারে? পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে অনেক লোকেও এই ত্রিগুণের ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার ও সাধনা করেন। তাঁহারাও বলেন, পরব্রহ্ম অনন্ত, এই হেতু তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—তিনি সতত প্রকাশশীল এবং পরিবর্ত্তনশীল এজন্য ত্রিমূর্ত্তিধারী।"

খৃষ্টিয়ানগণও ঈশ্বরের এই ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার করেন। যদিও তাঁহাদের ধর্ম্ম দর্শন-বিজ্ঞানের নিকট যুক্তি দেখাইতে হইলেই অবনত-মস্তক হয়, তথাপি এই গুণত্রয়ের ত্রিমূর্ত্তি তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা, পিতা পরমেশ্বর (God The Father) পুত্র পরমেশ্বর (God The Son) এবং কপোতেশ্বর (Holy Ghost) বলিয়া ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির আভাস প্রকাশ করেন। জ্ঞান-প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম্মেও বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তির কথা আছে। ফলতঃ যিনি যে ভাবেই বলুন, মূলে ঈশ্বরের বিকাশিত গুণের স্বতন্ত্র পূর্ণভাবময় শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ ত্রিমূর্ত্তি। স্মরণ রাখিও—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি,—ঈশ্বরই।

The Deity is one, because it is infinite. It is triple, because it is ever manifesting Secret Doctrine.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রি-শক্তি।

গুরু। ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্য-মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর হয়েন, সেই ভাবকে শক্তি কহে। স্বতঃ বাসনা চৈতন্যাদি কাল ও সত্তের সহিত মিলনে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্তু বলা যাইতে পারে। এক ব্রহ্মই অবস্থাভেদে বস্তু ও শক্তি এই দ্বিবিধ ব্যক্ত ভাবে পরিণত। শক্তি, উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, বস্তুকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই মিশ্রচৈতন্য ভাবকে মায়া বলে। ঐ মায়া দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ শক্তিগত মায়া। অপরাংশ বস্তুগত মায়া। বস্তুগত মায়া পুরুষ এবং শক্তিগত মায়া প্রকৃতি। এই সহযোগে পুরুষ কার্য্যপর হইয়া জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—কার্য্য জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ ঈশ্বরের তিনটী গুণ তিনটি শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"হে নারদ! সেই ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধারী হইতেছেন,—তাঁহাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি (ব্রহ্মা) সৃজন করিতেছি, হর তাঁহার বশীভূত হইয়া সকল বস্তু হরণ করিতেছেন এবং বিষ্ণু বিশ্ব পালন করিতেছেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় স্কঃ। ৬ষ্ঠ অঃ। ৩২ শ্লোঃ।

উপরে ভাগবতের যে শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ বলা হইল, তাহাতেই সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বুঝিতে পারিবে। সগুণ ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধারী। ত্রি-শক্তি আছে যাঁর, তিনিই ত্রি-শক্তিধারী। কাল, চৈতন্য ও সৎ এই তিনটি নিত্য চৈতন্যময় বস্তুর ক্রিয়াপর অবস্থাই তিনটি শক্তি।

দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটি মায়ার শক্তি। সেই ত্রি-শক্তি মিশ্রিত হইয়া মায়া নামে একটি চৈতন্যাংশের প্রকাশ হইয়া থাকে।

যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে চৈতন্য-প্রবাহ বস্ত সংগ্রহ করিয়া জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতেছেন, তিনি চৈতন্যময় স্বভাব পুরুষ বা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কি পদার্থ, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ?

সগুণ ঈশ্বর বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মবশ্ব করণের নাম পালন। ঈশ্বর পরম চৈতন্যাবস্থা হইতে জীব বা আত্মা-রূপে মায়া-মধ্যগত হইয়া মায়ার সকল বিভূতিকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আত্মবশ রাখিয়াছেন; এই পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু। বোধ হয়, বিষ্ণু কি, তাহাও বুঝিয়াছ।

সগুণ ঈশ্বর হইতে কাল ও অহঙ্কার শক্তির এবং চৈতন্যপ্রবাহিকা শক্তির প্রকাশ হইয়া এই জগৎ সুনিয়মে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কালই হর বা শিব নামে খ্যাত। কার হরণকার্য্য করিয়া থাকেন। সম্মিলিত সমষ্টি হইতে অভীষ্ট ভাগের উদ্ধারকে হরণ কহে। মনে কর, দশ (১০) হইতে পাঁচ (৫) উদ্ধার করিতে হইলে দুইটী (২) পাঁচ প্রকাশ হইলে, পূর্ণ দশ (১০) সংখ্যার লয় হয়। সেই প্রকার সৎ ও চৈতন্য মিশ্রণাবস্থাকে কাল, ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্যরূপী জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্য ও সৎকে প্রয়োজন মতে অংশ করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন।

শিষ্য। ঈশ্বরের এই ত্রিগুণ শক্তি, ঈশ্বরের বশীভূত হইয়াই কি কার্য্য করিয়া থাকেন?

গুরু। তুমি লিখিতে জান, গান গাহিতে জান, শাস্ত্রপাঠ করিতে জান,—ঐ তিনটি তোমার গুণ বা শক্তি। উহারা কি তোমার বশী-ভূত থাকিয়া কার্য্য করে না? কোষাধ্যক্ষ যেরূপ কোষের বশীভূত—

তদ্রূপ ইহারা ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বরের সগুণ ভাব না পাইলে, কাহারও ক্ষমতা নাই যে, কার্য্যপর হয়।

ঈশ্বরের উপাধি অমূর্ত্ত মহামায়া; সেই মহামায়া কেবল ত্রিগুণময়ী-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি-পুঞ্জীকৃতা। সেই আদ্যাশক্তিই সৃজন, পালন ও লয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কিঞ্চিৎ স্থূল যে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাই দান করেন। তাহা লইয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব স্ব স্ব কার্য্য করেন। ক্রম বিকাশেই শক্তির বিকাশ—বিবর্ত্তবাদেই প্রকৃতির প্রকাশ। ধীরে ধীরে প্রকৃতির ক্রিয়া হয়,—ইহা তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে এই গুণত্রয়ে শক্তিদান ও সূক্ষ্মতাত্ত্বিক আলোচনা সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহারই বঙ্গানুবাদ আমি তোমাকে শুনাইতেছি,—

"সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে (ব্রহ্মাকে) মধুর বাক্যে এইরূপ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্বভাব, এবং আমাদের কোন ভেদ নাই। যে পুরুষ, সেই আমি, এবং যে আমি, সেই পুরুষ। তবে যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিভ্রমকেই তাহার কারণ বলিয়া জানিবে। যে সাধক, আমাদের উভয়ের (পুরুষ ও প্রকৃতির) ভেদ বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্যতঃ ভেদ মাত্র, এইটি যাহার অনুভূত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন, তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনি দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র দীপ উপাধি যোগে দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধি যোগে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয়। হে ব্রহ্মন্! অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবেই উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া সমস্ত প্রপঞ্চ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিংশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মবস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে, ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্মবশে উচ্ছূন হইয়া থাকে, সেই জন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর কর্ম্মবীজ যুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর-পত্র-পুষ্প-ফলাদির ন্যায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অনুস্যূত থাকেন; অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয়, ব্রহ্মবস্তুরও তত প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন, এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। পদ্মাসন। একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টিকালেই বুদ্ধিদ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। পদ্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই স্ত্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা।

* * * পরমেষ্ঠিন্! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদয়ই সকর্ত্তৃত্ব কারণ জন্য জানিবে; কিন্তু অহঙ্কার, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়। এইরূপে

মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সর্ব্বপ্রকার ভেদ মাত্র; তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, তদনন্তর অন্যান্য সমস্ত ভূতবর্গ,—এইরূপে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় যথাকালে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে থাক।

ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী, রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বর-ধারিণী, দিব্যভূষণে ভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, সরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রিয়া-সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অত্যুত্তমা ললনা তোমার প্রিয় সহচরী হইবেন; ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে, কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইঁহার সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর। প্রলয়ে ভূত সকল জীব ও কর্ম্মসমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে, তুমি যথাকালে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও। কাল কর্ম্ম স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণসমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি ও শব্দাদি গুণ সমস্ত-দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যেরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার যেরূপ ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ স্বভাবভূত গুণ, সেইরূপে তুমি তাহাদিগকে ফলপ্রদান করিও।" *

তদনন্তর, মহাদেবী বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"বিষ্ণো! এই মনোরমা লক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণরূপিণী সততই তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। তোমার বিহারের নিমিত্তই এই সর্ব্বার্থপ্রদায়িনী লক্ষ্মীকে তোমাকে অর্পণ করিলাম।" †

তৎপরে শিবকে সম্বোধন করিয়া মহামায়া বলিলেন;—"হে হর!

---

* শ্রীমদ্দেবী ভাগবত; ৩ স্কঃ ৬ অঃ।

† শ্রীমদ্দেবী ভাগবত; ৩ স্কঃ ৬ অঃ।

এই মহাশ্যামরূপিণী মনোরমা কালীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করিয়া, তাহাতে ইহার সহিত মহাসুখে বিহার কর।"

"দেবতাদিগের জীবন ধারণের জন্য আমি যজ্ঞক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি, পরন্তু, তোমরা তিনজনে সর্ব্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তোমরা এই তিনজন আমার তিনটি গুণসম্ভূত দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারে মাননীয় ও পূজনীয় হইবে, সন্দেহ নাই। যে মূঢ়বুদ্ধি মানব, তোমাদের ভেদ কল্পনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে; সন্দেহ নাই।" ‡

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ব্রহ্মা ও সরস্বতী।

শিষ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি অমূর্ত্ত গুণ,—ইঁহাদিগের আবার বিহারার্থ একটি করিয়া স্ত্রী হইল কেন?

গুরু। মূর্খ! তাঁহারা কি স্ত্রী?—শক্তি। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, সৃষ্টিকার্য্যের শক্তির নাম সরস্বতী। বিষ্ণু পালন করিবেন, সেই পালন শক্তির নাম লক্ষ্মী। শিব বা মহাকাল সংহার করিবেন, মহাকালের সংহার-শক্তি কালী।

শিষ্য। তবে তাহা মহামায়া প্রদান করিলেন কেন?

গুরু। কে দিবে?

শিষ্য। গুণের সহজাত শক্তি, সুতরাং গুণ হইলে তাহার শক্তি ত সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে।

---

‡ শ্রীমদ্দেবী ভাগবতঃ ৩ স্কঃ ৬ অঃ।

গুরু। তাহা নহে; বালক জন্মিয়াই বেদপাঠ করিতে পারে না বা হাটিয়া যাইতে পারে না; গুণ অব্যক্ত বীজের ন্যায় তাহাতে থাকে, কিন্তু ক্রমে শক্তির সাহায্যে তাহার স্ফূর্ত্তি পায়। আর যখনকার কথা হইতেছে, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রারম্ভের কালে কিছুই ছিল না, গুণ ও শক্তির সেই নব বিকাশ। ঐ গুণত্রয় এবং শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্তলোকের সৃজন, পালন ও লয় সংঘটিত হইতেছে। ঐ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম গুণ ও শক্তিত্রয় ক্রমে স্থূল হইতে আমাদের স্থূলতর জগৎ পর্য্যন্ত আসিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ শোভা পাইতেছে।

পরমাণু, তন্মাত্র এবং বিন্দু ইহা লইয়াই জগৎ। পরমাণুকেই গুণ বলা যায়। আর অহঙ্কারতত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র-সাকল্যে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিন্দু, শব্দব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশবীজ। ফলে বিনাশই একার্থ বাচক এবং বিনাশই নিত্য সূক্ষ্ম শক্তিব্যঞ্জক।

শিষ্য। আমার কথার উত্তর না করিয়া, কতকগুলি অতিশয় দুর্ব্বোধ্য কথা শুনাইয়া দিলেন।

গুরু। তোমার কথার উত্তর দিব বলিয়াই ঐ কথাগুলার অবতারণা করিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি অমূর্ত্তগুণ—তাঁহারা আবার আমাদের মত এক একটি গৃহিণী কাড়িলেন কেন? উঁহারা স্ত্রী নহেন,—সূক্ষ্ম শক্তি। মহামায়া গুণগুলিকে শক্তি-সমন্বিত করিয়া একটু স্থূল করিলেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি হইলেন, সরস্বতী। সরস্বতী নাদ-রূপিণী—শব্দ ব্রহ্ম; সরস্বতী সেই শব্দ ব্রহ্ম চিদংশ বীজ।

পরম ব্যোমে (স্থিতা), একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী এবং সহস্রাক্ষরা হইতে প্রবৃত্তা সে গৌরীদেবতা সলিলসমূহ তক্ষণ করতঃ (জগৎ) নির্ম্মাণ করিতেছেন। ঋগ্বেদ ৪১ ঋক্।

সায়নাচার্য্যের অর্থ—

"পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী সৃষ্টির উপক্রমে সলিল সদৃশ বর্ণ, পদ ও বাক্যসমূহকে সৃজন করিতে করিতে বহু শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কি প্রকারে? তাহাই বলিতেছেন,—প্রথমে প্রণব রূপ একপদ ব্রহ্মের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, তৎপরে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রীরূপ পাদদ্বয়, অনন্তর বেদচতুষ্টয়াত্মক পাদচতুষ্টয়, অনন্তর বেদাঙ্গ ষট্ ও পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই অষ্ট, তৎপরে মীমাংসা, ন্যায়, সাঙ্খ্য যোগ, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববেদের সৃষ্টিতে নবপাদ বিশিষ্টা এইরূপে বিবিধবাক্যসমূহের সৃজনকারিণী হইয়া অনন্ত হইয়াছে।

সাং—২য় [অধিদৈবত পক্ষে] শব্দ-ব্রহ্মাত্মিকা শুক্লবর্ণা সরস্বতী দেবী, স্বীয় শব্দসমূহের অভিধেয় সমস্ত জগৎ পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। কি প্রকারে? জলজন্তু সমস্ত এ জগৎকে স্ব-ব্যাপ্তির দ্বারা নানাবিধ করত [এক এক বস্তুর বহুতর নাম আছে; যথা—বৃক্ষ, মহীরুহ, শাখী ইত্যাদি। যদিও বৃক্ষ ও মহীরুহের প্রকৃতি প্রত্যয়ানুগত অবয়বার্থ কিঞ্চিদ্‌বিভিন্ন, কিন্তু দেশভেদে যে ভাষা-ভেদ শোনা যায়, তাহাতেও জানা যায় যে, এক এক পদার্থ বহুভাষায় বহুনামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] সেই সরস্বতী দেবী, অনন্তাকারা হইতে ইচ্ছা করিয়া ছন্দোভেদে একপদী প্রভৃতিরূপে বর্দ্ধনশীলা হইয়া জগৎ-কারণ পরব্রহ্মে আশ্রিতা রহিয়াছেন।

সাং—৩য় [অধিদৈবত পক্ষে] পরম ব্যোমরূপ অন্তরীক্ষে সমাশ্রিতা গৌরী দেবতা (বিদ্যুৎ সহচারিণী মেঘবাণী) এক পা, দুই পা, চারি পা, আট পা, নয় পা হইতে ক্রমে সহস্র পাদ পরিমিত স্থানে সলিলসমূহ সম্যক্ সম্পাদনপূর্ব্বক উদক ক্ষরণের হেতু হওত স্তনিতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

সাং—৪র্থ [অধ্যাত্মপক্ষে] পরম ব্যোমরূপ অস্মদাদির হৃদয়াকাশে সমাশ্রিতা, ধ্বনিস্বরূপা গৌরীদেবতা, একপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী, নবপদী হইয়া সহস্র সহস্র অক্ষর ব্যাপিয়া ঘটাদিবাচক পদসমূহ সম্যক্ সম্পাদনপূর্ব্বক শব্দাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

সায়নাচার্য্য আরও বলেন,—"একপদী—ধ্বনিমাত্র রূপে দ্বিপদী—সুবন্ত ও তিঙন্ত রূপ পাদদ্বয় বিশিষ্টা। চতুষ্পদী—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত রূপ পাদচতুষ্টয়যুক্তা। অষ্টাপদী—সপ্ত বিভক্তি ও সম্বোধন রূপ অষ্টপদান্বিতা। নবপদী—ঐ অষ্ট এবং অব্যয়রূপ নবপাদ সমন্বিতা।"*

এক্ষণে, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ,—ব্রহ্মাদিকে প্রকৃতিদেবী যে শক্তি দান করিয়াছেন, সেইশক্তি তাঁহাদিগের স্ত্রী নহেন। কার্য্য-করণাত্মিকা সূক্ষ্মতমা শক্তি। এই শক্তিদ্বারা তাঁহারা সৃজন পালন ও লয় করিতেছেন।

শিষ্য। পুরাণে পাঠ করিয়াছি, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ বলিবার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। পুরাণে রূপক। কিন্তু রূপকেরও একটা মূলতত্ত্ব আছে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জগৎ ব্রহ্মারই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। প্রথম, বিশুদ্ধ তুরীয় ভাব সমন্বিত অবস্থা; তৎপরে দ্বিতীয় ফলময় কারণ অবস্থা; তৃতীয়, কারণময় সূক্ষ্ম অবস্থা; চতুর্থ কার্য্যময় স্থূল অবস্থা। এই অবস্থাচতুষ্টয়ের কল্পনাতেই ব্রহ্মার চারি মুখের কল্পনা করা হইয়াছে। আরও ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী বাক্যের দেবতা,—বৈদিক মতে সেই বাক্য চারিভাগে বিভক্ত; যথা,—

"বাক্য, চারিপাদ পরিমিত অর্থাৎ চতুর্দ্ধা বিভক্তীকৃত। যাঁহারা মনীষী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তৎসমুদয়ই অবগত আছেন বস্তুতঃ তাঁহার তিন

---

* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্যকৃত বঙ্গানুবাদ।

গুহাতে নিহিত আছে, লক্ষিত হয় না। চতুর্থ মাত্র সাধারণ মনুষ্যে সকলেই বলে।"—ঋগ্বেদ, ৪৫ শ ঋক্। সমাধ্যায়ী-অনুবাদ।

এই হেতুতেও ব্রহ্মার চারি মুখের কল্পনা হইয়া থাকিবে।

নবম অধ্যায়।

—:*:—

স্পন্দন-বাদ।

শিষ্য। আদি পুরুষ ব্রহ্মা নাদ-শক্তিদ্বারা কিরূপে স্থূলতা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। বিষয় অত্যন্ত গুরুতর। খুব সাবধানে ইহার আলোচনা করিতে হইবে এবং যতদুর সরলে ও সহজে বুঝিতে পারা যায়,—তাহা করিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধুনত।

তৈঃ আঃ ১।২৩।

"সৃষ্টি করিব মনে করিয়া, তিনি শরীর কম্পিত করিলেন।"

কম্পনাৎ। বেদান্ত দর্শন, ১।৩।৩৯।

বেদান্ত দর্শনেও বলিয়াছেন, কম্পন হইতেই জগৎ জাত।

ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি। শতপথ ব্রাহ্মণ।

ছন্দই বিশ্ব।

মা ছন্দঃ। প্রমা ছন্দঃ। প্রতিমা ছন্দঃ। যজুর্ব্বেদ সংহিতা।

মা ছন্দ প্রমা ছন্দঃ এবং প্রতিমা ছন্দ—ইহা লইয়া যথাক্রমে ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্লোক বা স্বর্গ।

ছন্দের একটা গতি আছে। কিন্তু এই গতিরও একটা নির্দ্দিষ্ট

স্থিতি আছে—অর্থাৎ তাল আছে। সুর ও তালবিশিষ্ট বাক্যসমূহকে ছন্দ বলে। এই ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। কেন না, তিনিই বাগ্‌দেবী, অর্থাৎ বাক্য ও সুরের দেবতা।

বৈদিকমতে * বাক্য চারিপ্রকারে বিভক্ত। ঋষিগণ বলেন—ওঁকার একটি এবং তদ্বাদে মহাব্যাহৃতিত্রয়ে তিনটি, অর্থাৎ ভূঃ—পৃথিবীতে, ভুবঃ-অন্তরীক্ষে, এবং স্বঃ—স্বর্গে।

এখন কথা হইতেছে, এই স্থলে তোমাকে বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, নাদ ব্রহ্ম। এবং ছন্দে সপ্তলোকই অধ্যাসিত ; পরে একথা পুনরায় পাড়িতে হইবে।

তোমার ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণও এই স্পন্দনবাদ লইয়া খুব আন্দোলন-আলোচনা করিতেছেন। হার্বাট, স্পেন্সার রিচ্‌মণ্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পন্দনবাদ বা স্বর-কম্পন লইয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া—উহা যে জগতের অন্যতম সূক্ষ্মশক্তি তাহা স্বীকার করিতেছেন।

এই স্বর-কম্পনই আমাদের মন্ত্রবাদের মূলাত্মিকা শক্তি, তাহা সেই স্থলেই তোমাকে বুঝাইব।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।

গুরু। বিশ্বের পালনকর্ত্তা-বিষ্ণু বা সত্ত্ব গুণ এবং সেই গুণশক্তি ত্রিভুবন পালনকর্ত্রী লক্ষ্মী। এই অনন্তসত্ত্বা, পুরাণে সহস্রশীর্ষধারী

---

* ঋগ্বেদ, ৪৫শ ঋক্।

নারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্রহ্মের তিন প্রধান সত্তা জগৎ-ক্রিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ উপাদান কারণ, চিৎ নিমিত্ত কারণ এবং আনন্দ ভোগকর্ত্তা। ভোগাবস্থায় স্বরূপানুভব অর্থাৎ সকল চেষ্টা, যাহা আনন্দ নামে কীর্ত্তিত, তাহা চরিতার্থ করিতে নিমিত্তকারণের প্রয়োজন হয়;—উপাদানকারণ, নিমিত্তকারণের সাহায্যে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিতেজ, কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অন্নাদি প্রস্তুতের নিমিত্তকারণ হয়। সেই প্রকার, এই বিশ্ব কার্য্যরূপী উপাদানসমূহে প্রকাশার্থ চেষ্টা ও নিমিত্তই একমাত্র কারণ-চৈতন্য-সত্তা। সেই চিৎসত্তাই অনন্তশিরোধারী শেষশায়ী নারায়ণ বা বিষ্ণু। অনিশ্চিতগতি কাল-শক্তিকেই পুরাণে শেষ নাগ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষ্ণুর এই চারি হাত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাঁহার পদ। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক সর্ব্বাঙ্গ,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের আধার বলিয়া তাঁহার নাম অনন্তদেব এবং তিনি অনন্তশীর্ষাপুরুষ। দেবদেহে অহংকারের অর্থাৎ জীবাত্মার আশ্রয়দাতা হইয়া পঞ্চপ্রাণরূপী সর্পের আশ্রয়ে বিষ্ণু সংকর্ষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন।

সত্ত্ব গুণে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি।

আবির্ভাব-তিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে।—কৈয়ট।

আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরাল অবস্থাকে স্থিতি বলে। ব্রহ্মার রজোগুণ বা চৈতন্য-শক্তিতে বিশ্বের আবির্ভাব এবং শিবের তমোগুণ বা সংহরণ শক্তিতে বিশ্বের তিরোভাব, ইহার অন্তরালেই স্থিতি।

লক্ষ্মী দেবী এই স্থিতি বা পালন কার্য্যের শক্তি। লক্ষ্মী দেবী মহামায়া বা আদ্যাশক্তির বিক্ষেপ শক্তি। মহামায়ার দ্বিবিধ শক্তি * এক

* অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি। বেদান্তসার।

আবরণ শক্তি; অপর বিক্ষেপ শক্তি। যে শক্তিতে আত্মা কি, আমি কে, জানিতে দেয় না, তাহাই আবরণ শক্তি; আর যে শক্তিতে সৃষ্টি-সামর্থ্য বিদ্যমান, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি।

অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেই প্রকার আত্মবিষয়ক অজ্ঞান-আবৃত-আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা সেই প্রকার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বিক্ষেপ শক্তি বলে। এই বিক্ষেপ শক্তিই নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি করিয়াছে। *

লক্ষ্মীই শ্রী;—জগতে ভোগৈশ্বর্য্যের যে কিছু পদার্থ আছে, তাহাই লক্ষ্মী। সেই সৌন্দর্য্য-শোভাময় পদার্থই ত আমাদিগকে মিথ্যাজ্ঞানে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর সেই বিক্ষেপ শক্তিই ত স্থিতির হেতু। টাকা কড়ি বিষয় বিভব বাড়ী ঘর দুয়ার—ঐ বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই ত আমাদিগকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় মিথ্যাজ্ঞানে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। তিনি স্থিতিকারিণী। লক্ষ্মীই ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত বিহারে রত থাকিয়া আমাদিগকে ধনাদি দানে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই জগতে ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিতেছেন। তাই, ভগবান্ লক্ষ্মীবন্ত। তাই, যাহার টাকা আছে, ধন আছে, বিষয় বিভব আছে—ফলকথা যাহার বিক্ষেপ শক্তির যত অধিক বাঁধন আছে, তাহাকেই লোকে লক্ষ্মীবন্ত বলিয়া থাকে।

---

* এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেদিতি॥ বেদান্তসার।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

বিষ্ণুর পশুযোনি।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সৃষ্টিবিজ্ঞানের ব্রহ্মগুণ এবং তাঁহাদিগের হইতেই প্রাথমিক সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি। ইহাত বিজ্ঞানেরই কথা। তবে পুরাণাদিতে, বিষ্ণুর পশুযোনিতে জন্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কেন?

গুরু। পশুযোনিতে জন্ম কি? এমন কি কোনও পুরাণে পাঠ করিয়াছ যে, বিষ্ণু পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তুমি বোধ হয় বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের কথা বলিতেছ?

শিষ্য। হাঁ,—তাহাই বলিতেছি।

গুরু। অবতার বুঝাইবার সময় এই বিষয় তোমাকে বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। তবে বিষ্ণুর ঐ বরাহাদি পশুমূর্ত্তিরও রূপকভেদ আছে।

শিষ্য। সে কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। কেবল বরাহ কূর্ম্ম প্রভৃতি পাশব অবতারের কথা হয় ত তোমার জানা আছে, কিন্তু যদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাক, তবে হয়শীর্ষ (ঘোড়ার মত মাথা) প্রভৃতি আরও কতকগুলি অবতারের কথাও বোধ হয় অবগত থাকিতে পার।

শিষ্য। হাঁ,—তাহাও স্মরণ হইল! ভাল, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের সেই অংশটুকুর অনুবাদও না হয় পাঠ করিতেছি,—

"হে নারদ! আমি (ব্রহ্মা) যখন যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তখন সেই যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু হয়শীর্ষ নামে যজ্ঞপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেই ভগবানের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা বেদচ্ছন্দ ও বেদোক্ত যজ্ঞক্রিয়াসমূহ এবং বিশ্বের সকল দেবগণের আত্মময় বাক্য সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন।"*

গুরু। উহাতে কিছু বুঝিতে পার নাই?

শিষ্য। আজ্ঞা না।

গুরু। বুঝিবার চেষ্টা কর না বলিয়াই বুঝিতে পার নাই। ব্রহ্মার যজ্ঞই সৃষ্টির প্রচার। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলেই বা যজ্ঞের মন্ত্র কার্য্য ও উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলেই বিষ্ণু প্রকাশ হয়েন ;—ব্রহ্মার সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার উপযোগী হইলে, ভগবান্ হয়শীর্ষরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হয়শীর্ষ। হয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়গণকে হয়, বা অশ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—অন্যত্রও আছে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বের সহিত তুলনা অনেক স্থলেই করিয়াছেন। তাহার কারণ, ইন্দ্রিয়শক্তির গতিও অশ্বের ন্যায় উদ্দাম ও দ্রুত এবং বল্গাদি-দ্বারা বশে রাখিলে, তদ্দ্বারা অনেক শুভকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। শীর্ষ অর্থে অগ্রভাগ।

এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে,—ব্রহ্মার কারণ-সৃষ্টিই যজ্ঞের প্রথম অবস্থা এবং কার্য্যসৃষ্টিই পরিণামাবস্থা। ঐ কার্য্যই জীব ও জগৎ। এই অবতারের অর্থ এই যে,—বিষ্ণু বা স্থিতির দেবতা, ভূতাদি লইয়া ইন্দ্রিয়ধারী হইয়া জীব হইলেন।

শিষ্য। অতি সুন্দর কথা। সৃষ্টিতত্ত্বের এত বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্মযুক্তি অন্য কোথাও নাই। ভাগবতের ঐ স্থলে ব্রহ্মা নারদকে আরও কতকগুলি অবতারের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি সে গুলিরও অর্থ আমাকে বলুন।

* শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১১ শ শ্লোকের অনুবাদ।

গুরু। তুমি ঐ সম্বন্ধে এক একটি শ্লোক বল,—আমি এক একটির ব্যাখ্যা করি।

শিষ্য। "হে নারদ! যুগান্ত-সময়ে জগতের সকল জীবসংযুক্ত পৃথ্বীময় নৌকার সহিত মনুকে গ্রহণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে মদীয়মুখনিঃসৃত বেদমার্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই জীবময় নৌকায় প্রদান করিয়া প্রলয়-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।"

গুরু। জীব অর্থে অদৃষ্ট বা কর্ম্ম, ইহারই বংশে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম। পৃথ্বীময় অর্থে এখানে সর্ব্বভূতকারণময়। সকল জীবের যে স্বাভাবিকী জ্ঞান—তাহাই বেদ, (বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা) প্রলয় হইবার সময়, ভগবান্ আত্মদত্ত কাল কর্ম্ম স্বভাব ও মায়া সমুদয় সংহরণপূর্ব্বক আপনাতে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। জীবপ্রকাশক শক্তির নাম মনু। জীবাদি কর্ম্ম ও অদৃষ্ট, আর ভূতাদির সূক্ষ্ম কারণই মায়া বা কারণবারি; ইহাতে প্রলয়কালের কথা বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ ভগবান্ প্রলয়কালের অন্তে সেই কারণবারি হইতে মনুকে বা জীব-প্রকাশিকা শক্তিকে (অব্যক্ত অদৃষ্ট বীজ) গ্রহণপূর্ব্বক বেদ বা স্বাভাবিক জ্ঞান তাহাতে অর্পণপূর্ব্বক সৃষ্টির বিকাশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ তখন মৎস্য অবতার—কেননা, তিনি তখন মৎস্য অর্থাৎ সমভাবাপন্ন।

শিষ্য। "হে নারদ! যখন অমর ও দানবগণ অমৃত লালসায় ক্ষীরসমুদ্রকে মন্দর পর্ব্বতদ্বারা মন্থন করেন; তখন আদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মমূর্ত্তি ধরিয়া পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই পর্ব্বত-ঘর্ষণ যেন তাঁহার পক্ষে নিদ্রাবস্থায় গাত্রকণ্ডুয়ন সদৃশ সুখময় হইয়াছিল।" †

* শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১২শ শ্লোকের অনুবাদ।

† শ্রীমদ্ভাগবত; ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১৩শ শ্লোঃ।

গুরু। পূর্ব্ব জীবের অব্যক্ত বীজভাবও জ্ঞানান্বিত হইয়া জড়ে অন্বিত হইল; ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু সে জীব কে? জীবও ঈশ্বর। জড়ে অন্বিত বলিয়া জীবেশ্বর। এক্ষণে তাহার পরের অবস্থা, এই অবতারে বলা হইতেছে। কূর্ম্ম অর্থে স্বকীয় ইচ্ছায় আত্ম-প্রকাশ এবং স্বইচ্ছায় তাহার লয়। ঈশ্বর সগুণ হইয়া আপনাতে লীন কারণসমূহ হইতে সৃষ্টি করিতে আপনিই নিরত হইলেন। দেব ও দানবগণ অমৃতাশায় তখন উন্মত্ত। তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে—কিন্তু অমৃত বা প্রকৃতসুখ কি? তত্ত্ব কি? তাই ভগবানের কচ্ছপাকৃতি—সংহরণ ও বিকাশ দেখান, ইহাই সৃষ্টি ও লয়ের কথা।

শিষ্য। "হে নারদ! দেবগণের ভয় নাশ করিবার জন্য সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, ভীষণ ভ্রুকুটী সংযুক্ত করাল-বদন সমন্বিত দৈত্যেন্দ্রকে ত্বরায় পদাঘাতে ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহাকে আপন উরুদেশে ধারণ করতঃ নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।" *

গুরু। ইহা কারণ জগতের বাহিরের কথা,—ইহা জৈবিক দেহতত্ত্ব। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ইহারা দুই ভাই। শাপে দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করে এবং ইহাদিগের স্বভাবই এই যে, ইহারা ভগবানের সহিত শত্রুতা করিবে,—সেইরূপ বন্দোবস্তই ছিল। ইহার প্রকৃত ভাব এই যে, অবিদ্যাগর্ভজাত যে রিপু, সে ভগবানের শত্রু; কিন্তু ভগবানের শত্রু কেহ নহে, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুও ভগবানের দ্বাররক্ষক দ্বারী ছিল,—ভগবান্‌কে লোকে সহজে না দেখিতে পায়, এই জন্তই দ্বারী, কিন্তু ব্রাহ্মণের দর্শনে দ্বারী বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিল; তাই ব্রাহ্মণে শাপ দিয়াছিলেন। সেই জন্যই দুই ভ্রাতার জন্ম। প্রবৃত্তি তমোগুণা হইলে

* শ্রীমদ্ভাগবত; ২য় স্ক, ৭ম অঃ, ১৪শ শ্লোঃ।

অবিদ্যা নাম ধারণ করে ;—চৈতন্য যখন ঐ প্রবৃত্তি দ্বারা আরোপিত হয়, তখন তমোগুণী হইয়া থাকে।

এখন, চৈতন্য তমোগুণে আকর্ষিত হইলে, একাংশে জগতের লোপ হয়, অর্থাৎ প্রলয় প্রকাশ হয়। অপরাংশে জীবের নাশ হয়। হিরণ্যাক্ষ যে ভাগের সংজ্ঞা, সেই ভাগ প্রথম এবং তমোগুণী, যে চৈতন্যাংশ অজ্ঞানরূপে জীবের লয় সাধন করে, তাহাই হিরণ্যকশিপু। আর সাধকের যে বিশ্বাস, তাহাই প্রহ্লাদ নামে আখ্যাত। অজ্ঞান আত্মদর্শন করিতে বাধা জন্মায়, ইহাই হিরণ্যকশিপুর দেব-পীড়ন। সাধক যখন উপাসনা অবলম্বন করেন; তখন পরম চৈতন্য তাঁহাদের সন্নিহিত-আত্মদর্শন প্রদান করেন, এবং অজ্ঞানকে নাশ করেন,—এই অজ্ঞান নাশই হিরণ্যকশিপুর নাশ বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। আর একটী বরাহরূপ আছে।

গুরু। হাঁ,—তাহারও ঐরূপ নিগূঢ় অর্থ আছে। বরাহ অবতার হইয়া কি করিয়াছিলেন? না,—কারণার্ণবনিমগ্না বসুন্ধরাকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। জীব, স্বীয় কর্ম্মফলের বীজ লইয়া প্রলয়কালে কারণবারিতে নিমজ্জমান ছিল, বরাহ হইয়া তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। বরাহ এস্থলে ক্ষীয়মান কাল। দিক্ কাল প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বর, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শিব ও কালী।

শিষ্য। শিব তমোগুণময়;—তমোগুণে জগতের সংহার কার্য্য হয়, তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শিব অর্থে মঙ্গল, যিনি সংহার করিবার দেবতা, তিনি মঙ্গলময় হইবেন কেন?

গুরু। তুমি কি বুঝিতেছ যে, শিব কেবল সংহারকার্য্য করিবার জন্যই তাঁহার সংহার-ত্রিশূল উদ্যত করিয়া বসিয়া আছেন? পুরাণে তাঁহাকে পরমযোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রত্নাকর তাঁহার ভাণ্ডারী, কৈলাসের ন্যায় মনোহরপুরী তাঁহার আবাসস্থলী, কিন্তু তিনি সে সকলের কিছুই চাহেন না। কিছুতেই দৃক্‌পাত করেন না। তিনি শ্মশানবাসী—চিতাভস্ম গাত্রে লেপন করেন, নরকপালে পানাহার করেন, নরাস্থিমালা ভূষণ করেন এবং ভাং ধুতুরা খাইয়া মত্ত থাকেন। কেন, যিনি ঈশ্বরের মহাগুণ—সংহরণ শক্তিতে যিনি শক্তিমান—এক কথায় ঈশ্বরের অংশ বা মহান্ ঈশ্বর, তাঁহার এমন ভাব কল্পিত হইল কেন?

তিনি সর্ব্বসাক্ষী কাল। কাল দুই প্রকার,—অখণ্ড কাল ও খণ্ড কাল। যাহা অখণ্ড কাল,—তাহাই মহাকাল,—মহাকালে অনন্ত ব্রহ্ম ব্যাপ্ত; অনন্ত দেশ ব্যাপ্ত মহাকাশ,—তাহা নির্গুণ। আর যাহা সগুণ, তাহাই খণ্ড কাল;—তাহাই জ্ঞানাধিগম্য; তাহাই জগতের কর্ম্মহেতু। মহাকাল হইতেই সৃষ্টি স্থিতি সংহাররূপী কাল। এই কালই শিব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন নির্গুণে মিলিত,—স্তিমিত, তখনই মহাকাল; আর যখন গুণত্রয় পৃথক্, তখনই খণ্ডকাল। এই কালই শিব।

শিব সংহার করেন, তবে মঙ্গলময় শব্দ বাচক নাম হইল কেন, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলে ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। তুমি প্রত্যহ একরাশি অন্ন সংহার করিয়া থাক, তুমি কি মঙ্গলময় ?

শিষ্য। আমি যে অন্ন খাই, তাহার উদ্দেশ্য আছে।

গুরু। উদ্দেশ্য কি ?

শিষ্য। অন্নের সংহার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করি। নতুবা আমি বাঁচিতাম না,—অন্নের সংহারে আমার দেহের পুষ্টি, আমার পরমায়ুর রক্ষা এবং অন্নের সহিত অধ্যাসিত অব্যক্ত বীজ গ্রহণ করিয়া, রমণী-গর্ত্ত-কটাহে প্রদান করিয়া জীবের জনন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি।

গুরু। শিব যে সংহার করেন, তিনিও তাহাতে সৃষ্টি স্থিতি করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, কুসুমটি ফুটিয়া রূপে রসে গন্ধে ফুলিয়া উঠিয়াছে। কালপূর্ণ হইলেই কাল উহাকে সংহার করিবেন, ফুল মরিয়া ফল হইবে, —ফলের বীজে বৃক্ষ হইয়া আবার সহস্র সহস্র ফুলের উৎপত্তি করিবে। এইরূপেই মঙ্গলময় শিব সংহরণ কার্য্যে ত্রিজগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। জীবের দেহেও এইরূপ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য হইতেছে। সেই গুণত্রয়--সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিনিয়তই ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিনলোকের মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে সমস্ত জীবে এইরূপে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কার্য্য করিতেছেন।

শিবের এই সংহরণ শক্তির নাম কালী। সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য তালে তালে সম্পাদিত হইয়া থাকে। জগতের কোন কার্য্যই বেতালে সম্পাদন হয় না। যুগ হইতে যুগান্তর তালে তালে আসিতেছে,

যাইতেছে—আবার আসিতেছে। বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, প্রাতঃকালের পর সন্ধ্যা, আঁধারের পর জ্যোৎস্না সকলই তালে তালে আসে যায়। শৈশবের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ের পর বৃদ্ধত্ব—তাও তালে তালে—তাই কালশক্তি কালী, তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকেন। তাই ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া ভক্তি-গদ্গদ কণ্ঠে বলিয়া থাকেন—

"একবার নাচ দেখি মা।"

তাই, প্রকৃতির সিদ্ধ-সাধক ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"দোলে দোলে রে আনন্দময়ী করাল-বদনী শ্যামা"।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্ব ছন্দময়; কাজেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিধায়িনী কালী নৃত্যময়ী। মূলা প্রকৃতি হইতে স্থূলা প্রকৃতির পার্থক্য এই যে, মূলা-প্রকৃতি ত্রিগুণ প্রসবিনী—আর স্থূলা-প্রকৃতি স্থূলজগতের প্রসবিনী—অর্থাৎ বিশ্ব প্রসবিনী আমাদের মা। মূলা প্রকৃতি যখন ব্রহ্মে লিপ্তা, তখন তিনি সাম্যা ও নিষ্ক্রিয়া এবং গুণ বিরহিতা; আর স্থূলা প্রকৃতি যখন শিবে সংস্থিতা, তখনই গুণময়ী এবং বিশ্বপ্রসবিনী। তিনি সেই কালের বক্ষে দাঁড়াইয়া তালে তালে নৃত্য করতঃ ত্রিজগৎ স্পন্দিত করিয়া সংহারের পর সৃষ্টি করিতেছেন, ফুল মরিয়া ফলের সৃষ্টি করিয়া তদ্বীজে জগৎপূর্ণ করিতেছেন,—রক্তবীজ বধ করিয়া, রক্তভরা লহ লহ জিহ্বায় সেই তাথেই তাথেই নৃত্য করিতেছেন।

দেবীর রক্তবীজ বধোপাখ্যানেই আমার কথার প্রমাণ পাইবে। জগতে সকলেই রক্তবীজ,—তুমিও রক্তবীজ, আমিও রক্তবীজ; আর ঐ প্রস্ফুটিত ফুলও রক্তবীজ। রক্ত অর্থে রাগ বা অনুরাগ। অনুরাগেতেই আমরা রক্তবীজ,—দেবী আমাদিগকে সংহার করিতেছেন, কিন্তু আমরা রক্তবীজ,—একের বীজে সহস্র সহস্রের উদ্ভব হইতেছে! কেবল

বিরাগীই (যোগী) রক্তবীজ নহেন। রক্তবীজের রক্ত যদি পৃথিবীতে না পড়ে তবেই আর রক্তবীজের সৃষ্টি হয় না,—পৃথিবী অর্থে ক্ষেত্র। তাই দেবী নিজ করাল বদন বিস্তার করিয়া লেলিহান জিহ্বার উপরে রক্তবীজ বধ করেন।

দৈত্যকুল দেবদ্বেষী হইলে, সৃষ্টির বৈষম্য সাধন করিলে, তিনি দৈত্য-শক্তিকে সংহার করেন,—সংহার করিয়া আবার গড়েন,—সংহারে একেবারে যায় না, মন্দকে ভাল করাই সংহারের উদ্দেশ্য। অসৎকে সৎ করাই সংহারের লক্ষ্য—তাই ত্রিগুণময়ী কালী আমাদের মঙ্গলময়ী; তাই হিন্দু, সেই কাল শক্তিকে কালের বক্ষে নৃত্য করিতে দেখিয়া, পূজা করিয়া গলদশ্রু লোচনে প্রণাম করেন,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কালীরূপ ও শিবলিঙ্গ।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, ব্রহ্মের প্রকৃতি সূক্ষ্মা,—আর শিবের প্রকৃতি স্থূলা,—সেই স্থূলা প্রকৃতিই কালী। অর্থাৎ সেই সূক্ষ্মা প্রকৃতিরই বিকাশ স্থূলা প্রকৃতি। তাহা হইলে কালী অর্থে, আমাদিগের এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তঃপ্রকৃতিও বলা যাইতে পারে।

গুরু। নিশ্চয়ই। শাস্ত্রে তাঁহাকে জগন্ময়ী বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কালীতত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতম্॥
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্ব-স্ব-কার্য্যেষুবরশ্চাভয়মীরিতম্॥
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠত।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১৩শ উল্লাস।

"মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। হে শৈলজে! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদয় পদার্থ কালীতে বিলীন হইয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা যোগী তাঁহারা সেই নির্গুণ,

নিরাকার, বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তিকে কৃষ্ণবর্ণে কল্পিত করিয়াছেন। তিনি কালরূপিণী, নিত্যা, অব্যয়া ও কল্যাণময়ী।—অমৃতত্ব প্রযুক্ত ইঁহার ললাটে চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে। সতত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কাল-সম্ভূত এই জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে বলিয়া যোগিগণ তাঁহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কালদন্তে চর্ব্বণ করেন বলিয়া, জীবের রুধিরসন্ততি, সেই মহাকালীর রক্তবস্ত্র রূপে কল্পিত হইয়াছে। হে শিবে! তিনি বিপদ হইতে সময়ে সময়ে জীবগণকে রক্ষা ও স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন বলিয়া, তাঁহার হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে। হে ভদ্রে! তিনি রজোগুণজাত বিশ্বে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাঁহার রক্ত-পদ্মাসনে অধিষ্ঠান কথিত হইয়াছে। মোহময়ী সুরা পান করিয়া কালিক-জগৎ ভক্ষণপূর্ব্বক কাল ক্রীড়া করিতেছেন, চিন্ময়ী সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপিণী দেবী ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের হিতসাধনোদ্দেশে উক্ত গুণানুসারে সেই মহাকালীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।”

মহাকালী সম্বন্ধে যাহা জানিবার প্রয়োজন, তাহা প্রায় সমস্তই উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সেই চিন্ময়ী অরূপা প্রকৃতির কেন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বোধ হয় তাহার উত্তর হইয়া গিয়াছে।

শিষ্য। হাঁ, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আপনার কথিত তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অল্পমেধাবী ব্যক্তিগণের জন্য দেবীর নানাবিধা মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী জনগণ কি, সে রূপ বা মূর্ত্তি মান্য করিবে না?

গুরু। একথা তোমাকে আমি পরে বুঝাইব। কেন না, আগে

সমস্ত দেবতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে, আরাধনাতত্ত্বও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না।

শিষ্য। আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন। কিন্তু আর একটি কথা।

গুরু। কি বল ?

শিষ্য। হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি স্ত্রী পুরুষ এবং সমস্ত বয়স ভেদেই শিব লিঙ্গ পূজনের ব্যবস্থা ও প্রচলন দেখা যায়,—শিবলিঙ্গ অর্থে কি ?

গুরু। তুমি বোধ হয় লিঙ্গ অর্থে নিকৃষ্টতম স্থূল ইন্দ্রিয়-বিশেষের কথা বুঝিতেছ ? তোমার মত অনেকেই বোধ হয়, তাহাই ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু কি মহাভুল !

শিষ্য। তাহা ভাবিবার কারণও আছে।

গুরু। কি ?

শিষ্য। যেরূপ ব্যাপারে ঐ লিঙ্গ গঠনাদির প্রমাণ আছে, তাহাতে ঐরূপ জ্ঞান করিবারই সম্ভাবনা।

গুরু। সে ব্যাপার কি ?

শিষ্য। শিবলিঙ্গের গঠনপ্রণালীর নিয়ম আছে,—

লিঙ্গস্য যাদৃগ্ বিস্তারঃ পরিণাহোঽপি তাদৃশঃ।
লিঙ্গস্য দ্বিগুণা বেদী যোনিস্তদর্দ্ধসম্মিতা॥
সর্ব্বতোঽঙ্গুষ্ঠতোহ্রস্বং ন কদাচিদপি ক্বচিৎ।
রত্নাদিষু চ নির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ॥ তন্ত্রম্।

"লিঙ্গের পরিমাণানুসারে তাহার বিস্তার করিবে। লিঙ্গ পরিমাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে। যোনির ঊর্দ্ধ পরিমাণে যোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের কম করিবে না। রত্নাদি

দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ স্থলে কোন পরিমাণের নিয়ম নাই, আপনার ইচ্ছানুসারে লিঙ্গের পরিমাণ স্থির করিবে।"

পুরাণেও আছে,—

শিবলিঙ্গস্ত যন্মানং তন্মানং দক্ষসব্যয়োঃ।
যোন্যগ্রমপি যন্মানং তদধোঽপি তথা ভবেৎ॥

লিঙ্গপুরাণ।

শিবলিঙ্গের যেরূপ পরিমাণ, তাহার বাম দক্ষিণেও সেইরূপ পরিমাণ জানিবে। এবং যোনির যে প্রমাণ, তদধোভাগেরও সেই প্রমাণ জানিবে।

শিবলিঙ্গের নিম্নভাগে যে স্থূলভাব আবরণ থাকে, তাহাকে বোধ হয় যোনিপীঠ বলে। শুনিয়াছি, ইহাকে গৌরীপীঠও বলে।

গুরু। ইহাতেই বুঝি ঐরূপ কদর্থের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছ? শাস্ত্র দর্শনের অভাবেই হিন্দু হইয়া ও হিন্দুর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত আছ। শাস্ত্র বলেন—

আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥

"লিঙ্গ বা ইন্দ্রিয়বিশেষকে লিঙ্গ বলে না,—আলয়কে এ স্থলে লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। আলয় অর্থাৎ সর্ব্বভূত যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়,—সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোত্থিত বুদ্বুদ লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিব হইতে উদ্ভূত বুদ্বুদ স্বরূপ জীব সমুদয় যাহাতে লয় হয়, তাহাকে লিঙ্গ বলে।"

অন্যত্র আছে,—

প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং শিবে॥

"যাবৎ ধরাতলে জীবিত থাকা যায়, তাবৎ প্রত্যহ ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গের পূজা করিবে।"

ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গ বলায়, ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, উহা শিবের নিকৃষ্টতমের অঙ্গবিশেষ নহে, উহা ব্রহ্মময় পদার্থ। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে,—

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ। কঠ শ্রুতি।

পরম পুরুষ শিব সর্ব্বময় হইলেও তিনি সাধকের হৃদয় মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই অবস্থিত,—কেননা, মহাকাশ তখন ঘটাকাশে পরিণত। সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তখন জীবেশ্বর হইয়া জীবের হৃদয়দেশে অবস্থিত,— তাই তিনি লিঙ্গ। প্রমাণান্তর যথা,—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্ত পীঠিকা।
প্রলয়ে সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

"আকাশ, লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার আসন,—মহাপ্রলয়ের সময়ে দেবতাগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্ত্তমান ছিলেন,— অতএব লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।"

আর গৌরীপীঠ বা যোনিপীঠ অর্থে নিকৃষ্টতম স্ত্রী-ইন্দ্রিয়-বিশেষ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, তাহাই যোনিপীঠ। সূতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্তাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকম্॥

শিব নির্গুণ, কিন্তু মায়ার দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া সগুণ হয়েন, অতএব শক্তিহীন শিব নিরর্থক—অর্থাৎ সান্ত জীবের পক্ষে সেই অনন্ত অবশ্যই নিরর্থক। ব্রহ্মের গুণই শিব, কিন্তু যদি শক্তি বা মায়া কর্ত্তৃক উপাধিযুক্ত না হয়েন, তবে গুণের অবলম্বন কোথায়? অবলম্বনহীনতায় কাজেই তিনি আবার নির্গুণ। নির্গুণ হইলেই কাজেই নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলে শিবের শিবত্বই নাই।

মহিমান্বিত শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তাঁহার প্রভাব; নতুবা তিনি শব বা নিষ্ক্রিয়।

যম্মসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম নির্গুণ,—নির্গুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তি সহযোগে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। তাই লিঙ্গময় শিবের সহিত যোনিপীঠ বা শক্তিপীঠের সংস্থাপন।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, সান্ত জীব সেই অনন্ত ঈশ্বর এবং সূক্ষ্মা মূল-প্রকৃতিকে ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, কাজেই এই গুণেশ্বর ও স্থূলা-প্রকৃতির আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইবে না কেন? সেই জন্যই অধিকারভেদবিরহিত এই লিঙ্গরূপী শিবের ও শিবশক্তি কালিকার আরাধনা করিবার বিধি-ব্যবস্থা প্রচলন আছে।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মার সৃষ্টি

শিষ্য। এক্ষণে, আমাকে উপদেশ দিন, ব্রহ্মা কারণ শরীর গ্রহণ করিয়া প্রথমে কি প্রকারে সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন ?

গুরু। ঈশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর জগতের কারণ স্বরূপ,—তাই প্রলয়কালে তিনি কারণ বারিতে প্রসুপ্ত। সেই কারণের জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি,—সেই কারণ জগৎ পদ্ম স্বরূপ। পদ্ম অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের আভাস। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত কারণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্টি-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, আপনার অধিষ্ঠান রূপ জগতের সূক্ষ্ম আভাসপদ্ম লইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ পদ্ম সূক্ষ্ম কারণ সমূহের সহিত সৃষ্টির চতুঃসীমায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমুদায়ের সাহায্যে পূর্ব্বকালের লীন লোকসমূহ কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা, ব্রহ্মারূপী আত্মা, শক্তি ও কারণাদির সংযোগে পদ্মের যে অবস্থা হইল তাহাই প্রলয়ে মৃত জগৎরূপী বৃক্ষের বীজ স্বরূপহইল। এই বীজ হইতে পরবর্ত্তী জগৎ-বৃক্ষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল।

একটি অশ্বত্থ বীজের উপমা লও,—যখন ফুল ছিল, বীজের সম্ভাবনা কোথায়? কয়েকটি শোভাময় দলমাত্র, ক্রমে তাহাতে ফল হইয়া বীজ হইল,—বীজের যাহা খোসা ভূষি তাহাতে এমন কি আছে, যাহাতে ঐ প্রকাণ্ড মহীরুহের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কিছু যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণে বাহির করিতে না পার, তবে চারি পাঁচ দিন মাটীর মধ্যে থাকিয়া এক দিনে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত বৃক্ষাঙ্কুর কোথা হইতে বাহির হইল; এবং ক্রমে তাহা কোন অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ছাইয়া উঠিয়া পড়িল। ঐ ক্ষুদ্র সর্ষপ-পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ কারণ রূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সহায়তায় সেই কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল।

ব্রহ্মা, সেই কারণ-বীজ, নিজ শক্তি বা প্রকৃতির সাহায্যে জগতের আত্মাস্বরূপে বিরাজিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মী সৃষ্টি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে;—

"ব্রহ্মাও শ্রীনারায়ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া, তাঁহারই আদেশানুসারে শত বৎসর দিব্য তপস্যা আচরণ করিলেন। সেই অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং আত্মাশ্রয়িণী বিদ্যা-বলে তাঁহার বিজ্ঞানবল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজের অধিষ্ঠানভূত পদ্ম ও সলিলকে, প্রলয়কাল-বলে দৃঢ়বীর্য্য বায়ুদ্বারা, কম্পিত হইতে দেখিয়া সলিলের সহিত ঐ বায়ু আচমন করিলেন।

অনন্তর, স্বয়ং যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই পদ্মকে আকাশ-ব্যাপী নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন,—যে সকল লোক ইতিপূর্ব্বে বিলীন হইয়াছে, আমি ইহা দ্বারাই ঐ সকলের পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব! *

* পূর্ব্বে যে কম্পনের কথা বলা হইয়াছে, এই সৃষ্টিবিজ্ঞানে তাহারই সমর্থন হইতেছে।

কর্ত্তব্য বিষয়ে নারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর তিনি যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা চতুর্দ্দশ এবং তদপেক্ষা অধিকতর লোকও সৃষ্টি হইতে পারিত। অতএব, পিতামহ ঐ পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে লোকত্রয়ে বিভক্ত করিলেন। জীবগণের যে সকল ভোগ্যস্থান প্রত্যহ বিরচিত হইয়া থাকে, এই লোকত্রয় ঐ সকলের মধ্যেই এক রচনাবিশেষ। ব্রহ্মলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল স্বরূপ।" †

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্তা আত্মা এবং আত্মাও কোন নৈসর্গিক স্বভাব দ্বারা নিয়োজিত। সেই নিয়োগ-স্বভাবকে ঈশ্বর-স্বভাব বলে। সেই স্বভাব দ্বারা আত্মা বা আত্মারূপী ব্রহ্মা কাল ও বাসনা সহকারে জগৎ ও জীবরূপী হইয়া ঈশ্বরের লীলা সাধন করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিক ভুবন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জগতে চতুর্দ্দশ ভুবন বিজ্ঞান কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতকার পদ্মের আভাসে তদতিরিক্ত যদি থাকে, তাহা আজিও বিজ্ঞানের যুক্তিতে আইসে নাই—এমন যদি হয়, তাহাতেই উক্ত হইল, চতুর্দ্দশ কি ততোধিক।

ব্রহ্মা, তাহাকে অর্থাৎ সেই পদ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার মধ্যে চৈতন্য বা আত্মারূপে গমন করিয়া, প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, সেই তিন বিভাগে "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" হইল। ভূর্লোকে লীলা, ভুবর্লোকে কারণের অবস্থান এবং স্বর্লোকে চৈতন্যশক্তির অবস্থান অর্থাৎ ভূমিতে জীবলীলা ভুবতে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্ব শক্তিতে আত্মাবস্থান। এই তিনটি অবস্থা দ্বারা জীব ভোগ মাত্র করিতে পারিবে,—মুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও

† শ্রীমদ্ভাগবত; ৩য় স্ক, ১০ অঃ।

মৈথুন এই পাঁচটি মায়াধর্ম্মকে ভোগ বলে। জীবগণ ঐ ভোগদ্বারা জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া লয় ও সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভোগবাসনা বিবর্জ্জিত হইলে তবেই মোক্ষ হয়।

ফলকথা, এই যে ব্রহ্মার সৃষ্টি ত্রিলোকের কথা বলা হইল,—এই ভূর্ভুবঃস্বঃ—ইহা কাম্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ। সুতরাং প্রতিকল্পেই ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যলোক ব্রহ্মলোক এবং মহর্ল্লোক প্রভৃতি লোকসমূহ নিষ্কাম-ধর্ম্মের ফল স্বরূপ; সুতরাং তাহারা নশ্বর নহে। সে সকল দ্বিপরার্দ্ধ বৎসর স্থায়ী। তাহার পরে, তত্তৎস্থান-নিবাসী ব্যক্তিদিগের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি এখন যে, কালের কথা বলিলেন,—সে কি সেই কাল বা শিব।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কাল বা শিব সংহার করেন,—ইহাই জানি। তিনি সৃষ্টি কার্য্যও করেন?

গুরু। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বুঝিতে পার নাই, তাই পুনরায় ঐরূপ বলিতেছি। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, জগতের সূক্ষ্ম কারণকে মহত্তত্ত্ব বলে। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে জগৎজাত ভূতসংমিশ্রণ পর্য্যন্ত যে পরিণাম কার্য্যদ্বারা জগৎ ও জীব প্রকাশ এবং সক্রিয় হইতেছে, সে সমস্ত অবস্থা যে পরম শক্তি দ্বারা পালিত হইতেছে, সেই ঐশীশক্তিকে কাল কহে।

জীবন সংযুক্ত এই যে, কারণাদির সংযোগজাত বিশ্বলীলা—এই কার্য্যটী ঈশ্বর সেই কালদ্বারা আত্মা (ব্রহ্মাকে) কর্ম্মী করতঃ অধিক করিয়া থাকেন। এই যে, গুণময় কর্ম্মময় ও নির্গুণ অবস্থাপন্ন ঐশী তেজ তাহাকেই কাল বলে,—ইহাই শিব বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা।

ব্রহ্মা, এইরূপে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—ইহাই ব্রহ্মার সৃষ্টি। ইহাতে এই ত্রিলোকের সূক্ষ্ম ভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তিকেই দেবতা বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবতত্ত্ব।

শিষ্য। বড় কঠিন সমস্যা। যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে, তাহা বড়ই কঠিন;—সুতরাং একই বিষয় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। ব্রহ্মা যে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সূক্ষ্ম ভাব সৃষ্টি করিলেন,—সেই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তিই দেব-শক্তি বলিয়া আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু সে সূক্ষ্ম শক্তি জিনিষটা কি, তাহাই আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। তোমাকে আমি প্রথমেই বলিয়াছি, জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনা লইয়া তিনি স্বরূপ থাকিয়া সগুণ পুরুষ হইলেন। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে গুণত্রয়ের সমুদ্ভব হইল। সেই তিনগুণের শক্তিসংযোগে সূক্ষ্ম জগত্রয়ের সৃষ্টি হইল। সেই সূক্ষ্ম জগৎ কি? না, জগতের উপাদান—অর্থাৎ জগৎ যাহাতে অবস্থিত বা জগতের যাহা বীজ স্বরূপ। তাহা কি, সে কথাও তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সে পঞ্চ মহাভূত। সেই পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চীকরণে স্থূল জগতের প্রকাশ। পঞ্চ মহাভূতের যে সূক্ষ্মাংশ, তাহাই স্থূল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা।

"(সকলে) যাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলে, তিনিই দিব্য গরুত্মান্ সুপর্ণ। এক ভাব বস্তকেই বিপ্রগণ বহুপ্রকারে বলেন,—অগ্নি বলেন, যম বলেন, মাতরিশ্বাও বলেন।"—ঋগ্বেদ। ৪৬ শ ঋক্।

এই মন্ত্রের সায়ন ভাষ্যের অনুবাদ এই,—

(ঐ আদিত্যকে) ইন্দ্র (ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট) বলে এবং মিত্র (মরণ হইতে ত্রাণকারী; দিবাভিমানী এই নামের দেবতা) বলে, বরুণ (পাপের নিবারক, রাত্র্যভিমানী দেবতা) বলে, অগ্নি (অঙ্গনাদি গুণ বিশিষ্ট দেবতা) বলে, আর ইনিই "দিব্য" দ্যুলোকে ভব "সুপর্ণ" সুপতন "গরুত্মান্" গরণ বা পক্ষ বিশিষ্ট এবং এই এই নামে যে এক পক্ষী গরুড়, তাহাও ইনি। কি প্রকারে একের নানাত্ব? তদুত্তরার্থ বলা হইতেছে— বস্তুতঃ ঐ এক আদিত্যকেই বিপ্রগণ অর্থাৎ মেধাবীরা—দেবতাতত্ত্ববেত্তারা বহুপ্রকারে বলিয়া থাকেন।" একই মহান্ আত্মদেবতা সূর্য্যনামে কথিত হয়েন।" এইরূপে উক্তি থাকা হেতু সেই সেই হেতুতেই ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; এবং তাঁহাকে বৃষ্ট্যাদির কারণ বৈদ্যুতাগ্নি নিয়ন্তা, যম, অন্তরীক্ষে শ্বসনকারী মাতরিশ্বা বায়ু বলা যায়। সূর্য্য ও ব্রহ্মের অভিন্নভাব হেতুতেই এরূপ সর্ব্ব স্বরূপতা উক্ত হইল। *

এতাবতা স্থির হইল যে, জগত্রয়ের সৃষ্টিকারণ স্বরূপ যে অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তি, তাহাই দেবতা। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,— এই পঞ্চভূত ইঁহারা দেবতা। অবশ্য ইহাদিগের স্থূল ভাগ দেবতা নহে,—ইহাদিগের যে সূক্ষ্ম শক্তি, তাহাই দেবতা। পঞ্চীকরণ প্রস্তাবে তোমাকে বলিয়াছি, এই সকল দেবতার সূক্ষ্মাংশ মিশ্রণে স্থূলের উৎপত্তি,—সেই সূক্ষ্মের বিবর্ত্তনই স্থূল জগৎ। আবার বিবর্ত্তনে যে সকল সূক্ষ্ম ভূত, যে সকল অদৃষ্ট শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও

* ত্রয়ী ভাষা; ১৪—১৫ পৃঃ।

দেবতা। জগতে যত প্রকার স্থূল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন।

শিষ্য। এই ভৌতিক স্থূল পদার্থের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ দ্বারাই সংঘটিত হয়, বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে জগৎ সৃষ্টি ও নির্ম্মাণের মূল ভৌতিক পদার্থ (Elements) বিদ্যমান। আপনি কি সেই ভৌতিক্ সূক্ষ্ম পদার্থকেই দেবতা বলিতেছেন?

গুরু। Elements ও ত স্থূল পদার্থ। যাহার রূপ আছে, তাহাই স্থূল। কিন্তু তোমার জড় বিজ্ঞান এই Elements এর উপরে আর যাইতে সক্ষম নহেন। ইঁহাদের মতে চিচ্ছক্তি রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি ;—কেবল জড় পদার্থের সংযোগে উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে প্রকাশিত। মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, রাসায়নিকাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক শক্তির আবিষ্কার হইয়া জড়বিজ্ঞান স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহারা আসিল কোথা হইতে, উহাদিগের হ্রাস-বৃদ্ধি, সংযোগ-বিয়োগ কি প্রকারে ও কেন সম্পন্ন হয়, কি প্রকারে উহাদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় নির্ণয় করিতে জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এই জন্য যে, যদিও ভৌতিক-শক্তিগুলি কেবলমাত্র জড়পদার্থ যোগে প্রকটিত, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব, উহাতে নিহিত আছে,—সেই তত্ত্ব যে কি, তাহা জড় বৈজ্ঞানিক জানে না। জড় জগতের ক্রিয়া দেখিয়া, ভৌতিক পদার্থ সকলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যে আকাশ বা ইথর দ্বারা উহারা এই স্থূলের জগতে ব্যাপ্ত,—তাহারই শেষ সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ কি,—তাহারই তত্ত্ব কি—ইহা বুঝিবার ক্ষমতাই যখন আমাদিগের নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব যে,

সেই আকাশ বা ইথরের অন্তর্জ্জগতে আবার কি বস্তু আছে? কিন্তু বস্তু যে আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়; নতুবা তাহারা সক্রিয় হয় কেমন করিয়া?

যোগবলশালী আর্য্যঋষিগণের যোগতত্ত্ব দ্বারা সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল;—তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্মান্তদৃষ্টি-শক্তিতে দেখিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহারা প্রকৃত আধিদৈবিক; প্রত্যেক শক্তির মূলদেশে সূক্ষ্মজগতে চিৎশক্তি বিশিষ্ট দেবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। তাঁহারাই সূক্ষ্ম জগৎ হইতে স্থূল জগৎকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। হয়ত আমাদের স্থূল জগতের অমিশ্র মিশ্র রূপে তেত্রিশ কোটি পদার্থ আছে হয়ত, তাহাদের প্রত্যেকের মূল সূক্ষ্মশক্তি দেবতাকেই তেত্রিশ কোটি দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু মনে রাখিও এ সমুদয়ই সেই একের সত্ত্বা-সম্ভাবিত; সকলই ব্রহ্মের বিকাশ বা ঈশ্বরের বিরাট দেহ। শ্রুতি বলিতেছেন,—

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

"যেমন ঘৃতের অন্তরেও তেজোবান্ মণ্ড বিস্তৃত ভাবে ও সূক্ষ্মরূপে থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে অতিসূক্ষ্ম ও গোপন ভাবে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন। তিনিই একমাত্র হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আশ্রয়ে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় ও সর্ব্বতোব্যাপী সাক্ষিস্বরূপে জানিলে, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।"

অতএব, দেবতা বলিতে তাঁহারই সূক্ষ্ম অদৃষ্ট ক্রিয়া শক্তিকেই জানিবে।

বেদে এই দেবতাকে দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। এক কর্ম্মদেব,

অপর আজানদেব। যাঁহারা স্বকীয় উৎকৃষ্ট কৃতকর্ম্মফলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কর্ম্মদেব, এবং যাঁহারা সৃষ্টিকাল হইতে দেবতা, তাঁহারা আজান দেব। কর্ম্মদেব যথা,—ঋভু ও সাধ্যগণ এবং আজান দেবতা যথা,—অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হিন্দু জড়োপাসক কি না।

শিষ্য। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ অগ্নি প্রভৃতির আরাধনা করিলে, জড়ের উপাসনা করা হয় না কি? ইহাদিগকেই ত দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

গুরু। হিন্দু, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতির আরাধনা করে,—কিন্তু উহার স্থুল বা জড়ভাগের আরাধনা করে না। আর জড়ই বা কি? সমুদয়ই ত ঈশ্বর। কিন্তু তথাপি যাহা জড়ভাগ,—তাহার আরাধনা হিন্দু করে না। তুমি দেখিয়াছ, ব্রাহ্মণগণ পার্থিব অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার পূজা করেন, তাহাতে হোম করেন, তাহার কাছে উন্নতির কামনা বা বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—কিন্তু বস্তুতই কি তাঁহারা কেবল সেই জড় অগ্নির আরাধনা করেন? তাহা নহে। আগুনের পার্থিব মূর্ত্তি যে জড়, তাহা দেখিবার ক্ষমতা অবশ্যই হিন্দুর ছিল বা আছে,—কিন্তু আগুন জ্বালিয়াই হোতা অগ্নিদেবকে আবাহন করেন,—

ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

তৎপরে অগ্নির ধ্যান করেন,—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

পার্থিব অগ্নির যে রূপ, যে আকৃতি, তাহার পূজা বা আরাধনা করা হইল কি? অগ্নি যে সত্তা লইয়া স্বীয়কার্য্য সংসাধন করিতেছেন,—অগ্নির যে অগ্নিত্ব, হিন্দু সেই সূক্ষ্ম চৈতন্যতত্ত্ব বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বেরই পূজা বা আরাধনা করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য জড় সম্বন্ধেও জানিবে।

শ্রীভগবানের যে সর্ব্বব্যাপকতা, হিন্দুগণ তাহাকেই মহাব্যোম বা মহাকাশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আকাশ অর্থে শূন্য—যাহা বুঝিতে পারি না, তাহাই শূন্য। ভগবানের গুণ বুঝিতে পারি না, তাই সেই ভগবানের সর্ব্বব্যাপকতা গুণ আকাশ বা শূন্য। আকাশ বা আকাশ-তন্মাত্র পুরুষেরই রূপ।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।—বেদান্ত দর্শন, ১৷১৷২২।

ব্রহ্মৈব স ন বিয়ৎ কুতস্তল্লিঙ্গাৎ সর্ব্বভূতোৎপাদনত্বাদিলক্ষণব্রহ্ম-লিঙ্গাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, সর্ব্বাণীত্যসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দাদ্বিয়ৎসহিত-সর্ব্বভূতোৎপত্তিহেতুত্বমবগতম্। ন চ তদ্বিয়ৎপক্ষে সম্ভবেৎ স্বস্য স্বহেতুত্বাভাবাৎ। আকাশাদেবেত্যেবকারেণ হেত্বন্তরঞ্চ নিরস্তম্। এতদপি ন তৎপক্ষে। মৃদাদের্ঘটাদিহেতোর্দৃষ্টত্বাৎ। ব্রহ্মপক্ষে তু সঙ্গতিমৎ তস্যৈব সর্ব্বশক্তিমতঃ সর্ব্বরূপত্বাৎ। যদ্যপ্যাকাশশব্দস্তত্র রূঢ়স্তথাপি শ্রৌতরূঢ়িতো ব্রহ্মণি প্রযুজ্যতে বলিষ্ঠত্বাদিতি॥ ২২॥

আকাশ সেই ব্রহ্মেরই লিঙ্গ স্বরূপ,—কিন্তু উহা ভূতাকাশ নহে। কারণ, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে হয় না। শ্রুতিতে অসঙ্কুচিত সর্ব্বশব্দ দ্বারা আকাশ সহিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু

স্বরূপে আকাশকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আকাশপদে ভূতাকাশকে বুঝাইলে আকাশের কারণ আকাশ, এইরূপ অসঙ্গতি হয়। বিশেষতঃ, 'এব' শব্দ দ্বারাও হেত্বন্তরের নিরাশ করিয়াছেন, উহাও উক্ত ভূতাকাশ সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না। কারণ, মৃদাদির ও ঘটাদির কারণতা দৃষ্ট হয়; আকাশ পদে ব্রহ্ম বোধ করাইলে আর কোন অসঙ্গতি হয় না, শক্তিমদ্ ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। আকাশ শব্দ ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও বলবত্তী শ্রৌতি প্রসিদ্ধ অনুসারে ব্রহ্মাকেই বোধ করিতেছে।—অর্থাৎ আকাশেরও ও যে আকাশ,—তাহার যে প্রাণ বা চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম। হিন্দু, সেই আকাশতত্ত্বকেই আরাধনা করিয়া থাকে,—জড় আকাশকে করে না। অন্যান্য ধর্ম্মিগণ এই সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে আজিও অক্ষম আছেন বলিয়া বলেন,—হিন্দুগণ জড়েরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে ফুলের গন্ধোপাদান বুঝে না, যে ফুলের সৌন্দর্য্য-শোভা দর্শনে অক্ষম, সে অবশ্যই বুঝিতে পারে না, কেন মানুষ ঐ জড় পদার্থের অত যত্ন করে।

শিষ্য। বায়ু সম্বন্ধেও কি ঐরূপ যুক্তি আছে?

গুরু। আছে বৈ কি। আকাশ হইতেই বায়ু।

আকাশাদ্বায়ুঃ।—তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লরী।

আকাশ হইতে বায়ু; কিন্তু বায়ু যে, আকাশের সৃজিত তাহা নহে। বায়ুও সেই অব্যক্ত সত্তায় লীন ছিল, আকাশের সাথে মিশিয়া বাহিরে আসিয়া তাহা হইতে আবার ব্যক্ত হইয়াছে। লবণ যেমন পৃথিবীর পদার্থ,—কিন্তু জলের বা অন্য কোন বস্তুর সহিত মিশিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ আকাশ হইতে বায়ুর ব্যক্তভাব। যে স্থলে কার্য্য আছে, সেই স্থলেই গতি (motion) আছে। কেননা কার্য্যের শব্দ হেতু কম্পন উত্থিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সেই কম্পনের প্রতিরূপকেই গতি বলা হইয়া থাকে। গতির দ্বারাই স্পর্শ জ্ঞান

হয়,—বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটি সত্তাই আছে। বায়ু জগত্রয়ের প্রাণ স্বরূপ।

বায়ুর্বৈ গৌতম সূত্রেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চঃ লোকঃ, সর্ব্বাণি চ ভূতানি সব্দ্ধানি ভবন্তি। শ্রুতি।

"গৌতম! মণিগণ যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে, ভূতসমুদয় সেইরূপ বায়ু-সূত্রে গাঁথা আছে।"

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

কঠশ্রুতি।

"এই সমস্ত জগৎ, প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত ও কম্পিত বা চেষ্টমান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। সেইরূপে তাঁহাকে যাঁহারা জানেন,— তাঁহারা অমৃত হন।"

বায়ু কাঁপিয়া কাঁপিয়া জগতের আধার হইয়াছেন। কম্পনাত্মক ব্রহ্ম ভয়ানক। কম্পনের বেগাতিশয্যে সংহারও হইতে পারে। জগতের সকলই কম্পনে অবস্থিত। কম্পনের দ্বারাই আমাদের আবেদন-নিবেদন, আমাদের মনের ইচ্ছা-কামনা কাতর প্রার্থনা সর্ব্বত্র চলিয়া যায়;—জগৎ কম্পনেই অবস্থিত। কাজেই কম্পনের দেবতা বায়ু বিশ্বের প্রাণ। কিন্তু স্থূল বায়ু নহে,—বায়ুর বায়ুত্ব তাহাই কম্পন,—সেই কম্পনই বিশ্ব প্রাণ। বেদান্ত বলিতেছেন,—

অতএব প্রাণঃ।—বেদান্তদর্শন, ১।১।২৩

"প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। কুতঃ, অতএব সর্ব্ব-ভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতুতয়া পাদ্ব্রহ্ম লিঙ্গাদেব।" ২৩।

বায়ু দেবতা প্রাণ—কিন্তু সে বহির্ব্বায়ু বা জড় বায়ু নহে। প্রাণ হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রাণেতেই তাহাদের লয়। বেদান্ত

বলিতেছেন,—"প্রাণ বহির্ব্বায়ু নহে, সর্ব্বেশ্বর। কারণ, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ একমাত্র সেই সর্ব্বেশ্বর।"

বোধ হয়, তুমি এক্ষণে বুঝিয়াছ যে, জড় বায়ু হিন্দুর উপাস্য নহে। প্রভঞ্জনেরও যে প্রাণ,—সেই বিশ্বপ্রাণই হিন্দুর আরাধ্য। তারপরে বোধ হয়, তেজ বা অগ্নির কথা তোমার জিজ্ঞাস্য হইবে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। তেজ সম্বন্ধেও কিছু জানিতে বাসনা করি।

গুরু। বায়ু হইতে অগ্নির বিকাশ-বিসৃষ্টি। বায়ু হইতে যে অগ্নির উৎপত্তি, তাহা তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত। কিন্তু হিন্দুর মত একটু স্বতন্ত্র,—স্বতন্ত্র এই জন্য যে, হিন্দু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজ্যের সন্ধানে কৃতকার্য্য। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি বটে, কিন্তু বায়ুই অগ্নির জনক নহে—অগ্নি বায়ুর বিকাশ বা মূর্ত্তি। অগ্নি যে ছিল না, তাহা নহে। অগ্নিতত্ত্ব ব্রহ্মেই অব্যক্ত ভাবে বিলীন ছিল,—বায়ুর স্কন্ধে চাপিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টির এইরূপই ক্রমবিবর্ত্তন। অগ্নি তেজ, এই তেজেই জগৎ রক্ষিত, পালিত ও সংহৃত। অগ্নিই সৃষ্টিব্যাপারের অমূর্ত্তির মূর্ত্তিকারক। তেজোরূপী অগ্নিই ত্রিলোক ধারণ করিয়া আছেন। অগ্নিরই মূর্ত্তি আমাদের পৃথিবী—অগ্নিই ভূর্লোকের দেবতা। অগ্নির দ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম। জঠরাগ্নিতে আমরা ভুক্ত দ্রব্য হজম করি। তেজেই আশোষণ করি,—ভুবর্লোকবাসিগণও অগ্নির দ্বারা ভোজন করেন, স্বর্গলোকবাসিগণও তাহাই। অগ্নি ব্যতীত কাহারই বর্দ্ধন হইতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্যেও তেজোরূপী অগ্নি,—সংহার কার্য্যেও অগ্নি। কিন্তু সেই অগ্নি কি যাহা আমাদের সম্মুখে জ্বলিয়া নির্ব্বাণ পায়, তাহাই? তাহা নহে। অগ্নির যে প্রাণতত্ত্ব, অগ্নির যে অগ্নিত্ব, তাহাই। বেদান্ত বলেন,—

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। বেদান্তদর্শন, ১।১।২৪।

"জ্যোতিরত্র ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যম্। কুতঃ? চরণেতি। তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়শ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি পূর্ব্বত্রহ্যাসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বভূতপাদত্বোক্তেঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্—পূর্ব্বং হি পাদোঽস্যেতি চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবেহ যদিতি যচ্ছব্দেনানুবর্ত্তিতমিত্যস্য সন্নিধিভঙ্গাদুভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধশ্রবণাবিশেষাচ্চ নিখিলতেজস্বী হরিরেব জ্যোতির্ন ত্বাদিত্যাদিরিতি ॥" ২৪।

ঐ জ্যোতিঃ শব্দে প্রাকৃত তেজঃ পদার্থ, কি ব্রহ্ম? সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী তেজঃ অথবা অগ্নি ইহারাই কি জীবের ধ্যেয়? তাহা নহে। বেদান্ত বলিতেছেন,—"জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মই বোধ করাইতেছে। কারণ, সমস্ত জগৎ পুরুষের একটি অংশবিশেষ। স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঐ পুরুষে ত্রিপাদ অনন্ত অমৃত। শ্রুতিতে প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থই ব্রহ্মাংশভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরুষই নিখিল তেজের আধার স্বরূপ হইতেছেন।"

অগ্নিতত্ত্ব ঈশ্বরের সত্তা, অতএব অগ্নিপূজক হিন্দু, ব্রহ্মোপাসক, জড়োপাসক নহেন।

শিষ্য। হিন্দু, জল এবং স্থূল পৃথিবীকেও পূজা করিয়া থাকে।

গুরু। উহারাও মহাপঞ্চভূতের দুই মহাভূত। কিন্তু আকাশ, বায়ু ও অগ্নি সম্বন্ধে যেরূপ শুনিলে, অর্থাৎ উহাদিগের তত্ত্ব বা স্বরূপ যে ঐশ-পদার্থ তাহাই হিন্দু পূজা করিয়া থাকে। এই দুই মহাভূত সম্বন্ধেও তাহাই। অগ্নি হইতে জলের সৃষ্টি হয়, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহাতে জলের সৃষ্টি হয় না,—অগ্নিতে জল অধ্যাসিত ছিল,—অগ্নি তাহার অবজ্ঞানক মাত্র।

অগ্নেরাপঃ। তৈত্তিরীয়।

অগ্নি হইতে জল। হিন্দু স্থূল বা জলের আরাধনা করে না,—জলের যাহা সত্তা, জলের যাহা প্রাণ, সেই রস-তত্ত্বই কারণ জল। কারণ জলই

নারায়ণ। তাই হিন্দু জানে, "আপো নারায়ণ।" জল-তত্ত্বে সৃষ্টির সত্তা ; কেননা রস-তত্ত্বের উদয় না হইলে সংযোগ সাধিত হয় না। অন্ধাদি আকর্ষণে পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ সাধিত হয়, সেই সংযোগে এক মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। রস-তত্ত্বেই ভৌতিক স্থিতি,—রস-তত্ত্বেই সংহার। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ইহা জলের জড় মূর্ত্তি নহে।

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। তৈত্তিরীয়।

জলের আণবিক আকুঞ্চনে জাত্যন্তরবিবর্ত্তন ঘটিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই বিবর্ত্তনে বহুর সৃষ্টি হয়। ভগবানের "বহু হইব," এই বাসনার শেষ উৎকর্ষ বা সীমা এই পৃথিবী। কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীকেই হিন্দু আরাধনা করেন না। পৃথ্বীতত্ত্ব,—যাহা লইয়া জগৎভাব, সেই ঐশ-সত্তাকেই হিন্দু আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই হিন্দু, আধারস্থলরূপী পৃথ্বীতত্ত্বময় বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করেন,—

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিতসুভগমাস্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং নমামি ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হিন্দু বহু উপাসক নহে।

শিষ্য। তাহা হইলে হিন্দুগণ, জড়ের উপাসনা করেন না বটে, কিন্তু জড়ের যাহা প্রাণ বা সূক্ষ্ম-শক্তি-তত্ত্ব অথবা অব্যক্তবীজ, হিন্দুগণ

তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আরাধনার জন্য যে সকল ধ্যান মন্ত্রাদির ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাতেও তাঁহাদের রূপ আছে বলিয়াই জ্ঞান হয়। আর বহুজড়ে, বহুদেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন,—কিন্তু একটি প্রাণ, বহুজনের আরাধনা করিলে, আরাধনার পূর্ণতা হইতে পারে কি না, এরূপ সন্দেহ অনেকে করেন।

গুরু। এতক্ষণ বুঝাইলাম কি? ভূমি, অপ, অনল, জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি যাহা কিছু বল,—বা মিশ্রভূতোৎপন্ন অন্য শক্তিই বল,—ফল, এই পরিদৃশ্যমান জগত্রয়ে চেতন অচেতন প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক পদার্থ আছে—সে সমুদয়ই ঈশ্বর। শাস্ত্রে আছে—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবচাহম্॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ১৫ শ অঃ।

ভগবান্ বলিতেছেন,—

"চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধিসমুদয়ের পুষ্টিসাধন করিতেছি। আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি। আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে, আমি চারিবেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ, লোকে প্রসিদ্ধ আছে ; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা,—সেই অব্যয় পরমাত্মা এই ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করে।"

শিষ্য। তবে, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, পাতা, সংহর্ত্তা ভগবান্‌কে উপাসনা করিলেই হইতে পারে, তাঁহার বিক্ষিপ্তশক্তিসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আরাধনা করা কেন?

গুরু। ভগবান্ অনন্ত—মানুষ সান্ত। সান্ত হইয়া অনন্তের ধারণা করিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ আমাদের চিত্তবৃত্তি সমুদয়ের উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, সেই চরমোৎকর্ষ পুরুষের সত্তা বুঝিতে পারিব কেন? মানবে বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে যত প্রকার শক্তি ও ভাব আছে, তাহা দেবতারই সূক্ষ্মশক্তি, এই দেবশক্তি সকলের পূর্ণ চৈতন্য সাধন

করিতে না পারিলে, পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। দেবশক্তি জাগ্রত করণের যে সাধনা, তাহাই দেবতার আরাধনা। মনে কর, কর্ণ শব্দেন্দ্রিয়,—শব্দ হয় ব্যোম হইতে, কিন্তু ব্যোমের যে প্রাণ বা সূক্ষ্মশক্তি বা ব্যোমতত্ত্ব,—সেই ব্যোমতত্ত্বের আরাধনা করিয়া ব্যোম-তত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। এইরূপ সমস্ত তত্ত্ব সম্বন্ধেই জানিবে। আরাধনাকে শক্তির উৎকর্ষ সাধন বলা যাইতে পারে।

ফলতঃ, হিন্দু জড়ের উপাসনা করে না। হিন্দু জানে, এই পরিদৃশ্য-মান পদার্থ জড়, কিন্তু জড়েও চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান। জড়ও ভগবানের বিভূতি। ভগবান্ই সমুদয় জড়ের অন্তরে অবস্থিত আছেন। তবে একটা একটা করিয়া চৌষট্টিটা পয়সা একত্র করিয়া যেমন একটী টাকা বাঁধা যায়, তদ্রূপ সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ এক এক করিয়া জানিয়া এবং তাহাদের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তবে পূর্ণতার দিকে যাইতে হয়। হিন্দু জানেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ শ অঃ।

"হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত (পুতুল) সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।"

হিন্দু জড়োপাসনা করেন না,—জড়ের প্রাণাত্মক পরমচৈতন্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে যে যে জড়ে তাঁহার যে শক্তির আধিক্য,—হিন্দু তাহাতেই তাঁহাকে সেই শক্তিধররূপে পূজা করিয়া থাকে।

ইহাতে হিন্দুকে বহু-উপাসকও বলিতে পার না, অথবা যাঁহারা বলেন,—তাঁহারাও অভ্রান্ত নহেন।

নবীনবাবু ওকালতী করেন, মহাজনী করেন এবং পাটের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। একজন তাঁহার নিকটে আইন জানিবার জন্য গমন করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে,—"উকিলবাড়ী যাইতেছি।" যে তাঁহার নিকটে টাকা ধার করিতে বা ধার শোধ করিতে যাইতেছে, সে বলিবে "মহাজনবাড়ী যাইতেছি।" আর যে পাট খরিদ-বিক্রয়ার্থ যাইবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে,—"ব্যবসাদারের বাড়ী যাইতেছি।" কিন্তু ফলে, তিন জনেই নবীনবাবুর বাড়ী যাইতেছে। বিভিন্ন গুণ বা কর্ম্মজন্য যেমন এক নবীনবাবু তিন প্রকার নামে আখ্যাত হইতেছেন, তেমনি ঈশ্বর গুণ বা কর্ম্মভেদ জন্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতি বৃহৎ প্রভৃতি বহুশক্তি সমন্বিত হইয়া বহুদেবতায় অবস্থিত রহিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে তাঁহার সেই সকল অদৃষ্ট-শক্তির আরাধনা করিতে হয়; কিন্তু আরাধনা তাঁহারই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক,-মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ম অঃ।

"কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য (ঘৃত), অগ্নি ও হোম। আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা ; আমি জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র ওঁকার, ঋক্, সাম, যজুঃ। আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব (উৎপাদক), প্রলয় (সংহারক), আধার, লয়ের স্থান ও অব্যয় বীজ। আমি উত্তাপপ্রদান, বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি, আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ, অসৎ ; একারণ লোকে আমাকে নানারূপে উপাসনা করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মাগণ, যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন ; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী

হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূত-সেবকেরা ভূতসকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

গীতোক্ত বচনাবলীতে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহার সারমর্ম্ম, তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ,—ভগবান্ সর্ব্বভূতপতি। সকল ভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান,—যে, যে প্রকারে যাহারই আরাধনা করুক, অবিধিপূর্ব্বক তাহা তাঁহারই আরাধনা হয়। যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা যাহা কিছু বল, সমস্তই তিনি। তবে কথা এই যে, যে যাহার আরাধনা করে,—সে তদ্ভাব-ভাবিত হয়। অতএব, হিন্দু বহু উপাসক নহেন, অধিকারী ভেদে আরাধনার প্রকার ভেদ মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবতাপূজার প্রয়োজন।

শিষ্য। যে দেবগণের আরাধনা করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়, যে পিতৃগণের আরাধনা করে (শ্রাদ্ধাদিদ্বারা) সে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় ও ভূতোপাসকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরোপাসকগণ ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়,—ইহাই বলিলেন। তবে দেবাদির আরাধনা করা ত কখনই কর্ত্তব্য

নহে। কারণ, স্বর্গাদিরও ভোগকালের ক্ষয় আছে এবং যাহা ভোগ, তাহাতেই সুখ ও দুঃখ আছে। স্বর্গেও ভোগ, ভোগের ক্ষয়েই দুঃখ। আর পুনঃপুনঃ জন্ম-জরারূপ দুঃখ ত আছেই। এবং মানুষের যদি ধর্ম্ম করিতেই হয়, তবে ঐ সকল দেবতাদির আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মাত্র পরমেশ্বরকে উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। খালে, জোলে, বিলে জলের জন্য না দৌড়াইয়া, সাগর যখন নিকটে আছে, তখন সাগরে যাওয়াই ভাল। একজন পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ।"

গুরু। কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান কি? "হে পরমেশ্বর! তুমি দয়াময়,—তুমি আমাকে ত্রাণ কর, আমাকে উদ্ধার কর"—ইহাই পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞান নহে। জ্ঞান অর্থে জানা। কালীপদ মাষ্টারকে তুমি জান কি?

শিষ্য। হাঁ জানি।

গুরু। কি প্রকারে জান?

শিষ্য। তিনি আমাদের মাষ্টার ছিলেন,—সাত আট বৎসর তাঁহার নিকটে অধ্যয়নাদি করিয়াছি।

গুরু। তিনি কেমন পণ্ডিত জান?

শিষ্য। জানি,—তিনি খুব পণ্ডিত।

গুরু। তাঁহার বাড়ী কোথায় জান?

শিষ্য। না, তাহা জানি না।

গুরু। তাঁহার কয়টি সন্তান হইয়াছে জান?

* The first element of pure religion is the idea of the Almighty.—The mind of man, by a Smee. P. 137.

শিষ্য। একটি ছেলে কলেজে আসিত, তাহার নাম মহেন্দ্র; তাহাকেই জানি;—আর কয়টি আছে না আছে, তাহা জানি না।

গুরু। তাঁহার আর্থিক অবস্থা কেমন?

শিষ্য। তাহা ঠিক জানি না,—তবে খুব ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কলেজে যাহা বেতন পান, তদ্দ্বারাই যেন কোন প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

গুরু। তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ।

শিষ্য। আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিয়াছি? কি মিথ্যা বলিয়াছি মহাশয়?

গুরু। কালীপদবাবুকে তুমি জান না,—অথচ বলিলে জানি। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সমস্ত দিক্ জানিতে হইবে; তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, আর্থিক অবস্থা, বিদ্যাবত্তা, সাংসারিক অবস্থা, দৈহিক সুস্থাসুস্থতা—এমন কি তাঁহার দৈহিক গঠন ও গঠনের উপাদানাবলী পর্য্যন্ত জানিলে, তবে তাঁহাকে জানিয়াছ বলা যাইতে পারিবে। সেইরূপ ঈশ্বর কোন্ পদার্থ জানিতে হইলে, ঈশ্বর তত্ত্বসমুদয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর পদার্থ জানিবার চেষ্টা ও কার্য্যমাত্রের পরমকারণানুসন্ধান করা—ইহা একই কথা। বৈচিত্র্যময়ী বাহ্যপ্রকৃতির শোভা সম্পদ ও স্বভাব দর্শন করিয়া কারণের অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এ প্রকারের অনুমানে,—পূর্ণতম ঈশ্বরের বা কারণের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। মনে কর, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই পদার্থের একত্র মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়,—তোমার এই জ্ঞান আছে। কিন্তু এই জ্ঞানই কি চরম জ্ঞান? তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত টেট্ বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক পরিণাম সকলের কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নির্ণয় এবং নির্ণীত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে গণিতিক প্রমাণে প্রমাণিত করা, অর্থাৎ কোন

একটি কার্য্য কোন্ কোন্ উদাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন তাহাদের মাত্রিক সম্বন্ধ কিরূপ তন্নির্দ্ধারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কার্য্য।"

ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্বই জগত্তত্ত্ব। অতএব, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে জগৎকে জানিতে হইবে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতির বাহির্, অন্তর্, বুদ্ধ ও অধ্যাত্ম সমস্ত স্থূল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে হইবে, সমস্ত পদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে। বিশ্বময় বিশ্বরূপ যে জগদ্রূপ,—জগৎ না বুঝিলে, তাঁহাকে বুঝিবে কি প্রকারে? তাঁহাকে বুঝাই যদি ধর্ম্ম বল,—তবে সেই-ই কথা; তাঁহাকে বুঝিবারই চেষ্টা কর; ব্রহ্মের ধ্যান জান?

শিষ্য। ধ্যান ত রূপ বর্ণনা?

গুরু। স্থূলতঃ তাহাই। সূক্ষ্মভাব পরে বলিব।

শিষ্য। না,—ব্রহ্মের ধ্যান জানি না।

গুরু। ব্রহ্মের ধ্যান এই—

> হৃদয়-কমল-মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
> হরি-হর-বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যান-গম্যম্।
> জনন-মরণ-ভীতিধ্বংসি সচ্চিৎস্বরূপং,
> সকলভুবন-বীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে॥

ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব স্বরূপ। তিনি সকল ভুবনের বীজ, সমস্ত ভুবনের হৃদয়-কমল-মধ্যে নিরীহ ও নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অবস্থিত। হরি-হর-বিধি

* That which is properly called physical science is the knowledge of relations between natural phenomena and their physical antecedents, as necessary sequences of cause and effect, these relations being investigated by the aid of Mathematics.—W. Recent Advances in Physical Science. p. 348.

তাঁহাকে জানেন এবং যোগিগণ ধ্যানদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন। তিনি সৎ চিৎ এবং জনন-মরণ-ভীতি-বিধ্বংসি।

সকল ভুবনের* বীজ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, তাঁহার সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তি দেবতাগণকে জানিতে হইবে। দেবতাগণই স্থূল বিশ্বের মূল। কাজেই দেবতার আরাধনা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যাইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আরাধনা।

শিষ্য। সর্ব্বভূতের পরমাত্মা পরব্রহ্ম,—তাঁহারই অদৃষ্ট-সূক্ষ্ম শক্তি ত্রিজগতের কার্য্য করিবার জন্য দেবতারূপে আবির্ভূত; কিন্তু তাঁহাদিগের আরাধনা করিবার মানুষের প্রয়োজন কি?

গুরু। দুইটি প্রয়োজনে মানুষকে দেবতার আরাধনা করিতে হয়। কিন্তু আরাধনা কি তাহা জান ত?

শিষ্য। বোধ হয়, আরাধ্য জনকে স্ববশে আনিয়া, আপন অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদনের নাম আরাধনা হইতে পাবে।

গুরু। হাঁ,—তাহাই। উপাসনা শব্দের অর্থ অবগত আছ?

শিষ্য। উপাস্য পদার্থে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা বা করিবার চেষ্টাকে উপাসনা বলা হইয়া থাকে।

গুরু। তাহাই। এক্ষণে দেবতার আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি,—এই বিষয় আলোচনা করিবার আগে, প্রয়োজন শব্দটিরও অর্থ করিতে হইবে। কেন না,—

সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে॥

সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সাভিধেয়কঃ ॥

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ-কৃত-মুগ্ধবোধ-টীকা।

"সমস্ত শাস্ত্রে কর্ম্ম প্রভৃতি যাহা কিছু হউক, যে পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন বলা না হয়, সে পর্য্যন্ত কেহই উহা গ্রহণ করে না; অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিই হউক বা কোন কর্ম্মই হউক, তাহার প্রয়োজন বিদিত হইতে না পারিলে, কেহই তাহা গ্রহণ করে না;—প্রয়োজন জানিতে পারিলে, তবেই লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব প্রয়োজন-বোধই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণ। সিদ্ধার্থ ও সিদ্ধসম্বন্ধকে * শ্রবণ করিতেই শ্রোতার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে, পূর্ব্বকালে গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাহার প্রয়োজন ও সাভিধেয় সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতেন।"

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।

ন্যায়দর্শন ১।১।২৪

"যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই প্রয়োজন।"

পিপাসা নিবৃত্তি হইবে বলিয়া জীবে জলপান করে, অতএব জল-সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন। ঝড়, বাতাস এবং উত্তাপ ও শীতলতা হইতে দেহ রক্ষা না করিলে, আমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হয়, সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য গৃহ বাঁধিবার প্রয়োজন, গৃহের জন্য আবার ইট, কাঠ, চূণ ও বালি সংগ্রহের প্রয়োজন।

যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে, তৎপ্রয়োজনম্। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১।১।১

---

* যাহার প্রয়োজন জানা হইয়াছে, তাহাই সিদ্ধার্থ।
প্রতিপাদিত হইয়াছে যাহার সম্বন্ধ, তাহাই সিদ্ধসম্বন্ধ।

"যৎকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা প্রয়োজন। সমুদয় জীবই প্রয়োজনবিশিষ্ট। কর্ম্মমাত্রই সপ্রয়োজন। সকল বিদ্যাই প্রয়োজনব্যাপ্ত। প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থ ই কর্ম্মশীল;—জগতের কোন পদার্থই কর্ম্মশূন্য নহে। অতএব, জগতের সমুদয় পদার্থ ই কর্ম্মে ব্যাপ্ত।"

শিষ্য। যাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই প্রয়োজন। কিন্তু কাহার কর্তৃক লোক প্রযুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়?

গুরু। বোধ হয় সুখ। সুখের আশাতেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়;—বোধ হয়, সুখই প্রয়োজন।

শিষ্য। সুখের আশাতেই কি লোকে সমুদয় কর্ম্ম করিয়া থাকে?

গুরু। হাঁ। কেবল লোক কেন, চেতন অচেতন প্রভৃতি জগতীস্থ সমস্ত পদার্থ ই সুখের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

শিষ্য। ঐ ক্ষুদ্র শিশু টীপি টীপি হাটিয়া যাইতে দশবার পড়িয়া যাইতেছে, হাটিয়া ও কি সুখ পাইতেছে,—বা কি সুখের জন্য ও হাটিতে চেষ্টা করিতেছে—উহাতে উহার কি প্রয়োজন বা সুখের আশা আছে?

গুরু। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারিলে, নূতন নূতন পদার্থ দেখিতে পাইবে,—স্বাবলম্বনে ভ্রমণ করিতে পাইবে, এই আশাতেই তাহার হাটিবার প্রবৃত্তি। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাহাকে ঐ সুখের আশায় আশান্বিত করাইয়া থাকে। ফলতঃ জগতের সমস্ত কার্য্যেই সুখের আশা করিয়া সমস্ত জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই প্রয়োজনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গৌণ প্রয়োজন। সুখ এবং দুঃখের অভাব ইহাই মুখ্য প্রয়োজন; এবং সুখের সাধন ও দুঃখের অভাব সাধন—ইহাই গৌণ প্রয়োজন।

অথ নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ত্বাৎ সুখদুঃখাভাবয়োর্মুখ্যপ্রয়োজনত্বং, তদুপায়স্ত তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্ গৌণপ্রয়োজনত্বম্ ॥

ন্যায়-সূত্রবৃত্তি ১।১।২৪

গৃহ বাঁধিবার প্রয়োজন,—গৃহ বাঁধিবার ইচ্ছার বিষয় তাহাতে বাস করা,—বাস করিবার জন্য ঐ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন, শীত আতপাদি হইতে দেহ রক্ষা—দুঃখের হাত হইতে দেহ রক্ষা করিয়া সুখপ্রাপ্তি। সুখবিশেষ প্রাপ্তির প্রয়োজনের অন্য প্রয়োজন নাই, ইহা অন্যেচ্ছাধীনতা নহে, ইহা নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়। দুঃখাভাবরূপ প্রয়োজনও এই প্রকার অন্যের ইচ্ছার অধীন বিষয় নহে, কাজেই ইহা নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়। যাহা অন্যের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছার বিষয় নহে (Not dependent on other motive or end) তাহাকেই মুখ্য প্রয়োজন, আর যাহা অন্যের ইচ্ছার অধীনেচ্ছা-বিষয় (Dependent on other motive or motives), মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধির যাহা করণ অথবা সাধন তাহাকেই গৌণ প্রয়োজন বলা যায়।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম যে, প্রয়োজন (motive) ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না; এবং যাহার উদ্দেশ্যে বা যাহাকে ইচ্ছা করিয়া অথবা যাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কার্য্য করা যায়, তাহাই প্রয়োজন। আপনার প্রসাদে বুঝিতে পারিলাম, একমাত্র সুখই জগতের চেতনাচেতন জগতের সমস্ত পদার্থেরই অভিলষিত পদার্থ। সুখের কামনাতেই জগতের সকলের কার্য্য করা, সুখ দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াই কার্য্য করা যায়,—অতএব সুখই প্রয়োজন। কিন্তু সুখ এমন কি পদার্থ;—যাহার জন্য চেতনাচেতন জগতের সমস্ত পদার্থ আকাঙ্ক্ষিত? সুখের স্বরূপ ব্যাখ্যাটি বলুন।

গুরু। অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য যে মনের বিকৃতি ভাব হয়,

তাহাকেই সাধারণতঃ "সুখ" বলা যাইতে পারে। নিরুক্ত এবং নিরুক্তের টীকাতে সুখের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—

সুখং কস্মাৎ সুহিতং খেভ্যঃ। খং পুনঃ খনতেঃ।

নিরুক্তঃ ৩।৩।১

অতিশয়েন হিতং পুরুষস্ত খেভ্যঃ খহেতুকমিত্যর্থঃ। হিতং বা পুরুষে আত্মধর্ম্মত্বাৎ সুখাদীনাং ধর্ম্মাধিকরণত্বাচ্চ ধর্ম্মিণাম্। * * "খ" পুনঃ খনতেঃ উৎপূর্ব্বস্ত উৎখনতি বিনাশয়তি,—কিম্? পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখম্। কথম্? কায়সুখপ্রবৃত্তেরধীগমনাৎ ইতি সুখম্।

শ্রীদেবরাজযজ্ব কৃত নির্ঘণ্ট টীকা।

সুহিতং সুষ্ঠু হিতমেতঃ খেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। খং পুনঃ ইন্দ্রিয়ম্ খনতেঃ ধাতোঃ।

দুর্গাচার্য্য কৃত টীকা।

"খ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। খ-হেতুক—ইন্দ্রিয়জন্য—বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জনিত মানস-বিকার বিশেষের নাম সুখ; অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহা সুখ; কিম্বা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখকে যাহা খনন করে—নাশ করে—পরিচ্ছিন্ন করে—আবৃত করিয়া রাখে, তাহা সুখ।" *

শিষ্য। এই স্থলেই গোল বাধিল।

গুরু। কোন্ স্থলে?

শিষ্য। সুখের যে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ করিলেন,—তাহা পরস্পর পরস্পরার্থের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল।

গুরু। কোন্ কোন্ স্থলে?

শিষ্য। প্রথমে বলিলেন ত—ইন্দ্রিয়ের বিষয়গোচর জ্ঞান দ্বারা মনের যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাকে সুখ বলে?

গুরু। হাঁ, স্থূলার্থ ঐরূপই।

* আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ।

শিষ্য। আবার বলিলেন,—আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সুখ। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম কি?—বোধ হয়, মুক্তি হওয়া বা ঈশ্বর-সাজুয্য-লাভ করা।

গুরু। ঠিক ঐরূপ নহে, তবে ভাবটা উহাই বটে,—ভগবান্ পূর্ণ, পূর্ণতা লাভ করাই আত্মার ধর্ম্ম।

শিষ্য। তারপরে, আবার বলিলেন,—পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুখকে যাহা নষ্ট করে,—আবৃত করিয়া রাখে, তাহাই সুখ। পূর্ব্বোক্ত অর্থের সহিত, এ কথার কি অনৈক্য হয় নাই?

গুরু। না; যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে আনন্দ—তাহাতে আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়,—দেবতার সন্নিকটস্থ করে, অথবা নরত্ব ঘুচাইয়া দেবত্বে পরিণত করতঃ স্বর্গে লইয়া যায়,—কিন্তু তাহাই আমাদিগকে ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে আবৃত রাখে। কথাটা একটু পরে পরিস্ফুট করা যাইবে। তবে—

এবোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ জনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ। বৈষয়িক আনন্দ * বাস্তবিক পরমানন্দ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। পরমানন্দের মাত্রা বা অংশই বিষয়ানন্দ। ভগবান্ আনন্দ স্বরূপ,—তিনিই পূর্ণানন্দ বা পরমানন্দ; জীব সেই পরমানন্দেরই কণামাত্র বিষয়ে উপভোগ করে,—পরমানন্দের কণামাত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে।"

তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের যে আনন্দ, তাহা

* বিষয় অর্থাৎ পদার্থ হইতে যে আনন্দ হয়। স্ত্রী-পুত্রাদির মিলনে যে আনন্দ, তাহাদিগকে সুখী দেখিলে যে আনন্দ, টাকা কড়ি বিষয়াদি পাইলে যে আনন্দ, যে কোন বস্তুর উপভোগে যে আনন্দ—স্থূলকথা, পার্থিব পদার্থের যে কোন বিষয় হইতেই আনন্দ হয়, তাহাকেই বৈষয়িক আনন্দ বলে।

আনন্দের কণামাত্র—আর আনন্দের পূর্ণতা পরমানন্দ। যখন সুখই জগতের সমুদয় পদার্থের বাঞ্ছিত, তখন সেই পূর্ণানন্দ ভগবানই জগতের বস্তু মাত্রেরই লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়। সেই পূর্ণানন্দ—সেই অখণ্ড সুখ পাইবার জন্যই জগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল এবং সতত চঞ্চল।

এক্ষণে কি উপায়ে সেই সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জানিবার প্রয়োজন। সুখ পাইবার জন্য—সুখী হইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। সুখের আশাতেই জীব-জগৎ লালায়িত, সুখলাভ করিবার জন্যই দেবতা ও আরাধনার প্রয়োজন। দেবতার আরাধনা সেই সুখপ্রাপ্তির জন্যই হইয়া থাকে, অথবা দেবারাধনা সুখপ্রাপ্তির উপায় বলা যাইতে পারে।

সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তিকে আপন বশে আনিয়া তদ্দ্বারা সুখলাভ করাই দেবতার আরাধনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের স্বরূপ।

শিষ্য। দেবতার আরাধনা করিলে সুখ লাভ হয়?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। বলিয়াছি ত, সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তিকে স্ববশে আনিয়া তদ্দ্বারা অভীষ্ট পূরণ করাই দেবতার আরাধনা।

শিষ্য। কথাটি আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ড আনন্দময়—পরমানন্দ। তিনি ভিন্ন আর সকলই আনন্দের কলা বা কণা। পূর্ণতম সুখাধারই তিনি,—সুখ বা আনন্দ লাভ করিতে হইলে,

তাঁহাকেই জানা বা তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। দেবদেবীর আরাধনা করিলে কি, হইবে?

গুরু। সুখলাভ এবং দুঃখের নিবৃত্তি,—এই দুইটি জীবমাত্রেরই প্রয়োজন। কিন্তু জানিতে হইবে,—জীব যে সুখের আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ নিবৃত্তির কামনা করে,—সেই সুখ ও দুঃখ কি প্রকার? সুখ কি,—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; দুঃখ কি, তাহা বলিতেছি। আলোর অভাব যেমন ছায়া, সুখের অভাবই তদ্রূপ দুঃখ। এই দুঃখ ত্রিবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। শরীর ও মনোমাত্র দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই দোষত্রয়ের বৈষম্য জন্য যে দুঃখ হয়, তাহাকে শরীর হইতে উৎপন্ন দুঃখ এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মানস পদার্থ হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে মানস দুঃখ বলে। এই উভয় প্রকারে সমুৎপন্ন দুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

দেবতাগণ কর্ত্তৃক যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণ, নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহদ্বারা যে সকল দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাই দৈব কর্ত্তৃক দুঃখ বা আধিদৈবিক দুঃখ। ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব ও স্থাবর পদার্থজাত হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ।

এখন, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই সুখ।

শিষ্য। কি উপায়ে এই ত্রিবিধ প্রকারের দুঃখ সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হইতে পারে?

গুরু। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা যাইতে পারে—দেবতার আরাধনায়।

শিষ্য। দেবতার আরাধনা করিলে, এই ত্রিবিধ প্রকার দুঃখেরই সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। দেবতাগণ কি আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বরদানপূর্ব্বক এই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

গুরু। দেবতা আমাদের দেহেই আছেন,—আমাদের আশে পাশেই আছেন। তাঁহারা বর দান করেন বৈ কি,—বর দানেই আমাদিগের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

শিষ্য। কলিকালেও কি দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দান করিয়া থাকেন?

গুরু। নিশ্চয়ই। তবে আমরা কলির জীব—আমরা কলি-কল্মষময় হইয়া পড়িয়াছি—দেবতার আরাধনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তাই দেবতাগণ আমাদিগকে বর দান করেন না। তুমি যদি আমার নিকটে এই সকল কথা শুনিতে না আসিতে, শুনিবার জন্য যদি তোমার আকুল-আকাঙ্ক্ষা না হইত, আমি কি তোমাকে শুনাইতাম? তেমনি, দেবতাগণকে আমরা আরাধনা না করিলে,—আমাদের অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা না করিলে, তাঁহারা কি করিয়া আমাদের দুঃখের নিবৃত্তি করিবেন?

শিষ্য। দেবতার আরাধনাতেই যদি রোগ-শোক-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, দেবতার আরাধনাতেই যদি ঝড় জল অগ্নি ইত্যাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়,—দেবতার আরাধনাতেই যদি অন্নের অভাব ঘুচিয়া যায়, তবে মানুষের এত ছুটাছুটি কেন? মানুষের এত বিজ্ঞান দর্শনের ঘাটাঘাটিই বা কেন?

গুরু। আমি যদি তোমাকে বলি, হিমশৈলের সৈকত-প্রস্রবণে স্বর্ণ বিন্দু পাওয়া যায়,—আর তুমি যদি আমার নিকটে দাঁড়াইয়াই বল যে, হাঁ মহাশয়! তাহা হইলে কি আর ভাবনা থাকিত—তাহা হইলে মানুষ কি আর এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া দাসত্ব করিয়া কষ্টে সৃষ্টে উদর পূরণ করিত? তাহা হইলে সকলে মিলিয়া হিমশৈলের সৈকত-স্রোতে গিয়া আচল পাতিয়া বসিয়া থাকিত; এবং স্বর্ণ কুড়াইয়া আনিয়া রাজত্ব করিত;—ইহা বলাও যেমন অসঙ্গত, আর তোমার প্রাগুক্ত কথা বলাও তদ্রূপ অসঙ্গত। কারণ, আমার নিকটে কথাটি শুনিয়া, তোমার আগে বিশেষরূপে সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য যে, হিমশৈলে সোণা পাওয়া যায় কি না,—সন্ধান লইয়া তোমার একবার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য,—স্বর্ণোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তখন যদি না পাও—তবে বলিতে পার, সোণা পাওয়ার অমন সুবিধা থাকিলে কি আর মানুষ চাকুরী করিয়া মরিত? দেবতা ও আরাধনা কি বুঝিয়া, কথিত নিয়মে তাঁহাদের আরাধনা কর,—অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হও, তখন বলিও দেবতার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হইলে, লোকের আর ভাবনা কি ছিল?

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন, কেবলমাত্র দেবতার আরাধনা করিলেই আমাদের রোগ-শোক নিবৃত্তি হয়, আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য বিদূরিত হয়, আমাদের কাম-কামনাপূর্ণ হয়,—আমাদের রিপুগণ বশীভূত হয়, আমাদের অগ্নি জল ঝড় প্রভৃতির ভয় থাকে না,—এক কথায় আমরা সর্ব্বসুখে সুখী হই?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। ধরুন, আমার পুত্রটির বড় জ্বর হইয়াছে, আমি তখন দেবতা ও আরাধনা লইয়া বসিব, কি ডাক্তার ডাকিতে যাইব?

গুরু। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ও দৈবীচিকিৎসা।

তাহাতেও সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তির শক্তি-প্রাবল্য। তাহাতেও মন্ত্রাদির প্রয়োগ আছে। সে কথা যাউক—ফল কথা, চিকিৎসকে কি রোগ আরোগ্য করিতে পারে? ঔষধ দিয়া প্রকৃতির সহায়তা করে মাত্র। যদি জড় পদার্থে রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তি নিশ্চয় থাকিত, তবে যে ঔষধ খাইয়া রাম ন্যাবারোগ হইতে মুক্ত হইল, তাহা খাইয়া শ্যামের কোন উপকার হইল না কেন? যে ঔষধ খাইয়া গদাধর মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, সে ঔষধ খাইয়া হলধর শ্মশানে গেল কেন? ফলতঃ কোন ঔষধেরই এমন ক্ষমতা নাই,—রোগ সারিবার পক্ষে যাহার নিশ্চয়াত্মিকতা আছে। ঔষধ প্রকৃতির সহায়তা করে মাত্র। প্রকৃতি যাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া যান, ঔষধ তাহার সহায়তা করে,—আর প্রকৃতি যাহাকে ধ্বংস-পথে লইয়া যান, ঔষধের সাধ্য নাই যে, তাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া আইসে। ঔষধের সে ক্ষমতা থাকিলে, ধনকুবেরগণের কেহ মরিত না—শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের কেহ মরিত না। তোমার বোধ হয়, স্মরণ আছে;—সেবার কলিকাতায় কোন এক ধনিসন্তানের ব্যাধি হইলে, তাঁহার মাতা কলিকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত ইংরাজ বাঙ্গালী এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বড় বড় কবিরাজ ও হাকিমগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন;—"আমার পুত্রকে যিনি বাঁচাইতে পারিবেন, তাঁহাকে প্রত্যহ ভিজিট ও ঔষধের মূল্যত দিবই—তদ্বাদে পুত্র আরোগ্য হইলে, পুত্রের ওজনে স্বর্ণ মুদ্রা দিব।" কিন্তু প্রকৃতি সংহারকর্ত্রী—কাহার বা কোন্ ঔষধের সাধ্য আছে যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে একটা স্থানে গমন করেন। যেখানে তিনি গমন করিয়াছিলেন; সেখানে তখন সংক্রামকরূপে কলেরা রোগ হইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ও তাঁহার সহিস উভয়েই ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া

আসিলেন। দেখা গেল, তাঁহা হইতে তাঁহার সহিসের অবস্থা যেন আরও মন্দ। কিন্তু সহিসের দিকে কে তখন দৃষ্টি করে? সে আস্তাবলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর ভদ্রলোকটির জন্য তখনই বিশেষ বন্দোবস্ত হইল,—তখনই তিন চারি জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনান হইল, যথোচিত প্রকারে সেবা-শুশ্রূষা করা হইতে লাগিল এবং ঔষধাদি সেবন করান হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—তিন দিন পরে, ভদ্রলোকটি ইহলোক হইতে বিদায় হইলেন। আর সেই সহিসটি আস্তাবলের ন্যায় জঞ্জালের রাজ্যে পড়িয়া গড়াইয়া গড়াইয়া দুই তিনদিন পরে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ ভদ্র-লোকটিকে যে সকল ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যের একজনের নিকট হইতে তাহার জন্য কয়েক মাত্রা ঔষধ চাহিয়া লইয়া সেবন করান হইয়াছিল মাত্র। ইহাতে কি বুঝিবে যে, রোগ আরোগ্য করে চিকিৎসকে, না প্রকৃতিতে? যখন কোন স্থলে মহামারী উপস্থিত হয়, তখন শত শত চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন ও যুক্তিমতে সেই স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধি করণ, জঞ্জাল-আপদ দূরীকরণ ও কঠোর আইনের প্রচলন প্রভৃতি করিয়াও কি সেই মহামারীর নিবারণ করা যাইতে পারে? পুনা-বোম্বের ব্যাপার বোধ হয়, তোমার উত্তমরূপই মনে আছে,—এত হাঙ্গাম হুজ্জত, এত কাটাকাটি মারামারী, এত মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, কিন্তু মহামারীর কি কিছু হইয়াছিল? কে কি করিবে? প্রকৃতির সংহার মূর্ত্তিইত মহামারী;—তাহার বিকৃতি করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? প্রকৃতিই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতিই জগৎ পালন করিতেছেন এবং তিনিই মহামারীরূপে জগতের ধ্বংস করিয়া থাকেন। * কাহার সাধ্য যে, তাঁহার কার্য্যের গতিরোধ

* মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

করে? তবে তিনিই তাঁহার লীলা সংহরণ করিতে পারেন। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই শরণাগত হইলে, তিনি সকলই রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থা। মানবের শক্তি, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে সক্ষম নহে। দেবতার আরাধনায় মানুষের শক্তি দেবশক্তিতে পরিণত হয়,—দেবতার আরাধনায় মানুষ দৈব-নরত্বলাভ করিয়া থাকে,—তখন প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা। তিনি ইচ্ছা করিয়া দুঃখ বিনাশ করতঃ পূর্ণসুখের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন।

ন দৃষ্টাৎ তৎ সিদ্ধিনিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।

সাংখ্যদর্শন, ১।২

মানবীয় উপায় দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ ঔষধাদির প্রয়োগে রোগাদির বিনাশ, ধনাদি লাভে চিত্তের শান্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে হয় না। যেহেতু ঔষধদ্বারা রোগ আরোগ্য সকল স্থলে হয় না, হইলেও পুনরায় রোগ হইয়া থাকে। ধনাদিদ্বারা অভাবের যন্ত্রণা বিদূরিত হয় না, অথবা সময়ে অভাব বিদূরিত হইয়া পুনরায় সমধিক দুঃখও উপস্থিত হয়,—পুত্র না হইলে দুঃখ, হইলেও তাহার শরীর ভাল থাকা চাই, তাহার প্রার্থনার পূরণ করা চাই, তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল থাকা চাই—এই সকলের অন্তরায় হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, এবং ইহা না হইলেও তাহার মরণ-ভীতি, তাহার ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা প্রভৃতি এই সকলের দ্বারা লৌকিক কোন উপায়েই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না; এবং যে দুঃখ নিবৃত্তি হইল বলিয়া আমরা সময় সময় মনে করি, সেই নিবৃত্ত দুঃখেরও অনুবৃত্তি হইয়া থাকে—অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে কথঞ্চিৎ প্রকারে উপশমিত হইলেও সেই শান্ত দুঃখের পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ চায় কি,—মানুষের কি দুঃখ আবার ফিরিয়া আসুক?

তাহা নহে। মানুষের ইচ্ছা,—দুঃখের একেবারে তিরোভাব ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের আবির্ভাব। তাহা হয় কৈ? হয় না, আমরা সুখের উপায় করিতে জানি না বলিয়াই হয় না।

পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।

পাতঞ্জল।

"বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত এক প্রকার মনের বিকারই সুখ। কিন্তু সংসারের সকলই ক্ষণভঙ্গুর,—যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যে পরিবর্ত্তনশীল জগতে মরিবার জন্যই জন্ম হইয়া থাকে, যে সংসারে বিয়োগ-যাতনা ভোগ করিবার জন্যই সংযোগ হইয়া থাকে, সে দেশের—সে সংসারের সুখও দুঃখের আকারে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এ পরিবর্ত্তনের জগতে দুঃখ নয় কিসে? সে দিন যে ফুল্ল-কুসুম-কান্তি শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মৃদু মধুর হাস্যাধর দর্শন করিয়া, শিশুর পিতাকে আনন্দে বিভোর হইতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম,—সহসা এক দিন পথে যাইতে দেখি, সেই শিশুর মৃতদেহ বক্ষের উপর ফেলিয়া, জগৎ ঘোর দুঃখের আকর জ্ঞান করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া সেই বালকের পিতা শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছে,—সুখ কোথায়? আজি যে বর সাজিয়া বিবাহের বাজনার মধ্যে জগৎ সুখময় দেখিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে,—দুই বৎসর পরে হয়ত, সেই যুবক, তাহার স্ত্রীকে অন্যা-ভিলাষিণী দেখিয়া সংসার হইতে বিদায় পাইবার জন্য বিষ ভক্ষণ করি-তেছে। আজি যে সুখের জন্য অপরিমিত আহার করিতেছে, কালি সে অন্নাজীর্ণে জীর্ণ হইয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাসে অনুতপ্ত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম,—সুখ কোথায়?

তোমাদের পাড়ার প্রভাত আগে চরিত্রবান্ যুবক ছিল,—মাঝে সে বড় খারাপ হইয়া যায়—তাহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা আবৃত হয়, তুমি বোধ হয় তাহা জান। সে বাজারের একটি বেশ্যার কুহকে পতিত হয়। সে সুখের জন্যই। সে অবশ্যই সেই বেশ্যার সন্দর্শনে সুখলাভ করিত,—তাহার সহিত কথা কহিলে, তাহার কাছে বসিলে, তাহার সন্তোষ বিধান করিতে পারিলে,—প্রভাত তখন নিশ্চয়ই সুখী হইত, সন্দেহ নাই। যদি সে সুখী না হইবে, তবে তাহা করিত কেন? প্রভাতকে ঐ পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রভাতের আত্মীয়-স্বজন বিধিমতেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তারপরে, পরিবর্ত্তনের জগতে পরিবর্ত্তন আপনিই হইয়া গেল,—প্রভাতের ঘোর কাটিল, সে দেখিল—যাহাকে সুখ বলিয়া সে আত্মসমর্পিত হইয়াছিল তাহা সুখ নহে, দুঃখ। এ সুখের পরিণতিই দুঃখ! দুঃখ জানিতে পারিয়া প্রভাত ফিরিয়া পড়িল। তার পরে, এখন সেই বেশ্যার নাম করিতেও প্রভাত ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার সুখের মোহ ছিল, তখন যেন তাহার মর্ম্মপটে সেই বেশ্যার নামটি খোদিত করিয়া লইতে পারিলে, তাহার আনন্দ হইত।

ফলকথা,—সাংসারিক-সুখ পরিণাম-দুঃখের প্রসূতি; ইহাতে স্থায়ী সুখ হইতেই পারে না।

শিষ্য। এতক্ষণে আপনার কথার ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি।

গুরু। কি বুঝিতেছ?

শিষ্য। আপনি বোধ হয় বলিবেন, ঈশ্বর-উপাসনাই সুখ,—দেবতা-গণ তাহার সূক্ষ্মাদৃষ্টশক্তি; অতএব, তাঁহাদের পূজাদি লইয়া জীবনটা অতিবাহিত করিয়া দিলে, আর কোন ভাবনাই নাই। সংসারের সুখ-দুঃখে লিপ্ত হইতে হইবে না।

গুরু। তোমার মত পাগল কি সকলেই?

শিষ্য। কেন, আমি পাগলের মত কি বলিলাম, ঠাকুর?

গুরু। এমন একটি সোজা কথা বলিবার জন্য কি, হিন্দুর অগাধ শাস্ত্র? এমন একটি সোজা সূত্র লইয়া কি হিন্দুর পূজা ও আরাধনার এত বিপুল আয়োজন? এমন একটি সহজ তত্ত্বের উপরে কি হিন্দুর তন্ত্র-মন্ত্র বেদ-বেদান্ত পুরাণাদি? তাহা নহে। তুমি যে কথাটা ধারণা করিয়াছ—উহা পাগলেরই ধারণা।

শিষ্য। আপনি বলিলেন এই পরিবর্ত্তনের জগতে যে কিছু সুখ, তাহা সমুদয়ই পরিবর্ত্তনশীল। এই দৃশ্যমান সংসারে যে কিছু সুখ তাহা পরিণাম দুঃখের প্রসূতি। আপনার কথা, এক কথায় বলিতে হইলে, বোধ হয় এইরূপ হয় যে, Premature consolation is but remembrancer of sorrow.

গুরু। হাঁ, কথাটা তাহাই বটে। কিন্তু কি প্রকারে সেই অস্থায়ী সুখকে স্থায়ী সুখে পরিণত করিতে হয়, কি প্রকারে জীবের সেই চির সহচর দুঃখকে একেবারে নাশ করিতে হয়, তাহা তুমি যে প্রকার বলিলে, সে প্রকারে নহে;—অধিকন্তু ঐরূপ বলা পাগলেরই প্রলাপ। অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মে সুখের উপায় ঐ প্রকারে বর্ণনা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠনে গঠিত। ইহা—"ঈশ্বরকে ভজনা কর, তিনি পাপ হইতে তাপ হইতে তোমাদিগকে ত্রাণ করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন।"—এমন অসার বাক্যময় ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বর পাপ তাপ হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন কেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন,—"কৃপা করিয়া ঈশ্বর তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।" কেন কৃপা করেন? তাঁহাকে দুটি মুখের কথায় স্তব খোসামোদ করিলেই তিনি কেন আমাদিগকে

দয়া করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞানের ধর্ম্ম এমন বাজে কথায় মন বজায় রাখিতে চাহে না। ঈশ্বরোপাসনা করিলে সুখ হয়,—দেবতাগণ তাঁহারই বিভূতি; অতএব সংসার ছাড়িয়া, গৃহস্থালী ছাড়িয়া, কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দেবতার পূজা আরাধনা কর—যাহা কিছু টাকা পয়সা আছে, গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তুমি গাছতলায় আশ্রয় লও—ইহাই কি হিন্দুধর্ম্ম? তাহা যদি হইত, এত অত্যাচারেও হিন্দুধর্ম্ম এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিত না। যাহা অসার, তাহার বিনাশ হইতে কয় দিন লাগিয়া থাকে?

হিন্দু ধর্ম্মে চারিটি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। যে, যেমন গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সেই আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে হইবে। যাহারা কাম-কামনাদি জড়িত বদ্ধ-জীব, তাহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গাছতলায় যাইতে পারিবে কেন? তাহারা আশ্রমে থাকিয়া পুত্র-কলত্রাদি লইয়া, বিষয়-বিভব লইয়া বাস করিবে এবং যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহাই করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সুখের সংস্কার।

শিষ্য। সংসারের সুখ, সুখই নহে—সে সুখের পরিণতি দুঃখ, ইহা আপনিই বলিলেন। আবার বলিতেছেন,—সংসারে থাকিয়া যাহাতে সুখী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। পুত্র কলত্রাদি অস্থায়ী, টাকা-কড়ি অস্থায়ী, স্বাস্থ্য চঞ্চল,—তবে কি লইয়া সুখী হইবে? সংসারের আনন্দ বা সুখ সুখই নহে। তবে সংসারে থাকিয়া কি প্রকারে সুখী হইবে?

গুরু। সাংসারিক সুখ স্থায়ী না হইলেও উহাতে যে সুখের অংশ বা কণা আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব বোধ হয় এইরূপ হইবে যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই পূর্ণ সুখ। আর সম্পূর্ণরূপে দুঃখ নিবৃত্তি না করিয়া যে সুখ হয়, তাহা পূর্ণ সুখ নহে,—সুখের কণা মাত্র। যাহা পূর্ণ নহে এবং যাহা অচিরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই প্রার্থিত নহে। কিন্তু প্রার্থিত না হইলেও জীব সেই একটুকুরই কাঙ্গাল। তবে, তৃষা ভাঙ্গে না,—প্রাণভরা পিপাসায় একবিন্দু জলে কি হইতে পারে? জীব কিন্তু সেই একটুকুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

সাংসারিক সুখেও একটু সুখ ভোগ হয়,—নতুবা জীব কিসের জন্য এত লালায়িত? কিন্তু যেই সে সুখটুকু অনুভব হয়, আর সেই মুহূর্ত্তেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া সুখটুকুকে ঢাকিয়া ফেলে। সাংসারিক দুঃখে এ অভিসম্পাত কেন? এমন হয় কেন?

তোমাদের সহিত যদু নামক যে যুবকটি কলেজে অধ্যয়ন করিত, তাহার কথা মনে আছে কি?

শিষ্য। খুব আছে।

গুরু। সে যখন কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়, তখন তাহার সংসারের আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ,—সে বলিত, মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হইলে, আমি পরম সুখী হইতে পারি। ত্রিশ টাকার স্থলে চল্লিশ টাকার চাকুরী হইল, একমাস পরেই তাহার নিকট শুনিলাম, আমার দিন চলে না,—একশত টাকা না হইলে সংসার চালাইতে পারি না। এক শত টাকার চাকুরী হইল,—যদু হাসিমুখে বলিল, হাঁ এখন একটু সুখী হইতে পারিব,—একমাস পরে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বলিল। মহাশয়! কতকগুলি টাকা কর্জ্জ হইয়া

পড়িয়াছে, কৈ একশত টাকাতেও ত চলে না। তার পরে এখন যদু-নাথের বেতন মাসিক তিনশত টাকা—কিন্তু সে তথাপিও সুখী নহে। আরও চাহে—টাকার পূর্ণতা কোথায়? যতদিন পূর্ণতার দিকে না যাইতে পারিতেছে, ততদিন তাহার অসুখ যাইবে না।

একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা প্রেমের কাঙ্গাল—রূপ দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভালবাসিতে পাইলেও অসুখী; না বাসিতে পাইলেও অসুখী,—দুদিন না হয়, বাঞ্ছিতের বাহুপাশে সুখলাভ করিল,—তারপরে ছাড়িয়া পলাইতে পারিলে সুখ। পলাইয়াও ভালবাসার প্রবৃত্তি যায় না,—আবার চাই যাহা খুঁজিয়াছিলাম তাহা কৈ?

আমার পুত্রটির কৃষ্ণনগরের সর ভাজার উপরে ভারি লোভ, সে বড় আব্দার ধরিয়াছে—কৃষ্ণনগর হইতে সরভাজা আসিয়াছে বলিলেই চুপ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়। প্রায়ই তাহার জন্য উহা আনিয়া গৃহে রাখা হইত, কিন্তু উদরের পীড়া হইবে বলিয়া সামান্য পরিমাণে মধ্যে মধ্যে দেওয়া হইত। আমার একটি বন্ধু, বালকের ঐরূপ অত্যাসক্তি শুনিয়া এক দিন অনেকখানি সরভাজা আনিয়া একবারে তাহাকে খাইতে দিলেন,—সে যতখানি খাইতে পারিয়াছিল, ততখানিই খাইতে দিলেন,—কিন্তু সেইদিন হইতেই সে আর সরভাজাতে তত তুষ্ট ছিল না। সে বুঝি, সরভাজার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া ভাবিল,—এই—ই!

কোন দ্রব্য অধিক ব্যবহার করিলে, তাহাতে যে অনাসক্তি জন্মে, তাহার কারণই জীব দেখিতে পায়, তাহার চরমেও কোন সুখ নাই—যে আশা করিয়াছিল, তাহা মিলিতেছে না। এমন হয় কেন, তাহা জান?

শিষ্য। ঐরূপ হয়, তাহা জানি;—কিন্তু কেন হয়, তাহার কারণ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যে কোন প্রকারের হউক, সাংসারিক সুখ ভোগ করিবার

সময় তাহার একটা সংস্কার জীবের চিত্তে আবদ্ধ হইয়া যায়। সেই সংস্কার আমাদিগের পূর্ব্বানুভূত সুখের সমান সুখভোগ করিবার নিমিত্ত নিয়ত উত্তেজিত ও চঞ্চলিত করিয়া থাকে। যতক্ষণ পূর্ব্বানুভূত সুখের সমান সুখ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ততক্ষণ বা ততকাল দুঃখই যায় না—কিছুতেই শান্তি আইসে না।

বালক, পশু প্রভৃতির স্বভাবের উপরে লক্ষ্য করিলে অনেক স্বাভাবিক বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে। রামের শিশু পুত্রটি গত আশ্বিন মাসে তাহাদের পাড়ার রায়বাড়ী দশভুজা মুর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল,—তারপরে মাঘমাসে ওপাড়ায় বারোয়ারি সরস্বতী পূজা হইতেছিল, সে গিয়া সেই প্রতিমা দর্শন করিল,—কিন্তু পূর্ব্বে যে দশভুজা মুর্ত্তি দেখিয়াছিল, সে সংস্কার তাহার চিত্তে ছিল,—সেই কোটাভরা মুর্ত্তির কাছে এ মুর্ত্তি ক্ষুদ্র, তাহার আশা মিটিল না, মনে সুখও হইল না। যখন বাড়ী হইতে ঠাকুর দেখিতে বাহির হইয়াছিল,—তখন বড় ঔৎসুক্যের সহিতই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া দেখার সাধ মিটিল না,—পূর্ব্ব দর্শনের অনুভূতি যাহা সংস্কাররূপে তাহার চিত্তক্ষেত্রে মুদ্রিত ছিল, তেমনটিত দেখা হইল না। কাজেই সে বড় ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এ ঠাকুর ভাল না।"

কোন একটি বাঁধা গরুকে একদিন একমুঠা কোমল অথচ মিষ্ট কাঁচা ঘাস দেওয়া হইয়াছিল, তৎপর দিবস সে শুষ্ক বিচালীর পরিবর্ত্তে বোধ হইল, সেই ঘাস একমুঠার জন্যে আকুল হইয়াছে। তখন তাহাকে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মনের ইচ্ছা,—বাড়ীর চারি দিকে কাঁচা ঘাস আছে, খাইয়া উহার লালসার পরিতৃপ্তি করিয়া আসুক। যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে বোধ হয়, সম্মুখে কাঁচা ঘাস দেখিয়া বড় আনন্দে ছুটিয়া গিয়া তাহার উপরে

পড়িল—কিন্তু সমস্ত স্থান শুঁকিয়া শুঁকিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল ;—অবশেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহার স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যে ঘাসগুলি দেখিয়া সে দৌড়িয়াছিল, সে গুলি পূর্ব্বভুক্ত ঘাসের মত বোধহয় গন্ধাস্বাদ বিশিষ্ট নহে। তাই তাহার সংস্কার তাহাকে সেগুলি ভক্ষণে সুখ পাইতে দিল না, সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

এইরূপ সর্ব্বত্রই। জীবমাত্রই পূর্ব্বসংস্কার হইয়া সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে,—কিন্তু সংস্কার সুখ বা বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা পূর্ণ পদার্থ—জীবেশ্বর। আনন্দ যে কি, তাহা আমরা জানি না। আমাদের পূর্ব্বানুভূতিতে তাহা সংস্কাররূপে বিরাজিত আছে ;—আমরা সেই সুখের আশাতেই প্রধাবিত ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। বৈষয়িক আনন্দ পরমানন্দ হইতে বাস্তবিক স্বরূপতঃ বিশেষ বিভিন্ন পদার্থ নহে। পরমানন্দ পূর্ণ—আর বিষয়ানন্দ তাহার অংশ বা কণা। অল্পত্ব মহত্ব ব্যতীত তাহার আর কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তুমি বোধ হয়, অবগত আছ—জীবও সেই পূর্ণানন্দ গুণেশ্বর। পরমানন্দ যাহা, তাহা জীব জানে,—কাজেই তাহার কণা লইয়া সে মুগ্ধ হইবে কেন ? তাই এই সকল ক্ষুদ্র সুখ তাহার উপস্থিত হইলেই তাহারাও শেষ তাহার কাঙ্ক্ষিত হয়। আকাঙ্ক্ষা থাকিতে সুখ হয় না।

মানুষের মধ্যে যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও এই সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে ; যিনি অবিকল সমগ্রাবয়বসম্পন্ন উপভোগোপকরণযুক্ত—মনুষ্যলোকে তিনিই সুখী।

এইরূপ সুখে সুখী হইতে হইলে—এইরূপ সুখের জন্য ইচ্ছা করিলে, ইহার সাধনা চাই,—ইহার সাধ্যের নাম দেবতা ও আরাধনা।

নবম পরিচ্ছেদ।

দেবতার আরাধনায় সুখ লাভ।

শিষ্য। যেরূপ সর্ব্বগুণবিশিষ্ট লোক সুখী বলিয়া আপনি অভিহিত করিলেন, সেরূপ লোক কি সংসারে কেহ আছেন?

গুরু। শত শত আছেন।

শিষ্য। সেরূপ লোক দেখিতে পাই না।

গুরু। লোকের আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্য প্রায় একরূপই, কিন্তু অপরের মনের অবস্থা তুমি আমি বুঝিব কি প্রকারে?

শিষ্য। বুঝিতে পারিলে, তাঁহাকে আদর্শ করিয়া অনেক জীবন গঠিত হইতে পারে।

গুরু। মানুষের কার্য্য দেখিয়াই হৃদয়ের বিচার করিতে হয়, কিন্তু আমরা কয় জন মানবের কার্য্যের প্রকৃত তথ্য লইয়া থাকি? আর কার্য্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিই বা আমাদের কোথায়? কিন্তু আমাদের উপকারের জন্য—মানুষের আদর্শের জন্য এক আদর্শ পুরুষের অবতার হইয়াছিল,—পুরাণে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সময়ে তোমাকে সে কথা আমি বলিব।

শিষ্য। যখন যে কথা বলিলে, আমি ভালরূপে বুঝিতে পারিব, আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া তখনই তাহা বলিবেন। এক্ষণে একটি কথা জানিতে চাহি।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, দেবতার আরাধনা করিলে সুখ লাভ হয়। সুখ প্রাপ্তির প্রথম সোপান দেবতা ও আরাধনা। তাহা কি প্রকার,—আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। দেবতা অর্থে যে সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তি তাহা তোমাকে বলিয়াছি ;—সেই শক্তি লইয়া ত্রিজগৎ গঠিত। জীবও জগৎ ছাড়া নহে,—সুতরাং জীবেও দেবতার অধিষ্ঠান আছে। কেবল দেবতা নহে—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকে যাহা কিছু পদার্থ বা বস্তু আছে, সে সমুদয়ই জীবদেহে আছে।

> ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
> মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥
>
> শিবসংহিতা।

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিনলোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, তৎ সমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে।

> দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
> সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
> ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
> পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
> সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
> নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥
>
> শিবসংহিতা।

জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিতি করে এবং সমুদয় নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া থাকে। মুনি-ঋষি সকল, গ্রহ-নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতাগণ

এই দেহে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সৃষ্টি-সংহারক চন্দ্র সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে।

শিষ্য। দেহের মধ্যে যে এই সমুদয় আছে,—কোন প্রকার তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? সেই জন্য অনেকে একথা বিশ্বাস করেন না,—আর কথাটিও আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত অসম্ভব বলিয়াই জ্ঞান হয়।

গুরু। অসম্ভব নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥

শিব সংহিতা।

"যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ আপনার শরীরের কোথায় কি আছে, জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী।"

শাস্ত্রের এই বচনে জানা যাইতেছে, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই দেহের মধ্যে আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের জ্ঞেয় বা দর্শনীয় নহে। যাঁহারা যোগী, তাঁহারাই মাত্র উহা জ্ঞাত হইতে পারেন। যোগের চক্ষু ব্যতীত সে সূক্ষ্মের পরিদর্শন হয় না।

দেবতা, নাগ, নর, পাহাড়, পর্ব্বত, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নদ, নদী, বন, উপবন, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি ত্রৈলোক্যে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই দেহে আছে। কিন্তু এতটুকু চৌদ্দপোয়া দেহে সমস্ত বিশ্বের পদার্থ থাকিল কি প্রকারে!—শাস্ত্রকারগণ অবশ্য দোক্তাহীন গঞ্জিকায় দম দিয়া ইহা লেখেন নাই। ঐ সকল পদার্থের যে সূক্ষ্মশক্তি—সেই সূক্ষ্মশক্তি আমাদের শরীরে আছে। যে সূক্ষ্ম শক্তিতে দেবতা, সে শক্তি আমাদের দেহে আছে,—যে সূক্ষ্মশক্তি-বলে বলীয়ান্

হইয়া ঐ প্রকাণ্ড ভূধর গগনশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও আমাদের দেহে আছে। যে সূক্ষ্মশক্তি হৃদয়ে ধরিয়া ভীম-ভৈরব কল্লোল তুলিয়া মহাসমুদ্র অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাও আমাদের শরীরে আছে। ফলকথা, বাহ্যদৃশ্যে বা অন্তর্দৃশ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, বা অনুভব করিতে পারিতেছ, সে সমুদয়ই বীজরূপে অব্যক্তভাবে আমাদের দেহে আছে। অশ্বত্থবীজে যেমন অশ্বত্থ গাছ অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে, আমাদের দেহের মধ্যেও তদ্রূপ সমস্ত পদার্থ বীজভাবে অবস্থান করিতেছে। মনে কর, একমুষ্টি কপির বীজ, এতটুকু কাগজে মোড়ক করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু উহা বপন করিলে, দুই বিঘা জমিতেও তাহাদের স্থান হয় না। দেহেও সেইরূপ বীজভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে,—তাহাদের স্ফূর্ত্তি হইলে, সমস্ত বিশ্বেও স্থান সংকুলান হয় না।

এখন যে যে কথা বলিতেছিলাম—দেবতাগণ সূক্ষ্মাদৃষ্ট শক্তি। মনে কর, বরুণ জলাধিপতি, জলাধিপতি—বলিতে কি বুঝায়, তাহা জান কি?

শিষ্য। বোধ হয়, জলের সূক্ষ্ম বীজ।

গুরু। হাঁ। জগতে যেথানেই জল দেখিতে পাইবে, তাহারই বীজ বরুণদেবতা। আমাদের দেহ-মধ্যেও জলতত্ত্ব বা বরুণবীজ আছে।

এখন, তুমি দুইটি গোলাপগাছ রোপণ করিয়াছ, জলাভাবে চারা কয়টি মারা যাইতেছে,—তাহাতে তোমার মনে একটা দুঃখের উদয় হয় না কি?—যদি তুমি ঐ বরুণবীজ বা জলতত্ত্বের বিকর্ষণে প্রকৃতির বরুণবীজকে আকর্ষণ করিতে পার, তবে বরুণবীজ ব্যক্তরূপে অর্থাৎ স্থূলাকারে পরিণত হইবে, এবং তথনই জল হইয়া তোমার গোলাপের চারার উপকার করতঃ তোমার মনে আনন্দ প্রদান করিবে।

এইরূপ সর্ব্বত্র। তোমার মনে সুগন্ধ লাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, গন্ধতত্ত্বের বিকর্ষণে জগতের সর্ব্বগন্ধের সার গন্ধ আকর্ষিত হইয়া উপস্থিত হইবে। ধনৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন, ঐশ্বর্য্য তত্ত্বের বিকর্ষণে ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব আকর্ষিত হইয়া তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবে।

গোড়ায় তোমাকে বলিয়াছি, দেবতার আরাধনায় সুখলাভ হয়। সুখ কি, তাহাও বুঝাইয়াছি।

ইন্দ্রিয়ের সামঞ্জস্য, পরিণতি ও তৃপ্তিই সুখ। কিন্তু সেই তৃপ্তির অভাব হইতেছে, অপূর্ণতার জন্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন, অর্থাৎ বীজতত্ত্ব আছে,—সেই বীজতত্ত্বের আরাধনায় তাহার সম্পূর্ণতা হয়। সম্পূর্ণ হইলেই সুখী হওয়া যায়। মনে কর, দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা তেজ বা অগ্নি। অগ্নিতত্ত্বের সাধনা করিলে, তেজঃপদার্থের সীমা পর্য্যন্ত তোমার আয়ত্ত হইল। দর্শনেরও শেষ পর্য্যন্ত তোমার অধীন হইল,—তখন তুমি মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সমস্তই দেখিতে পাইলে,—দেখিতে পাইলেই ত্রিলোক-দর্শনে অধিকারী হইতে পারিবে, তখন দুঃখ দূর হইবে।

ঐ যে যুবক, একখানি রমণী-মুখের দিকে চাহিয়া—চাহিয়া চাহিয়া কেবলই চাহিয়া জীবন কাটাইতেছে। কেন কাটাইতেছে, জান? আর উহার অপ্রাপ্তিতে আজন্ম আকাঙ্ক্ষার আগুন বুকে লইয়া দগ্ধ হইতেছে। উহাকে পায় নাই বলিয়া। কিন্তু যুবকের যদি দর্শনশক্তির স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য হইত, তবে যুবক দেখিতে পাইত, ঐ যুবতীর দেহ, —সে যাহা অপূর্ব্ব ভাব-সমষ্টিতে গঠিত দেখিতেছে, তাহা বস্তুতঃ বিরাট চৈতন্যের বিকাশ। কাজেই সে বিকর্ষিত দর্শনেন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করিয়া সুখী হইতে পারিত। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার ভগবানে তখন তাহার চিত্ত সংসাধিত হইত।

ফল কথা, দেবতা-আরাধনায় দৈবশক্তি স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। সুখের পূর্ণতা দেখাইয়া দেয়,—কাজেই দেবতা-আরাধনায় আমরা সুখী হই।

মনে কর, তোমার একটি পুত্র সন্তান হইল,—যেই হইল, সেই তুমি দৈবকার্য্য আরম্ভ করিলে। তাহাতে কি হইল?—সেই বালকের সেই সেই সকল দৈব-সূক্ষ্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া পুরুষকারের পথে তাহাকে সমুন্নত করিয়া দিল। ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তিইত সুখ,—গোড়া হইতে চেষ্টা করিলে, তোমার পুত্র অবশ্যই সুখী হইবে।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সংকল্প তত্ত্ব।

শিষ্য। একজনের দেহস্থ সূক্ষ্মশক্তির উন্নতি অন্যে কি করিয়া করিতে পারে?

গুরু। আমাদের দেশে পূজা, আরাধনা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি প্রায়ই পুরোহিতের দ্বারা করান হইয়া থাকে। পুরোহিত কার্য্য করিয়া যজমানের অভীষ্ট পূরণ করেন,—তাহা তুমি বোধ হয় জান?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ,—তাহা জানি। কিন্তু কোন্‌ শক্তির বলে এক-জনে কাজ করিলে, অন্যে তাহার ফলভাগী হয়, তাহা বুঝিতে পারি না।

গুরু। প্রত্যেক কাজের আরম্ভ সময়ে সংকল্প করিতে হয়, সেই সংকল্পের দ্বারাই একের কাজে অন্যে ফললাভ করে।

শিষ্য। সংকল্প কাহাকে বলে?

গুরু। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সেই কার্য্যের ফল কামনা করিয়া কতকগুলি বাক্য পাঠ করিতে হয়।

শিষ্য। বাক্যগুলি কি প্রকার ?

গুরু। পৃথক্ কার্য্যের পৃথক্‌রূপ ফল,—সুতরাং তাহার বাক্যও পৃথক্ পৃথক্ রূপ আছে। তবে অনেকটা একইরূপ। শাস্ত্রে আছে,—

সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
ফলঞ্চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ॥

"সংকল্প না করিয়া মানুষ যে কোন কার্য্য করে, তাহার পূর্ণ ফলভোগী হইতে পারে না ; এবং ধর্ম্মের অর্দ্ধেক ক্ষয় হয়।" সঙ্কল্পের দুইটি বাক্য শুন,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (এই স্থানে পুরোহিতের নাম-গোত্র হইবে।) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (যজমানের নাম ও গোত্র হইবে) গোচরবিলগ্নাদি-যথাস্থানাবস্থিত-রব্যাদিনবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণ-সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনপূর্ব্বকং জীবদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেনোৎপন্ন অমুকাদিরোগাণাং (রোগের নাম করিতে হয়) ঝটিতি প্রশমনকামঃ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত মার্কণ্ডেয় উবাচ। ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ ইত্যাদি এবং দেব্যা বরং লব্ধা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোম ইতি

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেবী-মাহাত্ম্যং সমাপ্তমিত্যন্তস্য দেবীমাহাত্ম্যস্য একাবৃত্তি-পাঠ-কর্ম্মাহং করিষ্যামি।

অন্য প্রকারের আর একটি,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পরমবিভূতিলাভ-কামো গণপত্যাদিদেবতা-পূজাপূর্ব্বক-লক্ষ্মীমহং পূজয়িষ্যে।

অন্যের ফলার্থে পূজাদি করিতে হইলে, তাহার নামাদি করিতে হয় এবং গোত্রঃ স্থলে গোত্রস্য বলিতে হয়। শর্ম্মা স্থলে শর্ম্মণঃ বলিতে হয় ও পূজয়িষ্যে স্থলে পূজয়িষ্যামি বলিতে হয়। সে সকল বিশেষরূপে বলা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। *

শিষ্য। এই কথা কয়টিতে এমন কি শক্তির উদ্ভব হইল যে, যাহাতে একের কৃতকর্ম্মের ফল, অপরে গিয়া সংন্যস্ত হইতে পারে।

গুরু। সংকল্প দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। তোমাকে যে সংকল্পের বাক্যের কথা বলিলাম,—বাক্য ইচ্ছায় পরিণত হইলে উহার কার্য্য হইবে। কি প্রকারে হইবে, তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর।

> সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
> ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥ মনুসংহিতা, ২।৩।

"সঙ্কল্প—সর্ব্ব ক্রিয়ার মূল। কাম সঙ্কল্প-মূল, যজ্ঞ সঙ্কল্প-সম্ভব,—ব্রত-নিয়মরূপ ধর্ম্মসমূহ সংকল্পজ।"

* মৎপ্রণীত "পুরোহিতদর্পণ" নামক গ্রন্থে এই সমুদয় বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মনসা সাধু পশ্যতি মানসাঃ প্রজা অসৃজত।

তৈত্তিরীয়।

"শুদ্ধচিত্ত—শিব-সঙ্কল্পযোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়া অতীত অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার বস্তু সম্যগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করেন; অধিক কি বিশ্বামিত্রাদি ঋষি স্ব-সঙ্কল্প মাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"সঙ্কল্প—মন প্রভৃতির আশ্রয়। জগত্রয়ের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার সঙ্কল্পের দ্বারাই হইয়া থাকে। কারণ ঐ সকল কার্য্য সঙ্কল্পমূলক। শৈত্য ও তেজের অথবা অগ্নি ও সোমের সংকল্পে জল বাষ্পাকার ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন এবং পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করে, বৃষ্টির সংকল্পে অন্নের উৎপত্তি হয়, অন্নের সংকল্পে প্রাণের সংকল্প হয়, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্রের সংকল্প হয়, মন্ত্রের সংকল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সংকল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সংকল্পে লোকের সংকল্প এবং লোকের সংকল্পে জগতের সংকল্প হইয়া থাকে। এই সংকল্পতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, কামাচার হওয়া যায়। যে সংকল্প-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছে, তাহার কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না,—জগতে তাহার অনিষ্ট কিছুই নাই।

শিষ্য। সেই সংকল্প বস্তু কি? যে সংকল্পপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে সংকল্পপ্রভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, যে সংকল্পপ্রভাবে একের কার্য্য অপরে সংক্রমণ হয়,—তাহা কি পদার্থ, আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। পূর্ব্বে সংকল্পসম্বন্ধে মনুসংহিতার যে বচনটি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহারই ভাষ্যে মেধাতিথি সংকল্পের অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি।

অথ কোঽয়ং সঙ্কল্পো নাম যঃ সর্ব্বক্রিয়ামূলম্। উচ্যতে। যচ্চৈতঃ সন্দর্শনং নাম

যদনন্তরং প্রার্থনাধ্যবসায়ৌ ক্রমেণ ভবতঃ। এতে হি মানসা ব্যাপারাঃ সর্ব্বক্রিয়া প্রবৃত্তিষু মূলতাং প্রতিপদ্যন্তে। নহি ভৌতিকব্যাপারানন্তরেণ সম্ভবন্তি।

মেধাতিথি-ভাষ্য।

"যাহা সর্ব্ব কর্ম্মের মূল, সেই সঙ্কল্প কোন পদার্থ? মেধাতিথি এতদুত্তরে বলিয়াছেন,—সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় এই ত্রিবিধ মানস-ব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বাহ্যক্রিয়াপ্রবৃত্তির মূল বা আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। ভৌতিকক্রিয়া ও সন্দর্শনাদি মানস-ব্যাপার ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, ভৌতিকক্রিয়ারও সন্দর্শনাদি মানস-ব্যাপার আদ্যাবস্থা। সন্দর্শন বা পদার্থ-স্বরূপ-নিরূপণ দ্বারা, এই পদার্থ অর্থ ক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এবম্প্রকার কার্য্য নিষ্পাদনের সামর্থ্য আছে, ইহা ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সন্দর্শন দ্বারা এইরূপ জ্ঞান হইলে, তদনন্তর প্রার্থনা, তৎপরে অধ্যবসায় হয়। এই পদার্থ দ্বারা এইরূপ কার্য্য সিদ্ধি হইবে, এতাদৃশী ইচ্ছাকেই সঙ্কল্প বলে।"

তবেই কথা হইল এই যে, প্রথমে পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় অর্থাৎ এই পদার্থের এইরূপ শক্তি ও সামর্থ্য আছে,—এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা এই পদার্থে আছে,—এইরূপ দেখাকে সন্দর্শন বলে। তৎপরে, প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু কি তাহা স্থির করার নাম সংদৃষ্ট,—তদনন্তর, প্রার্থিত বা ঈপ্সিত পদার্থ কোন্ উপায়ে সমাধিত হইবে, তাহা স্থির করা—তৎপরে কর্ম্মের আরম্ভ হইয়া থাকে। ঐকান্তিকী বুদ্ধির সহিত, এইরূপ ঐকান্তিকী ইচ্ছাকে সঙ্কল্প বলা যাইতে পারে।

মনে কর তোমার এক বন্ধুর জ্বর হইয়া কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না। তুমি তাঁহার রোগারোগ্যের জন্য দৈবকার্য্য করিবে। এস্থলে প্রথমে তোমাকে সন্দর্শন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, কোন্

পদার্থের রোগ-আরোগ্যকারিণী শক্তি আছে,—এবং সেই পদার্থের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কে। তেজঃ পদার্থই স্বাস্থ্য—তেজোধিপতি অগ্নি এবং সূর্য্য। অতএব, সূর্য্যারাধনার প্রয়োজন, তবেই সূর্য্যতত্ত্ব স্থির করিয়া লইয়া, এখন তোমার প্রার্থিত বিষয় অর্থাৎ তোমার বন্ধুর রোগ-আরোগ্য-বুদ্ধিপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়,—ইহাই হইল, সেই কার্য্যের সঙ্কল্প।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে, একের কার্য্যফল অন্যে সংক্রামিত হয়। নিজের কার্য্যে হইলে নিজের কার্য্যসিদ্ধ হয়। তাই হিন্দুর সমস্ত কার্য্যে সঙ্কল্প করিবার বিধি আছে। আজিও শত শত ব্যক্তি এই সঙ্কল্পের অমোঘবীর্য্যের কার্য্যে ফললাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। কত শত চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগী সঙ্কল্পের গুণে পুরোহিত কর্তৃক দৈবকার্য্যে রোগমুক্ত হইয়া নবীনশ্রীতে ভূষিত হইতেছেন। সঙ্কল্পের প্রভাবে মূঢ় ব্যক্তি মহত্তে পরিণত হইতেছে।

শিষ্য। আপনি বোধ হয়, নিশ্চয়াত্মিকা ইচ্ছাশক্তির কথা বলিতেছেন।

গুরু। কেবল মাত্র ইচ্ছাশক্তি, সঙ্কল্প নহে। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি—সন্দর্শন, সংদৃষ্ট ও কার্য্যারম্ভের ইচ্ছা এই তিনের সংমিশ্রণ-শক্তিকে সঙ্কল্প বলে। কেবল ইচ্ছাশক্তি সঙ্কল্প নহে।

শিষ্য। আপনি সঙ্কল্পকে যে শক্তি বলিলেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে খুব অধিক শক্তি বলেন না। আপনি সঙ্কল্পশক্তিকে মানব-হৃদয়ের অমৃত-জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু উহাকে মড্‌সিলি (Maudsley) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মানবহৃদয়ের একটি ক্ষুদ্রশক্তি বলিয়াই বিবেচনা করেন।

গুরু। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান,—উহা বাহিরের পদার্থতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ,—অন্তররাজ্যে প্রবেশের পথে জড়বিজ্ঞানজ্ঞ মড্‌সিলি প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে, এই শক্তির একটু স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই বিস্তর। যোগী না হইলে, অন্তর্‌রাজ্যের সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্যদেশে এক্ষণে হিন্দু যোগ-সাধনা-রহস্য প্রবেশ করিয়াছে; বহুল ইংরেজ নর-নারী এই যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন, সেই যোগসম্প্রদায় থিয়োসফিষ্ট নামে খ্যাত। যোগ-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যোগ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইতেই একজন সুশিক্ষিত ইংরেজ এই সঙ্কল্পের অমৃতজ্যোতিঃভাব, সঙ্কল্পের বিশ্বসৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ক্ষমতা, সঙ্কল্পের রোগ-আরোগ্যকারিণী শক্তিতত্ত্ব, সঙ্কল্পের বাঞ্ছিত ফলদানে কল্পতরুর ন্যায় সামর্থ্য অবগত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন— "বাহ্যজগতে বা মনুষ্য-দেহ-যন্ত্রে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরাউপলব্ধি করিতে পারি আর না-ই পারি, তৎসমস্তই সঙ্কল্পমূলক। ভৌতিক জগতে ইচ্ছাশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিয়া থাকে, অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করে, মানবীয় সঙ্কল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়া এই সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিধান করে। মানব স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির প্রব্যক্ত অবস্থা (Manifestation of will). *

তবেই দেখ, যাঁহারা অন্তর্‌রাজ্যের দিকে একটু অগ্রসর হইয়াছেন,

* All voluntary and involuntary actions in nature and in the organism of man originate in the action of will, whether or not we are conscious of it.

Upon the physical plane the will acts, so to say, unconsciously carrying out blindly the laws of nature, causing attractions, repulsions, guiding the mechanical, chemical and physiological functions of the body, without man's intelligence taking any part of the process. Man is himself a manifestation of a will.—

Occult Science in Medicine—by F. Harman, M. D. P. 66—67

তাঁহারাই এই সংকল্পশক্তির অনন্তবীর্য্য, অসীম পরাক্রম অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সংকল্প-শক্তিতেই কর্ম্ম ফলবান্ হইয়া থাকে।

প্রত্যেককে স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন কার্য্যাদি করিতে হইলে, সেই কার্য্যের জন্য যে দেবতাকে আরাধনা করা হইতেছে, তাঁহার তত্ত্ব, যাহার জন্য কার্য্য করা হইতেছে, তাহার কিসের জন্য কর্ম্ম করা হইতেছে, অর্থাৎ তাহার ঈপ্সিত পদার্থ কি, আর নিজের বুদ্ধির সহিত ঐকান্তিক ইচ্ছাকে সংযোজনা করিয়া কার্য্যারম্ভ বা সঙ্কল্প করিতে হইবে। সঙ্কল্প করিবার সময় এই তিন বিষয় বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া ঐকান্তিকী ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিবে।

কোন্ কার্য্যে কোন্ তত্ত্বের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করা একটু কঠিন, সময়ে তোমাকে তাহা বলিয়া দিব, কিন্তু হিন্দুগণের তাহা জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। যে কার্য্যের জন্য যে দেবতার আরাধনা করিতে হইবে, তাহা পদ্ধতি-গ্রন্থাদিতে স্থির করাই আছে। সেই সকল গ্রন্থ দেখিয়া কার্য্য করিলেই চলিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইচ্ছাশক্তি।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মন্ত্রের প্রভাব প্রভাবিত হইয়া থাকে। সেই ইচ্ছাশক্তি কি পদার্থ, তাহার স্বরূপ কি,—আমি শুনিতে চাই।

গুরু। ইচ্ছা মানবাত্মার গূঢ়তমা ও প্রবলা শক্তি। মানুষ এই

ইচ্ছাশক্তির বলে, সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য করিতে পারে। মানুষ ইচ্ছা করিলে, নরদেহে দেবত্বলাভ করিতে পারে, আবার পশুত্বও প্রাপ্ত হইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ শিলাকে সোণা করিতে পারে এবং সোণাকে রাং করিয়া দিতে পারে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পুরুষ স্ত্রীজাতি হইতে পারে, স্ত্রীজাতি পুরুষ হইতে পারে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে জ্যৈষ্ঠের দাবদগ্ধ আকাশে নবীন মেঘের সৃষ্টি করিতে পারে,—আবার বর্ষার জলদজাল কাটাইয়া সুখতপনের আবির্ভাব করাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে কলিকাতায় বসিয়া ঢাকায় কাজ করা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে অকালে অপ্রাপ্ত ফলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িকা ম্যাডাম ব্লাভ্যাটামি (Madam Blavatamy) ইচ্ছাশক্তির সাধন করিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি অতিশয় অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ড সকল সম্পাদন করতঃ নরজগতের মানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড অনেক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। অনেকে তাঁহার অলৌকিক কার্য্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। সেনেটসাহেবকে তুমি জান কি?

শিষ্য। কোন্ সেনেটসাহেবের কথা আপনি বলিতেছেন? যিনি পায়োনিয়ারের সম্পাদক ছিলেন?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তাঁহাকে অনেকেই জানে, আমি নাম শুনিয়াছি, তিনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি।

গুরু। সেনেটসাহেব লিখিয়াছেন,—"আমি যখন সিমলায় ছিলাম, সেই সময় ম্যাডামও সিমলায় ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত শক্তিবত্তার অনেক

প্রমাণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। এক দিন এক বনভোজ (Pic-nic) হয় ; তাহাতে ম্যাডাম, আমি ও আরও চারিজনে যাইবার প্রস্তাব হইল এবং ছয়জনের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য ও ছয়প্রস্ত কাচের বাসনাদি লইয়া আমরা যাত্রা করিলাম। পথে যাইতে একটি বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল ; আমাদের বনভোজে যাইতে দেখিয়া স্বইচ্ছায় তিনিও যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি যেরূপ লোক, তাহাতে তাঁহাকে সঙ্গী করিতে সকলেই ইচ্ছুক। তিনি যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তাঁহাকে বাধা দিবার অভিপ্রায় কাহারই হইল না ; সমাদরের সহিতই তাঁহাকে সঙ্গে লওয়া হইল।

আমরা যেখানে গেলাম, সে পর্ব্বতের এক নিভৃত ও সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ। সেখানে জন-মানবের প্রসঙ্গও নাই। কেবল পাহাড়ের গায়ে ঝরণা,—ঝরণার কোলে নীলিম বনভূমি,—বনভূমির কোলে শ্বেত পীত লোহিত কুসুমগুচ্ছ,—কুসুমের কোলে কেবল সুগন্ধ আর শোভা।

অনেকক্ষণ ভ্রমণাদি করিয়া আহারের উদ্যোগ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু এইবারই মহাগোলযোগ। আহারীয় যাহা আছে, তাহাতেই ছয়জনের স্থলে সাতজনের চলিতে পারিবে, কিন্তু আর একপ্রস্থ বাসন পাওয়া যায় কোথায়? বাসা হইতে ছয়জন বাহির হওয়া গিয়াছে, ছয়জনের উপযুক্ত বাসনই আনা হইয়াছিল। কিন্তু পথে আসিয়া সাতজন হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে উপায়! একজনকে রাখিয়া কিছু অপর ছয়জনে আহার করা যায় না। কেহই কাহাকে রাখিয়া আহার করিবে না,—তাহা করাও ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

তখন সকলেই চিন্তিত হইলাম। একজন ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহার কি কোন উপায় আছে?" ম্যাডাম বলিলেন, "উপায় থাকিলেও তাহা অতিশয় কঠিন ব্যাপার।"

সকলের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"এই স্থানটা খোঁড়।"

আমাদের সঙ্গে অবশ্য খননোপযোগী কোন অস্ত্রাদি ছিল না, কেবল ছুরি ছিল ;—সেই ছুরি দিয়াই দুই জনে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে ঘাসের শিকড় আর পাহাড়ের জমাট ; ছুরি কি তাহার মধ্যে চলে! অনেক কষ্টে অনেকক্ষণের পরিশ্রমে খোঁড়া হইলে, দেখা গেল, তাহার মধ্যে একজনের আহারের প্রয়োজনমত সমস্ত বাসনই আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ফ্যাসানের এবং যে মেকারের সেই সকল বাসনাদি ছিল, ঠিক সেই মেকারের সেই ফ্যাসানেরই এ বাসনগুলি! আরও আশ্চর্য্য এই যে, ঐ ছয়প্রস্থ বাসনের প্রতি প্রস্থে গ্ল্যাস ডিস্ প্রভৃতি যে কয়খানি করিয়া ছিল, ইহাতেও তাহাই আছে! যে জমি খুঁড়িয়া এই বাসনপ্রস্থ উত্থিত হইল, তাহা যে কত কাল অখনিত অবস্থায় আছে, অথবা সেই স্থানের জন্ম হইয়া পর্য্যন্ত কখনও খনিত হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পাবে না। ফল কথা, বহু কাল যে সে স্থান খনিত হয় নাই, তাহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। কেন না, সেই মাটীর উপরে তৃণগুল্ম জন্মিয়াছিল, এবং তাহাদের শিকড়ে সেখানকার মাটী এমনভাবে সমাচ্ছন্ন ছিল যে, যাঁহারা সে মাটী খুঁড়িয়াছিলেন, তাঁহারাই তাহার কঠোরতা বুঝিয়াছিলেন।

ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হৃদয়ে ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ম্যাডাম বলিলেন "ইচ্ছাশক্তির বলে হইয়াছে।" ইচ্ছাশক্তির সাধনবলে জগতে সমস্তই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, জগতে তাহার অপ্রাপ্য ও দুষ্ক্রিয় কিছুই নাই। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগীর রোগ আরোগ

করা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে, মানুষকে বশীভূত করা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে জড়কে চেতন ও চেতনকে জড় করা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষিরা যে মানবীকে পাষাণীতে পরিণত করিতেন এবং কাঠের নৌকা সোণার নৌকায় পরিবর্ত্তন করিতেন, মূষিককে ব্যাঘ্রে পরিণত এবং বাঘকে পুনরায় মূষিক করিতেন, তাহা এই ইচ্ছাশক্তিরই সাধনবলে। ইচ্ছাশক্তির সাধন-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে এমন হয়।

সেনেটসাহেব ম্যাডামের ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার অদ্ভুত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যে পুস্তকে তিনি ঐ ঘটনা লিখিয়াছেন, সেই পুস্তক ইয়োরোপে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। *

শিষ্য। সেই ইচ্ছাশক্তি কি পদার্থ, তাহা জানিতে চাহি।

গুরু। ন্যায়শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।

ন্যায়দর্শন ১।১।১০

ন্যায়দর্শনের মতে ইচ্ছা আত্মার গুণ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এই সকল আত্মধর্ম্ম, আত্মগুণ বা আত্মার লিঙ্গ। অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানবিশিষ্ট তাহাই জীবাত্মা।

সা চাত্মমনসোঃ সংযোগাৎ সুখাদ্যপেক্ষাৎ স্মৃত্যপেক্ষাদ্বোৎপদ্যতে, প্রযত্ন-স্মৃতি-ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুঃ। পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহ।

* Occult World.

"আত্মা এবং মনের সংযোগ হইতে প্রযত্ন * স্মৃতি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম হেতু সুখাদি বা স্মৃতির অপেক্ষা বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া॥

"আত্মা হইতে ইচ্ছার জন্ম। ইচ্ছা হইতে কৃতি (প্রযত্ন) ও কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

অতএব, ইচ্ছাই কর্ম্মের জননী। এই ইচ্ছার একাগ্রতা হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব হয়। কর্ম্ম কি না, যাহা করা হয়। রোগ-আরোগ্য কর্ম্ম, ধনোপার্জ্জন কর্ম্ম, স্বাস্থ্যলাভ কর্ম্ম, দেবতাসাক্ষাৎ কর্ম্ম,—সকলই কর্ম্ম। ইচ্ছাশক্তির বশে কর্ম্ম সাধন যে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ।

শিষ্য। এখনও একটু গোল আছে।

গুরু। সে গোল কি?

শিষ্য। ইচ্ছাশক্তিতে না হয় কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; কিন্তু বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, কার্য্য মাত্রেরই কারণ থাকে। ইচ্ছাশক্তির বলে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার কারণ কি?

গুরু। কারণ শব্দের অর্থ এইরূপ—

কারণং হি তদ্ভবতি, যস্মিন্ সতি সম্ভবতি, যস্মিন্ অসতি যন্ন ভবতি।
ন্যায় বর্ত্তিকা।

"যাহা থাকিলে যাহা হয়, যাহা না থাকিলে যাহা হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী,—তাহা তাহার কারণ।"

শিষ্য। তাহা হইলে ইচ্ছাশক্তিই কি দেবশক্তি আকর্ষণের কারণ?

গুরু। ইচ্ছাশক্তি নিমিত্ত কারণ,—এবং দেবশক্তি উপাদান কারণ। মনে কর, স্বর্ণকার তোমার হাতের ঐ আংটিটি গড়াইয়া দিয়াছে। সে

* প্রযত্ন সং আরম্ভ, উৎসাহ, (Effort, Attempt)

হাতুড়ী আকাই প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া উহা গড়াইয়াছে, অতএব ঐ গঠন-কার্য্যের নিমিত্তকারণ স্বর্ণকার ও আকাই হাতুড়ী প্রভৃতি যন্ত্র; উহার উপাদান কারণ স্বর্ণ। এস্থলেও ইচ্ছাশক্তি পূর্ব্ব কথিত কয়েকটি বিষয় লইয়া নিমিত্ত কারণ হইয়া উপাদান কারণকে লইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেবন্সও বলিয়াছেন,—"পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব বা ভাবসমূহ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, যাহার বা যাহাদের নিয়ত পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা ব্যতিরেকে যে কার্য্য সংঘটিত হয় না, তৎকার্য্যের তাহা বা তাহারা কারণ"।

শিষ্য। বোধ হয়, হিন্দু পুরোহিত মাত্রেরই এই ইচ্ছাশক্তি পরি-চালনা করিবার ক্ষমতা বিস্তমান আছে ?

গুরু। থাকা একান্তই প্রয়োজন। না থাকিলে যজমানের কার্য্য করিয়া কোন ফলই প্রদান করা যায় না। আমাদের দেশের যাজকগণ, তান্ত্রিকগণ ও কর্ম্মিগণের এই শক্তি বিশেষরূপেই ছিল। পুরোহিত-গণেরও ছিল,—এখনও যে কাহারও নাই, এমত নহে। তবে অধিকাংশ পুরোহিত, পুরোহিতপদবাচ্যই নহে,—তাহারা প্রতারণা করিয়া যজমানের অর্থ উদরসাৎ করে, এইমাত্র।

শিষ্য। কি করিয়া ইচ্ছাশক্তি নিজ আয়ত্তীভূত করিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, দেবশক্তি-দ্বারা কর্ম্ম করিতে ইচ্ছাশক্তি নিমিত্ত কারণ এবং সেই দেবশক্তি উপাদান কারণ। দেব-শক্তিকে লইয়া ইচ্ছাশক্তি (আর তাহার সঙ্গে যে যে শক্তির প্রয়োজন—সঙ্কল্পতত্ত্বে বর্ণিত) পরিচালনা করিতে হইবে। ব্যাপারটি আরও একটু

---

* The cause of an event is that antecedents or set antecedents from which the event always follows, Logic, P, 293.

প্রাঞ্জল করিয়া বলা যাউক। মনে কর, তুমি একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ—এখানে সেই স্ত্রীলোকটির সত্তা অর্থাৎ রূপ গুণ ও হাবভাব এবং কি প্রয়োজনে তাহাকে দেখার আবশ্যক সেই সূক্ষ্মভাব গুলিকে উপাদান কারণস্বরূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, তাহার সহিত তোমার দেখিবার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে ঐকান্তিকী ও একমুখী করিয়া অন্যান্য চিন্তাদি বিরহিত হইয়া, তাহার নিকটে পাঠাও অর্থাৎ ইচ্ছা কর,—দেখিবে নিশ্চয়ই সে আসিয়া হাজির হইবে।

শাস্ত্র বলেন,—

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।

পাতঞ্জলদর্শন, কৈ, পা, ৩।

কৃষকেরা যখন এক জমি হইতে অন্য জমিতে জল দিতে বা জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্ত যন্ত্রাদি দ্বারা স্বভাবতঃ নিম্নদেশ প্রবাহি জলের ভূমির যে আইল বা ক্ষুদ্র বাঁধ থাকে, তাহাই ভেদ করিয়া দেয়, এতদ্ব্যতীত কৃষককে অন্য কিছুই করিতে হয় না। স্বভাবতঃ নিম্নদেশগামী জল আবরণ ভেদ পাইলে আপনিই চলিয়া যায়। মানুষের হৃদয়ে যে ইচ্ছাশক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাকে নিমিত্ত কারণের সহিত সংযুক্ত করিলে, ঐ নিমিত্ত কারণই তাহার গমন বিষয়ক প্রতিবন্ধকতা বা আইল কাটিয়া দেয়, তখন স্বাভাবিক কর্ম্ম করণেচ্ছুক ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মনিষ্পাদনে সমর্থ হয়, অন্য কোন ব্যাপারেরই প্রয়োজন হয় না।

উপাদান কারণটির ধ্যান বা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই ইচ্ছাশক্তি আপনিই তাহার দিকে প্রধাবিত হইবে।

যাঁহারা এই সকল কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে কাজেই চিত্তজয়ী হইতে হয়। আহারে বিহারে ভোজনে গমনে কোন প্রকারেই চিত্তের

বিমলিনতা থাকিলে চলিবে না। কারণ, মনের গতি চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ থাকিলে, ইচ্ছাশক্তি চালনা হয় না। তাই হিন্দুর পুরোহিত হওয়া বড়ই কঠিন। তাই হিন্দুর পুরোহিতের আহারে, বিহারে, গমনে ভোজনে সর্ব্বত্রই সংযমতা। এই ধর্ম্ম-দুর্দ্দিনে হিন্দু পুরোহিতের বেশ-ভূষা সেই প্রকারেরই আছে বটে, কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বিষয়াসক্ত হইয়া পুরোহিতগণ স্ব স্ব মানসিক গতি চঞ্চল বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদিগের দ্বারা দৈবকার্য্যে ফল পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শব্দ-শক্তি।

শিষ্য। তাহা হইলে, মন্ত্রাদি যাহা কিছু বলুন,—সে সকল মিথ্যা; ইচ্ছাশক্তি চালনাদ্বারাই সমস্তকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে?

গুরু। মন্ত্র মিথ্যা? এ উপদেশ তুমি কোথায় পাইলে?

শিষ্য। আপনারই কাছে।

গুরু। আমি কি তোমায় বলিয়াছি যে, মন্ত্র মিথ্যা?

শিষ্য। স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই বটে,—কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যে, সমস্ত কার্য্য হয়, তাহা বলিয়াছেন। তবেই মন্ত্রগুলি স্মারক শব্দ মাত্র।

গুরু। মন্ত্রগুলি যদি স্মারক শব্দও হয়, তাহা হইলেও তাহা নিরর্থক কেন হইবে? কিন্তু মন্ত্রগুলি কেবল শব্দসমষ্টি হইলেও উহার বীর্য্য প্রবল। কেন না, শব্দ ব্রহ্ম,—তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মং বাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে ॥

বাক্যপদীয়।

"সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান, স্বীয়রূপের অভিব্যক্ত্যর্থ শব্দরূপে—বৈখরী অবস্থায় নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

শব্দের অর্থ এই যে, আমাদের সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে যে আন্তর জ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইলে সেই ব্যক্ত আন্তর জ্ঞান প্রব্যক্ত হইয়া বৈখরী অবস্থায় প্রকাশ হয়।

"অব্যক্তভাব ব্যক্ত হইলেই তাহার বিকার হইল; এই ভাববিকার দ্রব্যত্বে পরিণত হয়—কারণ-ভাববিকার বা কার্য্যাত্মভাবই দ্রব্য (Substance), গুণ (Attributes) ও কর্ম্ম (Action) ভাবে অবস্থান করে;—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহারা ভাব-বিকার বা কার্য্যাত্মভাবেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।"

তবেই দেখ, শব্দ কি প্রকার ক্ষমতাশালী। যে কার্য্যের জন্য যে সকল একত্রে গ্রথিত হইয়া যোগবলশালী ঋষিদের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া পদার্থসংগ্রহে শক্তিমান্ হইয়াছিল, তাহাই মন্ত্ররূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব মন্ত্র-শব্দ যে, এক অলৌকিক শক্তি ও বীর্য্যশালী তাহাতে সন্দেহ কি?

শব্দ দ্বারা না হয় কি? তুমি বসিয়া আমার সহিত কথা কহিতেছ,—এখনই যদি দূরে করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি হয়, তুমি কখনই স্থির চিত্তে আমার সহিত কথা কহিতে সক্ষম হইবে না। একজনকে তুমি ভালবাসনা,—সে যদি কাতরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে তোমার স্তব করিতে পারে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার বশীভূত হইবে। শব্দেই পরস্পর আবদ্ধ। কোকিলের কুহু শব্দ শুনিলে, ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ শুনিলে মনে কোন্

অজানা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের পুরাণ কাহিনী মনে আইসে। আবার মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন, ময়ূরের কেকারব —ইহা শ্রবণে অন্য প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়। মনে কোন্ অমূর্ত্ত প্রতিমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ফেলে। শব্দে জীব মোহিত হয়,— শব্দে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত।

ঐ যে কবি, কয়েকটি শব্দচিত্র আঁকিয়া পুত্রহারা জননীর চোখের জল টানিয়া আনিতেছেন, উহার কি শক্তি নাই? ছবিও শব্দশক্তি,— ছবি দেখিলে প্রাণের মধ্যে শব্দের অমূর্ত্তভাব মূর্ত্তিমান্ হয়।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কূর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥

এইটুকু পাঠ করিলে, তোমার মনে কি হয়?

শিষ্য। পরমাবিদ্যা দশভুজার মূর্ত্তি হৃদয়ে উদিত হয়, আর মনে একটি অলৌকিক শক্তিভাবের উদয় হয়।

গুরু। আর যদি পাঠ করা যায়,—

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়,
দারিদ্রদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥

ইহাতে তোমার মনে কি ভাবের উদয় হয়?

শিষ্য। নরক হইতে ত্রাণকারী—জ্ঞানদায়ী করুণাকারী, দারিদ্রদুঃখ-হারী, কর্পূর ও কুন্দ কুসুমনিভ শ্বেত ইন্দু জটাধারী এক মূর্ত্তি মনে আইসে। মনে আইসে, তিনি শিব,—তিনি আমাদের একান্ত মঙ্গলকারী এবং বর প্রদান করেন। ইহাতে এই ভাবেরই উদয় হয়।

গুরু। নিম্নলিখিত কথাগুলি যদি পাঠ করা যায়, তবে তোমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? যথা,—

বিষ্ণুরুদ্র সমুদ্ভূত মহাশন হুতাশন।
মেষমন্দিরদাহেঽত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব॥
প্রদক্ষিণেন ধাবন্তং কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা।
প্রদক্ষিণং দক্ষিণাগ্রে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ॥

শিষ্য। একটি মেষ মন্দির দহন করিবার জন্য একটা মহতী শিখা সম্পন্ন অগ্নিকে মনে আইসে। আর মনে আইসে, কে সেই অগ্নিকে লইয়া একটা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গুরু। কেন, তিনটাই ত ছন্দোবদ্ধময় কবিতা,—কতকগুলি সীমাবিশিষ্ট শব্দ। তিনই এক,—তবে তোমার মনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের উদয় হয় কেন,—বলিতে পার? উহাই শব্দ-শক্তি। শব্দ ভাবময়,—বাগাত্মস্থিত অব্যক্তশব্দ ব্যক্ত হইয়া কতকগুলি আক্ষরিক

মাত্রায় গ্রথিত হইলে একটি ভাবের ছবি চিত্তমুকুরে প্রতিবিম্বিত করে।

যোগবলশালী ত্রিলোকদর্শী ঋষিগণ যেরূপ আক্ষরিক শব্দমাত্রায় যে শক্তি ও যে ভাবের আকর্ষণ-বিকর্ষণ হয়, তাহা স্থির করিয়া মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তির বলে এবং স্বর-কম্পনের সাহায্যে ঐ শব্দ যথাস্থানে প্রেরিত হইয়া মানবের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রের গতি।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, ইচ্ছাশক্তির বলে স্বর-কম্পনের সাহায্যে মন্ত্র অভিলষিত স্থানে গমন করিয়া সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করে। কিন্তু কোন্ শক্তির বলে, মন্ত্র অভিলষিত স্থানে গমন করিয়া থাকে?

গুরু। তুমিইত বলিলে স্বর-কম্পনের সাহায্যে।

শিষ্য। স্বর-কম্পনের সাহায্যে কেমন করিয়া যায়?

গুরু। আমরা যাহাকে ব্যোম বলি, ইংরেজেরা তাহাকে বোধ হয়, ইথর (Ether) বলেন, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য। এই ব্যোম সমস্ত জগৎ, সমস্ত অণু-পরমাণু, সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে। ঐ যে টেবিলখানা পড়িয়া আছে, উহাও ব্যোমে পরিপূর্ণ। দুইটি অণু খুব সংশ্লিষ্ট ভাবে পাশাপাশি বসাইয়া দিলেও, তাহার মাঝখানে একটু ব্যোম অবস্থিতি থাকে,—একমুষ্টি ধূলিকণা সংশ্লিষ্টভাবে চাপিয়া ধরিলেও সেই ধূলিকণাসমূহের মধ্যে ব্যোম থাকে;—আবার প্রত্যেক

ধূলিকণার মধ্যেও ব্যোম আছে। ব্যোম সর্ব্বত্রই,—মহদাদি অণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ব্যোমের অবস্থান। ব্যোমই সর্ব্বত্র। ব্যোমই সকলের জনক।

শব্দ, আলোক, তাপ, তাড়িৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহও ঐ ব্যোম, বা ইথরের কম্পন বিশেষ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, আবার এই ব্যোমের কম্পন দ্বারাই উহাদের আন্দোলিত গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে ঐ আন্দোলিত-গতিশব্দ সরল রেখায় প্রবাহিত হইয়া যথাস্থানে আসিয়া পঁহুছে। মনে কর, আমি আমার শয়নগৃহ চিন্তা করিলাম,—আমার চিত্ত হইতে আর আমার শয়ন-গৃহ পর্য্যন্ত চিন্তার একটি সরল রেখা পড়িয়া গেল, যদি অন্য শক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ এই চিন্তার মধ্যে আর কোন চিন্তার উদয় না হয়, তবে আমি এই স্থানে বসিয়া কথা কহিলে, সে কথা আমার শয়ন গৃহের আমার অভিলষিত লোকে শুনিতে পাইবে। কিন্তু যেই আর কোন চিন্তা উদিত হইবে, অমনি ঐ ব্যোম-কম্পনের স্বরতরঙ্গটি স্থগিতগতি প্রাপ্ত হইবে। মন্ত্র সকলও ঐরূপ গাঢ় ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি দ্বারা ব্যোম-কম্পনের সঙ্গে মিলিত হইয়া আন্দোলিতগতি প্রাপ্ত হইয়া আমার অভিলষিত দেবতার নিকট গিয়া পঁহুছে,—ইহার মধ্যে আর কোন স্থলেই সে দাঁড়ায় না।

শিষ্য। ব্যোম বা ইথরের কম্পনে শব্দের আন্দোলিত গতি, কোন্ বিজ্ঞানের উপর দাঁড় করান যাইতে পারে?

গুরু। কার্য্য মাত্রেরই প্রতি কার্য্য আছে, ইহা অবশ্যই তুমি স্বীকার করিবে?

শিষ্য। নিশ্চয়ই।

গুরু। প্রত্যেক কার্য্যই আপন আপন প্রতিকার্য্যের সমান ও

প্রতিমুখে কার্য্যকারিণী,—এ কথাও বোধ হয়, অস্বীকার করিতে পারিবে না ?

শিষ্য। আজ্ঞা না,—উহা বিজ্ঞান-সম্মত এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

গুরু। এখন মনে কর,—"সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহুর উপরে অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ যে অপর বাহুদ্বয়ের উপরে অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের সমান; সমকোণী ত্রিভুজের ভুজ, কোটি, কর্ণ, এই তিনের মধ্যে দুইটির পরিমাণ অবগত হইলে, আমরা যে অজ্ঞাত তৃতীয় ভুজের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় তৃতীয় নিয়মটির ব্যাখ্যন্তর।" * অবশ্যই তুমি জড়বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া, তাহাতে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তোমাকে আলোক, তাপ, শব্দ ইত্যাদির আন্দোলিত গতি (Wave-Motion) সম্বন্ধে অধিক বুঝাইবার প্রয়োজন নাই,—ইহাদের বক্র সরল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গতির কথাই তুমি অবগত আছ, এক্ষণে তুমি জানিও শব্দাখ্য আন্দোলায়িত গতি, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত গতি, তাপাখ্য আন্দোলায়িত গতি, এবং তাড়িৎ প্রবাহ প্রভৃতির যে প্রকার গতি—চিত্ত-প্রবাহ বা মানস-গতি (Waves of thought) ঠিক সেই নিয়মেরই অধীন। শব্দ, তাপ, আলোক প্রভৃতি যেমন ভাবে, যে প্রকারে উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বক্রীভূত হয়, চিত্ত-প্রবাহ বা মানস-গতিও সেইরূপ নিয়মে উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বক্রীভূত হইয়া থাকে।

এক্ষণে, আমাদের চিত্ত-প্রবাহ বা মানস-গতি মন্ত্রের শব্দ-শক্তি

* "As part of the interpretation of Newton's third law of Motion."—

ব্যোমের পথে অভিলষিত দেবতার নিকটে যে লইয়া যায়, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিয়াছ ?

শিষ্য। হাঁ, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু দেবতার নিকটে গিয়া সে শক্তি কি প্রকারে কার্য্যোৎপাদন করিতে পারে ?

গুরু। তুমি নিদ্রিত আছ, কিন্তু তোমার অভাবে একটা কাজ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তোমার বাড়ীর কেহই তোমাকে জাগাইতে সাহসী হইতেছে না,—কাজটিও চাই। এতদবস্থায় তোমার ব্রাহ্মণী তোমার মেয়েটিকে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন,—"তোর বাপের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিগে,—তা হ'লে ঘুম ভাঙ্গিবে।"

তোমার কন্যা আসিয়া তোমার পায়ের কাছে বসিয়া, পায়ের তলায় ধীরে ধীরে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করিলে, তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল,—চাহিয়া দেখিলে, স্নেহের কন্যা পায়ে সুড়সুড়ি দিতেছে,—সমস্ত প্রাণখানা ভরিয়া স্নেহ-করুণার উদয় হইল, পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলে, তোমার গৃহিণী দাঁড়াইয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বুঝিলে, গৃহিণীর কি কার্য্য সাধনার্থ কন্যা এই সুড়সুড়ি দিতে নিযুক্ত হইয়াছে,—তখনই জিজ্ঞাসা করিলে, "কি কার্য্য বল ?"

এই জিজ্ঞাসায় তোমায় কয়টি ভাবের উদয় হইল ?

শিষ্য। প্রথমেই স্নেহ-করুণা ও বাৎসল্য। তারপর সখ্যতা, অবশেষে কার্য্যাত্মভাব।

গুরু। এস্থলে আরও কিছু বলিবার আছে। যে কার্য্যের জন্য তোমার ব্রাহ্মণী তোমার ঘুম ভাঙ্গাইলেন, সে কার্য্যশক্তি তোমার ছিল, কিন্তু তুমি নিদ্রিত ছিলে বলিয়া, তোমার কার্য্য শক্তিও তোমাতে সুপ্ত ছিল। তুমি নিদ্রিত ছিলে বলিয়া সে কার্য্যের খবর তুমি লইতে পার নাই। কার্য্যটি বস্তুতঃ তোমারই—কিন্তু সেই কার্য্যটি করিলে তোমার

ব্রাহ্মণীও সেই কার্য্যের ফলভাগিনী হইবেন, না করিলে অভাব বোধ করিবেন; তাই তোমাকে জাগাইয়া লইলেন। তদ্রূপ দেবশক্তির কার্য্যই আমাদিগকে সুখে রাখা। কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারেন্ না, আমাদিগের কিসের অভাব, তাই আমরা কর্ম্মাত্মক-মন্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেই—আমাদিগের ইহার অভাব। তোমার ব্রাহ্মণী যেমন কন্যা দ্বারা তোমার পায়ে সুড়সুড়ি প্রদান করিয়া, তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন, আমরাও তদ্রূপ মন্ত্রশক্তি পরিচালন দ্বারা অভিলষিত দেবতার অঙ্গে সুড়সুড়ি প্রদান করিয়া থাকি,—তখন তিনি জাগিয়া দেখেন, পার্শ্বে শব্দ-শক্তি দাঁড়াইয়া। স্বর-ঝঙ্কার শব্দ-শক্তিকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখে, তাহার নিকটে কার্য্যের অভাব শুনিতে চাহিয়া অভিলষিত বর-দানে বা ক্রিয়া সাধনে আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন।

কাজেই ইচ্ছাশক্তি, ঐকান্তিকী বুদ্ধি, ভাব, শব্দ, স্বর-কম্পন প্রভৃতি দেবতা ও আরাধনায় প্রয়োজন হয়। কাজেই মন্ত্রের আক্ষরিক শব্দগুলি মিথ্যা নহে। ঐ শব্দগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইচ্ছাশক্তির পরি-চালনে কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মন্ত্র-তত্ত্ব।

শিষ্য। আমি আপনার নিকটে আর একদিন শ্রুত হইয়াছি, বীজ মন্ত্র সমুদয় শক্তির ব্যক্ত সূক্ষ্মবীজ। যেমন "ক্লীং" কৃষ্ণের সূক্ষ্ম ব্যক্তবীজ,—ঐ সকল বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যাও শ্রুত হইয়াছি, * এক্ষণে যে সকল ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রাদি আছে, তদ্বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যাহা শুনিবার ইচ্ছা, তাহা বল।

শিষ্য। যে সকল ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আছে, তাহা দেবতা বিশেষের ধ্যান, স্তব, কবচ প্রভৃতি। আপনি বলিয়াছেন, দেবতাগণ সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তি। যাঁহারা সূক্ষ্ম অদৃষ্টশক্তি, তাঁহাদের আবার স্তব কবচ ধ্যান ধারণা কি? অরূপের রূপ কেন? অরূপের স্তব কেন,—তোষামোদ কেন? এরূপ করিলে কোন ফল লাভ হইতে পারে কি?

গুরু। তোমার হৃদয়ে যে দয়া আছে, সে দয়াটি কি পদার্থ?

শিষ্য। দয়া চিত্তেরই একটি বৃত্তি।

গুরু। উহার কি রূপ আছে?

শিষ্য। না।

গুরু। তোমার দরজায় আসিয়া ঐ অন্ধ ভিখারী বলিতেছে,—ওগো বাড়ীওয়ালা; আমি চারি দণ্ড আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি, তোমরা কি

* মৎ প্রণীত "জন্মান্তর রহস্য" নামক গ্রন্থে "মন্ত্রচৈতন্য" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে যাহা বলা হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধ করা গেল।

নবাব খাঁ‍ঞ্জা খাঁ,—দুটি ভিক্ষা দিতে পার না? অন্ধ ভিখারীর একথায় তাহার উপরে তোমার দয়া হয় কি?

শিষ্য। না।

গুরু। কি হয়?

শিষ্য। রাগ হয়।

গুরু। না হয়, তুমি যদি বড় ভাল লোক হও, রাগ না করিয়া এক মুষ্টি চাউল তাহার ঝুলিতে দিয়া বিদায় করিয়া দাও। কিন্তু তাহার উপরে তোমার দয়ার উদয় হয় না, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু আর একজন ভিখারী আসিয়া যদি বলে,—"বাবু গো, আমি দুই দিন খেতে পাই নি; তোমরা বড় লোক, তোমরা না খেতে দিলে আমায় কে খেতে দিবে? কতলোক তোমাদের দুয়ারে খেয়ে জীবন ধারণ ক'চ্চে,—আর আমিই কি না খেয়ে মারা যাব?"—এব্যক্তির উপরে তোমার দয়াবৃত্তি অবশ্যই স্ফুরিত হইবে। ইহাকে নিশ্চয়ই এক মুঠা চাউলের স্থলে দুই মুঠা দিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দয়ার ত রূপ নাই, তবে তোমামোদে দয়ার উদ্রেক হয় কেন?

শিষ্য। আমার বোধ হয়, আমি আকার বিশিষ্ট—ঐ কথাগুলি আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া, আমার দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিতে পারিয়াছে।

গুরু। হাঁ, তাহাই। দেবতাও ত ঈশ্বরের শক্তি। আমাদের স্তব স্তুতি সেই বিরাট চৈতন্যে অবভাসিত হইয়া, তাঁহারই অরূপ বা স্বরূপ দেবশক্তির উদ্রেক করিয়া থাকে। ইহাতে আপত্তি কেন?

শিষ্য। বুঝিলাম। আরও কথা আছে।

গুরু। বল।

শিষ্য। বৈদিকমন্ত্র সকলে এমন অনেক কথা আছে, যাহা দেবতার বা ঈশ্বরের স্তব নহে,—সে কেবল কতকগুলি অন্যার্থ বোধক কথা।

আরাধনা পূজা বা যজ্ঞাদি করিবার সময় সে সকলের নামোল্লেখ বা পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? সেরূপ একটি মন্ত্র এই,—

প্রজাপতির্ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ-প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণো ঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা।

গুরু। মন্ত্রটি সামবেদীয়—পাণিগ্রহণ (কুশণ্ডিকা) বা উত্তর বিবাহের। ইহার কোন্ স্থল তোমার জিজ্ঞাস্য? "ওঁ অগ্নি" হইতে আরম্ভ করিয়া "স্বাহা" পর্য্যন্ত মন্ত্র। আর পূর্ব্ব ভাগ অর্থাৎ "প্রজাপতি" হইতে "বিনিয়োগঃ" পর্য্যন্ত ঐ মন্ত্রের যে ঋষি, যে ছন্দ, যে দেবতা ও যে কার্য্যে উহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারই স্মারক বিষয়। অর্থাৎ যে মন্ত্রটি তুমি বলিলে, উহার ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ অতি-জগতী, দেবতা অগ্নি, আজ্যহোমে উহা নিয়োগ করিতে হয়। তৎপরে মন্ত্রের অর্থ এই—

"দেবপ্রধান অগ্নি, ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হইতে আগমন করুন; তিনি এই কন্যার ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততিকে মৃত্যু-পাশ হইতে মোচন করুন? বরুণরাজ ইহার অনুমোদন করুন এবং এই স্ত্রী যাহাতে পুত্র সম্বন্ধীয় শোক প্রাপ্ত হইয়া রোদন না করে, তাহা করুন।"

তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে?

শিষ্য। মন্ত্রের প্রথমে যে ঋষি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ কি?

গুরু। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী পাঠ করিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ, করিয়াছি।

গুরু। পদাবলীর উপরে লেখা আছে,—বসন্তরাগেণ যতিতালেন

গীয়তে। দেশ-গুর্জ্জররাগেণ রুদ্রতালেন গীয়তে। তাহার অর্থ কি জান ?

শিষ্য। তাহা আবার জানি না ?

গুরু। কি জান ?

শিষ্য। ঐ পদাবলী যে সুরে ও যে তালে গাহিতে হইবে, তাহাই লেখা আছে।

গুরু। মন্ত্রের পূর্ব্বেও ঐ মন্ত্রের যে ঋষি, যে ছন্দ, যে দেবতা ও যে কার্য্যে ঐ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাই লেখা আছে। জানিতে না পারিলে, তুমি কার্য্য করিবে কি প্রকারে ? যে ভাবে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, যে ছন্দে উহা সুর করিতে হইবে, যেরূপ ভাবে ঐ মন্ত্রের গতি হইবে, কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির পরিচালন করিতে হইবে, তাহা জানিতে না পারিলে, কেমন করিয়া কার্য্য ও সিদ্ধি লাভ করিবে ?

শিষ্য। ঋষি অর্থে কি ? অনেকে বলেন, মন্ত্রের রচয়িতাই ঋষি।

গুরু। ঋষি বৈদিক শব্দ,—অতএব ঋষি কি জানিতে হইলে, বেদ ইহার কিরূপ অর্থ করেন, তাহাই জানা প্রয়োজন। যাঁহারা বলেন, মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি, তাঁহারা যে বিষম ভ্রান্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা, মন্ত্রের কেহই প্রণেতা নাই। মন্ত্র স্বয়ং প্রকাশিত। যোগযুক্ত হৃদয়ের অত্যধিক স্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও বিকিরণ হয়। বৈদিক মন্ত্রেরই ঋষি আছে। বেদ, এই ঋষি শব্দ কি কিরূপ অর্থে ব্যবহার করেন, শোন,—

"সহজাত ছয় ঋষির সম্বন্ধে যে সপ্তম, প্রাচীনগণ তাহাকে 'একজ' এবং ঐ সমকালোৎপন্ন ছয় ঋষিই 'দেবজ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাদের ইষ্টসমূহ ধামানুসারে বিহিত হইয়াছে। তাহারা

নানাবিধ আকারে বিকৃত হওত এক স্থাতার জন্য দীপ্তি পাইতেছে।" ঋক্‌বেদ ১৫ ঋক্।

নিরুক্ত নামেই প্রসিদ্ধ নিরুক্ত-পরিশিষ্টে (১, ২, ১৯,) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা অবিকল এইরূপ আছে।—

"সহজাত ছয় ঋষির সম্বন্ধে আদিত্য সপ্তম। তাহাদের (এই সাতের ইষ্টসমূহ অর্থাৎ কান্তসমূহ বা ক্রান্তসমূহ বা গতসমূহ, মতসমূহ বা নতসমূহ জলের সহিত সম্মোদিত হইয়া থাকে। যেখানে এই সপ্তঋষিগণ সপ্ত জ্যোতিঃ, তাহাদের মধ্যে আদিত্যই শ্রেষ্ঠ। তাহারা (সেই ছয়) ইহাতে (আদিত্যে) একীভূত হইয়া থাকে। * * *

মূলের পদগুলি ও নিরুক্তের ব্যাখ্যা, এতদুভয়ে একত্র সমালোচিত হইলে, এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়—

"সহজাত —এক সময়ে উৎপন্ন অর্থাৎ আদিত্য সৃষ্টির পরে জন্তুদের আশ্রয় সৃষ্টির সময়। * * *

ছয়—পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি। এ স্থানে পৃথিব্যাদির চন্দ্রগুলি পৃথিব্যাদের গ্রহণেই গৃহীত বুঝিয়া লইতে হইবে। * * *

ঋষি—নিরুক্তে প্রকাশিত ব্যাখ্যায় এস্থলে ঋষি শব্দে জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ। এবং ঋষ ধাতুর অর্থ গতি; তদনুসারে গতিমান্ অর্থও হইতে পারে।" *

বেদের যাহা অর্থ, বেদে যাহাকে ঋষি বলে, তাহা বুঝাইয়াছি,— অর্থাৎ যাহা জ্যোতিষ্মান্ গতি তাহাই ঋষি। এই ঋষিই তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ইথারীয় সিদ্ধান্ত (Etherecal Hypothesis)

মন্ত্র প্রথম পাঠ করিবার সময় জানিতে হইবে যে, এই মন্ত্রের ঋষি

* বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত "ত্রয়ীভাষা ৩৮—৩৯ পৃষ্ঠা।

কে, অর্থাৎ ইহার ব্যোমিক গতি কি প্রকার। এক এক ঋষিতে এক এক প্রকার গতি স্থির করা আছে। সে গতি তাল মাত্র। যেমন ধ্রুপদ বলিলে, এক প্রকার তাল বুঝিতে পার, ঠুংরী বলিলে আর এক প্রকার বুঝিতে পার এবং কাওয়ালি বলিলে আর এক প্রকার বুঝিতে পার, মন্ত্রাদিতেও তেমনি ঐ গতির তাল বুঝিবার জন্য প্রজাপতি ঋষি, প্রস্কন্ন ঋষি প্রভৃতি ঋষি নাম দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। বুঝিলাম। অতিজগতীচ্ছন্দটা কি?

গুরু। ছন্দ, সুর। যেমন তোটক ছন্দ পাঠ করিতে হইলে, এক রূপ সুরে পড়িতে হয়, পয়ার ছন্দ আর প্রকার সুরে এবং ত্রিপদী বিভিন্ন প্রকার সুরে পাঠ করিতে হয়;—তদ্রূপ ঐ ছন্দের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ সুরে মন্ত্রটি পাঠ করিতে হইবে। এই সুর-কম্পনই ঋষির স্কন্ধে চাপিয়া বা গতিবান্ হইয়া অর্থাৎ বক্র, সরল ঋজুভাবে যেরূপে যাইতে হইবে, সেইরূপে অভিলষিত স্থানে ঐ শব্দতত্ত্ব গুলি গিয়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। যেমন টৌড়ি, সোহিনী, বাহার, বেহাগ, মালকোষ প্রভৃতি বলিলেই তাহাদের সুরগুলি মনে আইসে, ঐ ছন্দগুলির সম্বন্ধেও কি তাহাই হয়?

গুরু। যাহারা গানের রাগিণী গুলির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহারা ঐ নামগুলি করিলে কখনই সে সুর মনে আনিতে পারে না, গাহিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ ছন্দগুলির সুর যাহারা জানে না, তাহারা কখনই ছন্দের নাম শুনিয়াই মন্ত্রের সুর করিতে পারে না। কিন্তু সুর ও গতির তাল ঠিক করিতে না পারিলে কখনই মন্ত্রের ফল হয় না। আমি তোমাকে আগে বুঝাইয়াছি,—এজগৎ শব্দ মাত্র—স্বর-কম্পনে স্থিতি; সেই কম্পনও তালে তালে,—তাই জগতের সকলই তালে তালে।

সূক্ষ্মতত্ত্বের সহিত মন্ত্রতত্ত্ব মিশিতে না পারিলে ফল প্রদান করিবে কেমন করিয়া?

শিষ্য। মন্ত্রবিশেষের জন্য সুরবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে কি কোন ক্ষতি হয়? মোটের উপরে যে কোন একরূপ সুর করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। যুদ্ধের সময় কামদ রাগিণীতে খেমটা তাল গান গাহিলে, বিবাহ-বাসরে মেঘমল্লারে ধ্রুপদ তালে গান গাহিলে কেমন লাগে?

শিষ্য। ছি! তাও কি হয়?

গুরু। মন্ত্রেও সেইরূপ হয় না;—স্বর-কম্পনে ভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে।

শিষ্য। যেমন কোন্ সময়ে কোন্ রাগিণী ও কোন্ তালে গান গাওয়া যায়, নির্দ্দিষ্ট আছে, মন্ত্রের ছন্দাদিরও কি সেরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে?

গুরু। সেরূপ নাই, তবে কি একসুরে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইল? যদি তাহাই হইবে, তবে পৃথক্ পৃথক্ ঋষি, পৃথক্ পৃথক্ ছন্দ, পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ও পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে কেন? কোন্ কামনায় কোন্ ছন্দের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"যে তেজ (শরীরকান্তি) ও ব্রহ্মবর্চ্চস (শ্রুতাধ্যয়নসম্পত্তি) কামনা করিবে, সে গায়ত্রীচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। গায়ত্রীচ্ছন্দ তেজঃস্বরূপ ও ব্রহ্মবর্চ্চসস্বরূপ, যে এইরূপ জানিয়া গায়ত্রীচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চ্চস্বী হয়।

যে আয়ুঃ কামনা করিবে, সে উষ্ণিক্‌ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের

সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। উষ্ণিক্‌ছন্দ আয়ুঃস্বরূপ। যে এইরূপ জানিয়া উষ্ণিক্‌ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়।

যে স্বর্গ কামনা করিবে, সে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের মন্ত্রদ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করিবে। অনুষ্টুপ্‌ছন্দের দুই ঋকে ৬৪ অক্ষর আছে ; যজমান এক এক অক্ষরের পাঠকালে এক এক অংশ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া, চতুঃষষ্টিতম অক্ষরের পাঠ ফলে [ত্রিলোকের শেষাংশে (সর্ব্বোপরি) স্থিত] স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এইরূপ জানিয়া অনুষ্টুপ ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে শ্রী ও যশ কামনা করিবে, সে বৃহতীচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। বৃহতীচ্ছন্দ, ছন্দঃসমূহের শ্রী ও যশ, যে এইরূপ জানিয়া বৃহতীচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে আপনাতে শ্রী ও যশই ধারণ করে।

যে, যজ্ঞসিদ্ধি কামনা করিবে, সে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় স্বিষ্টিকৃদ্-যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। যজ্ঞের একটি নাম 'পঙ্‌ক্তি'। যে এইরূপ জানিয়া পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, যজ্ঞ ইহার নিকটে নত হয়।

যে বীর্য্য কামনা করিবে, সে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ ওজঃস্বরূপ ইন্দ্রিয়শক্তিস্বরূপ ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারী। যে এইরূপ জানিয়া ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টি-কৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে ওজস্বী, ইন্দ্রিয়শক্তিমান্ ও বীর্য্যবান্ হয়।

যে পশু কামনা করিবে, সে জগতীচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের

সংযাজ্যরূপে) পাঠ করিবে। পশু সমস্তই জগতীতে উৎপন্ন। যে এইরূপ জানিয়া জগতীচ্ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় (স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে পশুমান্‌ হয়।

যে অন্নাদি কামনা করিবে, সে বিরাট্‌ছন্দের ঋগ্‌দ্বয় স্বিষ্টিকৃদ্‌যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। অন্নই বিরাট্‌ (হইবার হেতু)। এ জগতে যাহার যথেষ্ট অন্ন হয়, সেই ব্যক্তি সমাজে যথেষ্ট বিরাজ করে; তাহাই এস্থলে বিরাট্‌ শব্দের তাৎপর্য্য। যে এইরূপ জানে, সে আত্মীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, আত্মীয়গণের মধ্যে বিরাজ করে।

শিষ্য। মন্ত্রের দেবতা অর্থে, সেই মন্ত্র যে দেবতার নিকটে ফল লাভ করিবে, তিনিই কি? এখানে যেমন অগ্নি দেবতা। অতএব ইচ্ছাশক্তিকে অগ্নিতত্ত্বে লইতে হইবে?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। আর বিনিয়োগ অর্থে যে কার্য্যে ঐ মন্ত্র নিয়োগ করিতে হইবে, এখানে যেমন 'আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ' অর্থাৎ আজ্যহোম করিবার সময় নিয়োগ করিবে?

গুরু। হাঁ,—তাহাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রসিদ্ধি।

শিষ্য। তাহা হইলে, মন্ত্রের দ্বারা কাজ করিতে হইলে, মন্ত্রের গতি (Motion) মন্ত্রের স্বর, মন্ত্রের দেবতাতত্ত্ব প্রভৃতি উত্তমরূপে অভ্যাস না করিতে পারিলে, উহা দ্বারা কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই?

* ত্রয়ীভাষা; ১০০—১০২ পৃঃ।

গুরু। বিশেষতঃ বৈদিক মন্ত্রের ঐ সকল উত্তমরূপে না জানিলে, কোন ফল হইবারই সম্ভাবনা নাই। আবার স্বর কম্পনের বৈকল্যে কর্ম্মের ফলও বিপরীত হইয়া থাকে।

এক ঋষির পুত্রকে ইন্দ্র হত্যা করেন; তাহাতে ঐ ঋষি অত্যন্ত মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন এবং পুত্রশোকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও শোকাতুর হইয়া পড়েন।

ইন্দ্রের এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের অনিষ্ট করিবার জন্য ঐ ঋষি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে "ইন্দ্র-শত্রো ভব" এই বলিয়া হোম করেন। "ইন্দ্র-শত্রু হউক" অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু হউক, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের স্বর-কম্পন বাহির না হইয়া অনবধানতা প্রযুক্ত "ইন্দ্র-শত্রু হউক" অর্থাৎ ইন্দ্র শত্রু যাহার সে হউক, এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের স্বর-কম্পন বাহির হইয়াছিল। তাহাতেই বৃত্রাসুরের জন্ম হয়; কিন্তু সেই বৃত্রাসুর ইন্দ্রের হন্তা না হইয়া, ইন্দ্রই তাহার হন্তা হইয়াছিলেন।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, বিশেষতঃ বৈদিক মন্ত্রের,—তাহা হইলে, অন্যান্য মন্ত্র—যথা পৌরাণিক, তান্ত্রিক মন্ত্রাদি কি স্বর-কম্পনাদি না হইলেও ফলপ্রদ হয়?

গুরু। আমি সে ভাবে বলি নাই,—বৈদিক মন্ত্রাদির ঐ সকল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু পৌরাণিক বা তন্ত্রাদির স্বর-কম্পনাদি উহার মত অত কঠিন নহে। উহা সহজেই অভ্যাস করা যাইতে পারে।

শিষ্য। কেমন করিয়া অভ্যাস করা যাইতে পারে, তাহা বলুন।

গুরু। ইহা গুরুর নিকটে মুখোমুখী শিখিতে হয়। গানের রাগিণী, আর গানের তাল বলিয়া দিলেই কিছু সকলে গান গাহিতে পারে না। তবে যাহারা খাম্বাজ রাগিণীর একতালা তালের গান জানে, তাহাদিগের

নিকটে খাম্বাজ রাগিণীর ও এক তালা তালের নাম করিয়া গানের কথাগুলি বলিলে, তাহারা গাহিতে পারে।

শিষ্য। ভাল, সংস্কৃতভাষায় যে মন্ত্রাদি আছে, উহা কি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া এবং ছন্দোবদ্ধ করিয়া লইয়া পাঠ করিলে ভাল হয় না?

গুরু। কেন, সংস্কৃত তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছে?

শিষ্য। এখন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা কমিয়া গিয়াছে, নাই বলিলেও হয়। এতদবস্থায় মন্ত্রগুলি বাঙ্গলায় করিলে, সকলেই বুঝিতে পারে।

গুরু। মন্ত্র বুঝা উদ্দেশ্য, না কর্ম্মীর কর্ম্মের ফললাভ উদ্দেশ্য?

শিষ্য। ফললাভ করাই উদ্দেশ্য।

গুরু। তাহা হইলে সংস্কৃতেই রাখিতে হইবে।

শিষ্য। কেন, সংস্কৃত ভাষার কোন দৈবশক্তি আছে নাকি?

গুরু। দৈবশক্তি সকল ভাষারই আছে। কেবল সংস্কৃত নহে, যে ভাষায় যে মন্ত্র আছে, সেই ভাষায় সেই মন্ত্র পাঠ করিলে তবে ফল হইয়া থাকে,—নতুবা হয় না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি?

গুরু। কারণ তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মন্ত্র সকল সাধকের ধ্যান-ধারণায় তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশিত পদার্থ। সেই ক্রিয়া সম্পাদন করিতে যেখানে যে গতি, যেখানে যে স্বর-কম্পন, যেখানে যে তত্ত্বের আবশ্যক, ঐ মন্ত্রের ছন্দোবদ্ধে তাহা আছে। ভাষার অর্থে কিছুই নাই,—ভাব আছে। আক্ষরিক ভাবে শক্তি গ্রথিত থাকে। উহাকে ভাষান্তরিত করিলে, কখনই ফল হইবে না। সংস্কৃত হউক, ইংরাজী হউক, বাঙ্গালা হউক, অপভাষা হউক, আরবী, পার্শী, যাহাই হউক, যে ভাষায় যে ভাবে যেরূপ ছন্দে মন্ত্র আছে,—তাহাকে কোন প্রকার রূপান্তরিত বা ভাষান্তরিত করিলে, তাহার ফল হয় না।

সাত বৎসর আগের কথা বলিতেছি,—আমাদের গ্রামের একটি স্ত্রীলোককে সাপে কামড়ায়।

আমাদের বাড়ীতে একটি চাকর আছে, সে সাপের মন্ত্র, সাপের ঔষধ খুব ভাল জানে,—এককথায় সে সাপের ওঝা বলিয়া বিখ্যাত। ঐ স্ত্রীলোকটিকে শেষরাত্রে সাপে কামড়ায়,—প্রত্যুষে একজন লোক আমাদের চাকর রামাকে ডাকিতে আইসে। আমিও সংবাদ পাইয়া রামার সঙ্গে ঐ রোগীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে গিয়া দেখি, অনেক লোক জুটিয়া পড়িয়াছে। ওঝাও দুই চারিজন আসিয়াছে,—তাহারা "ঝাড়ান কাড়ান" করিতেছে, কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই। রোগীর অবস্থা দেখিলাম অতিশয় মন্দ। সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—দক্ষিণ পায়ের মধ্যমাঙ্গুলীতে কামড়াইয়াছিল, কিন্তু তখন তাহার হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছিল,—রোগীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, ঐ পর্য্যন্ত এমন ভাবে জ্বলিয়া যাইতেছে যে,—উহার জ্বালায় আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, থাকিতে পারিতেছি না, আমার বসিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হইতেছে। জিজ্ঞাসায় আরও জানিলাম, বিষ ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে,—জ্বালাও ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে।

রামা রোগীর কাছে বসিয়া, তাহার ক্ষতস্থান লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া, যে ওঝায় ঝাড়িতেছিল, তাহাকে বলিল,—"তোরা কেবল নামে ওঝা, কাজে যম। হাঁ রে, এ যে কানী-কাটা" এ বিষ নামাতে তোদের এত দেরি ?"

পরে জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম, ওঝাদের চলতি কথায় উবো, কানী ও সাট এই তিন প্রকার দংশন বলে। সাপ যদি মুখ সরল করিয়া দংশন করে, তবে সেই দংশনকে "উবো" বলে, যদি দক্ষিণ পার্শ্বে একটু

বক্র হইয়া দংশন করিয়া থাকে, তবে তাহাকে "কানী" বলে এবং যদি দংশন করিয়া পরে একপার্শ্বে বক্র হইয়া মুখ তুলিয়া লয়, তবে তাহাকে "সাট" বলে। "উবো" এবং "কানী" এই দুই প্রকারের যে কোন প্রকারে দংশন করিলে, বিষ দূর করা সহজ এবং "সাট" ভাবে দংশন করিলে, তাহা গুরুতর, অধিকাংশ স্থলে প্রাণনাশক।

যাহা হউক, রামার ঐ প্রকার অবজ্ঞাসূচক কথা রোগী এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের আশাপ্রদ ও উৎসাহপ্রদ হইলেও আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলাম। যদি রোগীকে বাঁচাইবার কোন উপায় থাকে,—রামাকে সত্বরতার সহিত তাহা করিতে অনুরোধ করিলাম।

রামা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কোন ভয় নাই। রোগী কখনই মারা যাইবে না।"

সে একটু ধূলা কুড়াইয়া লইয়া যে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে, সেই স্থানে একটা ঘুরাইয়া দাগ দিয়া মন্ত্র পাঠ করিল। তৎপরে বলিল,—"আমি একটু ঘুরিয়া আসি।"

তখন প্রভাতের রৌদ্র গাছের ডালে, গৃহের ছাতে উঠিয়া পড়িয়াছে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুই কোথায় যাবি রামা ?"

রামা বলিল—"গরু কটা দুয়ে দিয়ে আসি। খোকাবাবু দুধ খাবে; রাখালে গরু মাঠে নিয়ে যাবে।"

আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"গরুদোয়া একটু পরে হইবে এখন। একটা মানুষ মরে। যদি কিছু জানিস্ বাপু লোকটা যাতে বাঁচে, তা কর্! তুই ঘুরিয়া আসিতে আসিতে ততক্ষণ বিষ উহার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিবে—হয় ত ততক্ষণ মারা যাইবে।"

রামা বলিল,—"না, না, বিষ আর উঠিতে পারিবে না। আমি ঐ

ধুলা পড়িয়া তাগা বাঁধিয়া দিলাম। এখন দশদিন থাকিলেও বিষ আর উঠিতে পারে না।"

আমার কিন্তু তাহা বিশ্বাস হইল না। তখন মন্ত্রের উপরেই তেমন বিশ্বাস ছিল না। বলিলাম,—"সে কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। একটি মানুষের জীবন লইয়া ওরূপ অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে, যদি পারিস্—যাতে শীঘ্র সারে, তাহা কর্।"

রামা জানিত, আমি তাহার মন্ত্রের উপর একেবারেই আস্থাবান্ বা বিশ্বাসী নহি। সে বলিল,—"ভালই হইল। আ'জ আপনাকে মন্ত্রের শক্তি দেখাইতে সুযোগ পাইয়াছি। এই রোগীকে কোন ঔষধ খাওয়াইব না,—আমি উহার গাত্রও স্পর্শ করিব না। দূরে বসিয়া, কেবল মন্ত্র পড়িয়াই বিষ নামাইয়া দিব। আপনি মন্ত্র বিশ্বাস করেন না,—কিন্তু এমন হইলে ত বিশ্বাস করিবেন ?

আমি বলিলাম,—"বিশ্বাস নিশ্চয়ই করিব, কিন্তু ঔষধ সেবন করাইলে যদি রোগী শীঘ্র এবং নিশ্চয় আরাম হয়, তবে তাহাই কর, কারণ আমার কৌতূহল নিবারণ করিতে যেন একটা মানুষের জীবন নষ্ট করিস্ না।"

রামা হাসিয়া বলিল,—"ঔষধের চেয়ে মন্ত্রে আরও শীঘ্র বিষ নামিয়া যাইবে।"

তখন রামা, একটা মানকচুর পাতা কাটাইয়া আনাইয়া তাহার উপরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া, সুর করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। মন্ত্রের সুর এমন ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল যে, তাহা শুনিলে প্রাণের মধ্যে কেমন একটা গম্ভীর ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল,—আর যেন মনে হইতে লাগিল,—ব্যোম পথ কাঁপিয়া কাঁপিয়া কোন্ অদৃষ্ট অজানা শক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। সে মন্ত্রটি

আমি মনঃসংযোগের সহিত শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম,—মন্ত্রটি বহুবার আবৃত্তি করিয়াছিল, সুতরাং মুখস্থ করিতে কোন অসুবিধা বা ভ্রম হয় নাই। মন্ত্রটি শুনিলে, তুমি হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই মন্ত্রের প্রভাবেই রোগীর সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হইয়া গেল,—রোগী ঢলিয়া পড়িতেছিল—উঠিয়া ঘরে গেল। মন্ত্রটি এই—

হাড়ে মাংসে মজ্জ বিষ হাড়ে কর বাসা।
খেদারিয়া দেহ বিষ বলেন মনসা।
বিষের বিষম ডাক দিল নর্ত্ত শিখী।
ময়ূর স্মরণে বিষ নামে ধিকি ধিকি॥
নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে॥

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই রোগীর বিষের জ্বালা বিদূরিত হইল,—মৃত্যু-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখে আশ্বাসের ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। সে, সুস্থ হইয়াছে বলিয়া গৃহে চলিয়া গেল। আমি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। জড়-বিজ্ঞানের কোন সূত্রই ইহার উপরে খাটাইতে পারিলাম না। বাড়ী গিয়া রামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামা! এই মন্ত্রের মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে যে, তদ্দ্বারা এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইল?"

রামা আমার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে আমাকে তাহার নিকট মন্ত্রটির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে শুনিয়া বলিল,—"আপনি ও মন্ত্রটি শিখিয়া ফেলিয়াছেন, দেখিতেছি। কিন্তু ঐ মন্ত্রদ্বারা কোথাও যেন রোগী আরাম করিতে যাইবেন না।"

আমি। কেন?

রামা। মন্ত্র সুর করিয়া পড়িতে হয়। সুর করিয়া না পড়িলে,—মন্ত্রে কাজ হয় না। যেরূপ সুর করিয়া পড়িতে হয়, তাহা আপনি রোগী

ঝাড়িবার সময় শুনিয়াছেন। কিন্তু একবার শুনিয়া সুর শিখা যায় না—এক একটি মন্ত্রের সুর শিখিতে দুই মাস কাটিয়া যাইতে পারে। যদি মন্ত্রশিক্ষার প্রয়োজন হয়, আমার কাছে সুর শিখিয়া লইবেন।

রামার কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম,—কি আশ্চর্য্য! একটু গলার সুর, আর ঐ অস্বাভাবিক বিন্যসিত কতকগুলি শব্দে কি করিয়া সাপের বিষ বিদূরিত হইল! শরীরস্থ সর্প-বিষ মন্ত্র-বলে উড়িয়া গেল! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

আরও আশ্চর্য্যের কথা শোন,—সন্ধ্যার ঠিক পরেই যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছিল,—তাহার ভ্রাতা ছুটিয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

রামা বাড়ীতেই ছিল,—তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে, রামাকে বলিল, আমার ভগিনী হঠাৎ জ্ব'লে গেলাম, ম'রে গেলাম বলিয়া চীৎকার করে উঠিয়া, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে; চক্ষুর পাতা স্থির হইয়া আসিয়াছে।"

সংবাদ শুনিয়া আমি বুঝিলাম,—"তাইত! মন্ত্রের বলে নাকি আবার বিষ উপিয়া যায়! তখন বিজ্ঞানের মীমাংসায় স্থির করিলাম, রামার অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত ইচ্ছাশক্তির (will force) বলে, বিষটা স্তম্ভিত হইয়াছিল,—সময়ে তাহার সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে বসিয়াছে।

রামা কিন্তু সে সংবাদে অবিচলিতই থাকিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"শালা আমার সঙ্গে বুজরুকি ক'রেছে। আমি তখন গরু ডুইবার বেলা হয়ে গিয়াছে দেখে, ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—নতুবা কি আর আমার সঙ্গে চালাকি।"

"রামা, কি হ'য়েছে? তোর রোগী যে গেল।"—রামার মুখের

দিকে চাহিয়া আমি এই কথা বলিলে, রামা বলিল,—"রোগী মারা যাবে না বাবু,—ও রোগী কি আর মরা যা?? যে শালা আগে ঝাড় ছিলো, তারই এ কাম!"

আমি। সে কি করিয়াছে?

রামা। সেই একটুখানি বিষ কোথায় গেঁটেলি ক'রে রেখেছিল। এখন খাওয়া দিয়াছে।

খাওয়ার অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিয়াছিল,—মন্ত্রের দ্বারায় সেই একটুখানি বিষ সর্ব্বাঙ্গে চালনা করিয়াছে। একে কেউটে সাপের বিষ,—তাতে মন্ত্রের জোর, কাজেই রোগীকে অত কাতর কোরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে এমন করিল কেন?"

রামা। আমার উপরে বাদ সাধিয়া। সে রোগী সারাইতে পারে নাই,—আমি সারাইয়া নাম লইব, তারই জন্তে।

আমি। এখন তবে উপায়?

রামা। আমি গিয়েই আরাম ক'র্‌বো।

আমি। তবে এখনি চল্।

তখনই রামাকে সঙ্গে লইয়া রোগীর বাড়ী উপস্থিত হইলাম,—রামা এক কলসী জল আনাইয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই জল দিয়া রোগীকে স্নান করাইল, তারপরে কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীকে আরোগ্য করিল।

আমি দেখিয়া, মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই অবধিই আমি মন্ত্রের শক্তি লইয়া আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি।

তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে,—অল্পদিন হইল, ইংরেজী বাঙ্গালা প্রায় সকল সংবাদপত্রেই একটি সর্পদষ্ট ব্যক্তির আরোগ্যের কথা প্রকাশ হইয়াছিল। সে ঘটনাটা এই,—

পশ্চিম-রেল-লাইনের একটি কুলিকে লাইনে কাজ করিবার সময় গোখুরা সাপে কামড়ায়। সেখানে একজন ইংরেজ সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন,—তিনি সংবাদ পাইবামাত্রই রোগীর নিকটস্থ হইয়া ক্ষতস্থান কাটিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে সাপে কামড়ানর যত প্রকার ঔষধ ও প্রক্রিয়া আছে, তাহা করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিলেন না,—কিন্তু রোগী বাঁচিল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। তখন ডাক্তারসাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

একজন নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল,—"এখনও যদি পঞ্চু কামারকে ডাকা হয়, সে বাঁচাইয়া দিতে পারে।"

তচ্ছ্রবণে ডাক্তার সাহেব চটিয়া উঠিলেন,—মরামানুষ কেহ নাকি বাঁচাইতে পারে! ভারত কুসংস্কারের জন্মভূমি! মন্ত্রে নাকি বিষ যায়!

যে কথা বলিয়াছিল, অন্যান্য দুই একজন দর্শক তাহার পক্ষ সমর্থন করিল। তখন যে মরিয়াছে, তাহার আত্মীয় ডাক্তার সাহেবের অনুমতি চাহিল,—এবং পঞ্চুকে ডাকানর জন্য জিদ করিল। ডাক্তারসাহেব অনুমতি দিলেন,—কিন্তু লোকগুলার কুসংস্কার দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন,—এবং স্পষ্টতররূপে বলিলেন যে, "তোমরা নিতান্ত কুসংস্কারের দাস,—তাই মন্ত্রের দ্বারা মরামানুষ বাঁচাইতে চাও।"

যে কথা বলিয়াছিল, সে বলিল,—"মহাশয়! রোগে যে ব্যক্তি মরে, তাহাকে কেহ বাঁচাইতে পারে না। কিন্তু সাপের বিষে মানুষ মরিয়াও মরে না,—তাহাকে বিষে কেবল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বিষ দূর করিতে পারিলে, এখনও বাঁচিবে। পঞ্চু কামার এ বিষয়ে ওস্তাদ্!"

এদিকে যে পঞ্চুকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে পঞ্চুকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

পঞ্চু সত্তর আঠার বৎসরের বালক। ডাক্তার সাহেব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"রোগীকে বাঁচাইতে পারিবে ?"

পঞ্চু বলিল,—"তা পারি, কিন্তু বড়ই পরিশ্রম করিতে হইবে।"

সাহেব ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন,—"যদি একটা মানুষ বাঁচে, তোমার একটু পরিশ্রমে আর কি হইবে ?"

পঞ্চু তখন রোগী বাঁচাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সে রোগীর শিয়র-দেশে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল,—"তোমরা রোগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিও,—আমি নদীতে নামিব; রোগী যেন উঠিয়া না পালায়।"

সাহেব হাসিয়া আকুল! অন্যান্য লোক,—যাহারা পঞ্চুর মন্ত্রে বিশ্বাস করিত, তাহারা বলিল,—"হাঁ, আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিব।"

পঞ্চু মন্ত্র পড়িতে পড়িতে গিয়া জলে নামিল। সে মন্ত্র পড়ে, আর জলে ডুব দেয়। এইরূপ প্রকারে প্রায় তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া পঞ্চু ভিজা কাপড়ে চোখ, মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, রোগীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীও নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের ন্যায় সকলের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল।

সাহেব দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং কোন্ শক্তিতে মরা-মানুষ বাঁচিয়া উঠিল, জানিবার জন্য—মীমাংসা-জন্য পশ্চিমের দুইখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রাগুক্ত ঘটনার আমূল লিখিয়া পাঠাইলেন। তার-পর ঘটনাটি দেশীয়, ইংরেজী, বাঙ্গালা সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহা বোধ হয়, তোমার স্মরণ আছে ?

শিষ্য। হাঁ, তাহা স্মরণ আছে। কিন্তু কোন্ শক্তির বলে সর্পদষ্ট

মৃত ব্যক্তি জীবন প্রাপ্ত হইল, সাহেবের ঐ ঘটনা পাঠ করিয়া তাহার উত্তর কেহ কি দিতে পারিয়াছিলেন ?

গুরু। কে দিবে ? যাঁহারা জড় বিজ্ঞানবাদী, তাঁহারা মন্ত্রশক্তির মহত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম,—তাঁহারা ইহার কি উত্তর দিবেন ? আর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদীরা যাহা বলিলেন, তাহা তোমাকে অগ্রে বলিয়াছি, অতএব —নূতন উত্তর আর ইহার কি আছে ? সাহেব বোধ হয়, এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট নাও হইতে পারিতেন।

ফল কথা, মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, মন্ত্র যে অক্ষরে যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তাহা সেইরূপেই উচ্চারণ করিতে হইবে। আর তাহার সুর, শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রার্থনার উত্তর।

শিষ্য। দেবতার নিকটে কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে, তাহার উত্তর পাওয়া যায়,—একথা কতদূর সত্য ?

গুরু। ইহা নিশ্চয় সত্য,—ইহাকে দৈববাণী বলা হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, দেবতা সূক্ষ্মাদৃষ্ট শক্তি,—তবে তাঁহারা কি প্রকারে আমাদের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন ?

গুরু। তাঁহাদের যে ভাব আমরা জানিতে পারি, তাহাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর।

শিষ্য। কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমাদের চিন্তা হইতে দেবতার কথা আমরা বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকি। তাঁহারা আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়া থাকেন। কথা কহিবার শক্তি সকলেরই আছে,—নাদময় জগৎ, তবে সকলের কথা বুঝা যায় না, এই যা গোলযোগ। দেবতারা কি করিয়া কথা কহেন, কি করিয়া আমাদিগের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা বুঝাইবার পক্ষে বড় বিশেষ সুবিধা নাই। তবে একেবারেই যে নাই, তাহাও নহে।

শিষ্য। আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনই আমাদের মস্তিষ্ককোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে; এবং সম্ভবতঃ সেই পরিবর্ত্তন বশতঃ ইথর-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের ঐ চিন্তা যদি সম্পূর্ণভাবে একমুখী হয়, তবে ঐ ইথর-তরঙ্গ চারিদিকে প্রসারিত না হইয়া একদিকেই ধাবিত হয়,—এবং তাহা হইলে সেই চিন্তা অপরের চিন্তা-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে।

ইথর-তরঙ্গ সকলের মস্তিষ্কেই অল্পাধিক পরিমাণে আঘাত করে বটে, কিন্তু সকলে তাহার সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না। একজন চিন্তা-গ্রাহী (thantreabr)অনায়াসে তাহা অনুভব করিতে পারে; অর্থাৎ চিন্তাকে যে ব্যক্তি একমুখী করিতে পারিয়াছে, এইরূপ শিক্ষিত ও অভ্যস্ত মস্তিষ্কে কেবল তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে, এই দাঁড়ায় যে, কেবল শিক্ষিত মস্তিষ্কের অধিকারীই চিন্তাকারীর মনের ভাব জানিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে পারে।

সময়ে সময়ে অশিক্ষিত মস্তিষ্কও এই তরঙ্গ ধরিতে পারে, যেমন বিদেশগত আত্মীয়ের বিপদবার্ত্তা অনেক সময়ে তদাত্মীয়গণ গৃহে থাকিয়া জানিতে পারেন।

আমার পাঠ্যাবস্থার একটি ঘটনা তোমাকে এস্থলে বলিব। আমরা কলিকাতায় একটী মেসে একত্রে অনেকগুলি ছাত্র থাকিতাম। সেবার কলিকাতায় বসন্তরোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব। ঝাউগাছি নিবাসী অনুকূল বাবু নামক একটি ছাত্রও আমাদের মেসে থাকিতেন,—হঠাৎ তিনি বসন্তে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ভারি জ্বর—একদিনকার জ্বরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবস্থা দেখিয়া আমরা সেইদিন রাত্রেই একজন সুচিকিৎসক আনয়ন করি,—এবং যথোপযুক্তভাবে তাঁহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করি। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের নাম আমরা কেহই জানিতাম না। একেত মেসের হিসাবে সেটা জানা অসম্ভব—তাহার উপরে, তিনি কয়েকদিন মাত্র আমাদের মেসে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা অত্যন্ত গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম;—কারণ ডাক্তারবাবু ব'লিয়া গেলেন, জ্বর যেরূপ তীব্র—তাহাতে বসন্ত হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে; কিন্তু এত জ্বরের পরে যে বসন্ত হইবে, তাহা খুব প্রবলভাবেই আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই।

বাসাশুদ্ধ সকলেই ভাবিয়া আকুল হইলাম,—অনুকূল বাবু অজ্ঞান; কি প্রকারে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নাম অবগত হইতে পারি;—কি প্রকারে তাঁহাদিগকে এই বিপদের কথা জানাইতে পারি!

কিন্তু চিন্তাই সার হইল, উপায় কিছুই করা গেল না। তৎপর দিবসও অনুকূল অজ্ঞান,—জ্বরও খুব তীব্র।

আমাদের সকলেরই বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইল। অনুকূল বাবুকে লইয়াই থাকিলাম। সকলেরই চিন্তা, কি প্রকারে অনুকূল বাবুর পিতা

বা আত্মীয় স্বজনের সন্ধান হইতে পারে, কি প্রকারে তাঁহাদের নিকটে এই বিপদের বার্ত্তা পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সেদিন ঐ প্রকারেই কাটিয়া গেল। তৎপরদিবস অনুকূলের সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত বাহির হইয়া পড়িল,—তিল রাখিবার জায়গা নাই—সর্ব্বাঙ্গে, নাকে চোখে মুখে বসন্ত বাহির হইয়া পড়িল। ডাক্তার আমাদিগকে রোগীর নিকটে যাইতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন,—এবং একজন স্ত্রীলোককে উহার সেবার জন্য নিযুক্ত করা হইল।

বৈকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে, আমরা ছাদের উপরে দ্বিতীয় পার্লামেণ্টের অধিবেশন করিয়া, এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহারই পরামর্শ করিতে বসিয়া গিয়াছিলাম,—কেবল হরিপদ নামক একটি ছাত্র, দ্বিতলে ছিলেন, তাঁহাকে ডাকায় তিনি একটু বিলম্বে আসিবেন, বলিয়া অভিমত জানান।

আমরা সকলেই চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে মীমাংসাশূন্য প্রশ্নের পর প্রশ্নের অবতারণা ও শূন্যে বিলীন করিয়া দিয়া ভাবিতেছি,—এমন সময় হরিপদ হাসিতে হাসিতে উপরে আগমন করিলেন।

হরিবাবুর হাসি সাধা-হাসি,—সুখে দুঃখে, ভয়ে ক্রোধে, মানে অপমানে হাসি তাঁহাকে কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করে না।

অন্যান্য ছাত্রাপেক্ষা হরিবাবুর আরও একটু প্রভেদ এই যে, তিনি ছাই ভস্ম খুঁটি নাটি যাহাই পুস্তকে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটু তথ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই খাটাইতে বসিতেন। এই সময় "মানসিক বার্ত্তা বিজ্ঞান" লইয়া একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, কর্ণেল আলকট্ তখন কলিকাতায় ভারি পসার করিয়া গিয়াছেন;—হরিবাবু সে তত্ত্বেরও আলোচনা ও সাধনায় সমধিক পরিশ্রম করিতেছিলেন,—তাঁহার হাসি

দেখিয়াই আমরা বুঝিলাম, তাঁহার নবালোচিত বিজ্ঞানের একটা কি বিদ্যা হাজির করিবেন, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাসি কেন? কোন সমাচার আছে না কি?

হরিবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মথি লিখিত সুসমাচার নহে। আমার নবালোচিত বিজ্ঞান-বিদ্যার একটা সুসমাচার।"

আমি। সেটা কি?

হরিবাবু। অনুকূল বাবুর পিতা, মাতা ও একজন ভৃত্য আসিতেছে।

সকলেই অকূলে কূল প্রাপ্তির উত্তেজনায় উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলাম,— "কে বলিল হরিবাবু? এ সংবাদ কে দিলে হরিবাবু?

"না, না,—কেহ এ সংবাদ দেয় নাই। কেই বা দিবে? আমরা অনুকূল বাবুর আত্মীয় বলিয়া কাহাকেই বা চিনি?"

আমি বুঝিলাম, তাঁহার অনুষ্ঠিত তত্ত্বের একটা খাটান বুজ্‌রুকী—বা বাতিকের কথা লইয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মানসিক বার্ত্তাবহ বিজ্ঞান-বিদ্যায় ইহা জানিতে পারিয়াছ নাকি?"

হরি। হাঁ, তাহাই।

আমাদের মধ্য হইতে শ্যামাচরণ বলিল,—"মানসিক বার্ত্তাবহের প্রভাবে গৃহিণীর খবর জানিয়া মনে মনে আনন্দিত থাকিয়া বিদেশে দিন কাটান ভাল, কিন্তু এ বিপদ কাটান তাহার কর্ম্ম নহে।"

হরি। না হে,—আমার কথা তোমরা বিশ্বাস কর।

আমি। কি বিশ্বাস করিব?

হরি। অনুকূল বাবুর পিতা, মাতা ও বাড়ীর একটি ভৃত্য আসিতেছে।

আমি। কখন আসিবে?

হরি। সন্ধ্যার মধ্যে।

আমি। বোধ হয় ছটায় যে ট্রেণ শেয়ালদহে আইসে,—সেই ট্রেণে?

হরি। তা হইতে পারে।

আমি। তোমার ও বার্ত্তিক-সংবাদে নিশ্চিন্ত হওয়া দায়। আমরা ভাবিতেছি, সন্ধ্যা সাড়েসাতটার গাড়ীতে একজন ঝাউগাছি যাই,—গ্রামে গেলে অবশ্যই অনুকুলবাবুর বাড়ীর, তথা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান হইতে পারিবে।

হরি। আর যাইতে হইবে না,—তার আগেই তাঁহারা আসিয়া পঁহুছিবেন।

আমাদের বন্দোবস্তের কোন ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই জানিয়া, আমরা তখন বিষয়ান্তরে গল্পে মনঃসংযোগ করিলাম। একটু পরেই ঝি তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া বলিল,—"একখানা গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। অনুকুল বাবু এই বাসায় থাকেন কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তারমধ্যে একজন মেয়েমানুষও আছে।

হরিবাবু লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ঐ—ঐ তাঁরা এসেছেন।"

আমরা সকলেই নামিয়া গেলাম। দরজায় গিয়া জানিলাম, যথার্থই অনুকুলবাবুর পিতা ও মাতা আসিয়াছেন, সঙ্গে একটি ভৃত্যও আছে।

আমাদিগকে দেখিয়াই অনুকুলের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাড়ীতে অনুকুল মুখুয্যে থাকে?"

হরিবাবুই উৎসাহী। হরিবাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে থাকে।"

তিনি বলিলেন,—"সে কেমন আছে?"

হরি। ভাল নহে, তাঁহার বসন্ত হইয়াছে। তবে ডাক্তার বলিয়াছেন, কোন ভয় নাই।

অনুকূলবাবুর পিতা বলিলেন,—"আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন, থাকিবার উপায় কি ?"

আমরা বলিলাম, "বাটীর মধ্যে আসুন, আমরা একটা ঘর আপনা-দিগের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তাঁহারা ভিতরে আসিলেন। সন্ধ্যার পরে হরিবাবুর মানসিক বার্ত্তাবহ-বিদ্যার পরীক্ষা করিবার জন্য অনুকূলবাবুর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি অনুকূলবাবুর সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?"

তিনি বলিলেন,—"না, কোন সংবাদই পাই নাই। তবে গত কল্য আমি এবং অনুকূলের মাতাঠাকুরাণী যেন মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইতে লাগিলাম, কে করুণ-কণ্ঠে যেন বলিতেছে, "তোমাদের অনুকূলের বড় ব্যারাম। তার বসন্ত হইয়াছে, তোমরা এস।"

"অনুকূলের মাতাও আমাকে এ কথা বলিলেন, আমিও তাঁহাকে বলিলাম,—তখন মন বড় খারাপ হইল। তাই চলিয়া আসিয়াছি।"

হরিবাবু নিকটে ছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"আমিই আপনাদিগকে সে সংবাদ দিতেছিলাম।"

আমরা সকলেই হরিবাবুর কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আমাদের বাসাস্থ সকলেই সেই মানসিক বার্ত্তাবহ-বিজ্ঞানের আলোচনা ও সাধনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, হরিবাবুই সকলের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুকূলবাবুর পিতা মাতা যে সহজেই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, সন্তানের মঙ্গল-কামনায় পিতামাতার চিন্তা-তরঙ্গ সদাই ঈপ্সিত থাকে, অর্থাৎ সন্তানের বিপদাশঙ্কায় জনক জননীর মস্তিষ্ক নিরতিশয় অনুভব-

প্রখর (Sensitive) হইয়া তরঙ্গাভিঘাত গ্রহণের পক্ষে অসাধারণরূপে অনুকূল অবস্থাপন্ন থাকে।

ফলতঃ হরিবাবুর কথা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিতে পারে বা ঘটিতেছে।

যেমন আলোর ইথর-তরঙ্গ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, উত্তাপের ইথর-তরঙ্গ যেমন ত্বক্ বা তাপমান যন্ত্রের দ্বারা অনুভব করিতে হয়, সেইরূপ এই চিন্তার তরঙ্গ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্কদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।

আমরা সর্ব্বদাই কোন না কোন বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি। সেই জন্য এই চিন্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রসারিত ও প্রতিহত হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন জড়-বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার সুযোগ হয় নাই। ফটোগ্রাফের প্লেটে ইহার দাগ পড়ে না ; আলো, উত্তাপ, চুম্বক ও বিদ্যুতের উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু একজনের মস্তিষ্ক-সঞ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তিষ্কে নিপতিত হইলে এবং সেই সময়ে শেষোক্তের মস্তিষ্ক অনুকূলঅবস্থাপন্ন (যেমন hyhnotiad) থাকিলে প্রথমের চিন্তা দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কলের পুতুলের ন্যায় অবলীলাক্রমে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা ফ্রান্সের মত সভ্য দেশের ধর্ম্মাধিকরণেও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই চিন্তা-তরঙ্গের আর একটি ফল এই যে, আমাদের সহচর বন্ধুগণ সচ্চিন্তা করিলে, আমরাও অল্পাধিক পরিমাণে সেই চিন্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি। সেই জন্যই সৎসঙ্গে থাকিলে সৎ ও অসৎসঙ্গে থাকিলে অসৎ হওয়ার কথাটা নিতান্ত উপবচন নহে।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যখন চিন্তাদ্বারা মস্তিষ্কের পদার্থের মধ্যে

রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, তখন মস্তিষ্কের বাহিরে অনন্তকোটী পদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থের উপর সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন যে হয় না, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না, তাহাতে অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখা যায় না। মেরুজ্যোতি (Aurora borealis) বিকাশ পাইলে সহস্র মাইল দূরস্থিত দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হয়, এবং কোটীযোজন দূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়,—ইহাত পরীক্ষিত সত্য। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমাদের চিন্তা-তরঙ্গইবা আমাদের অভীপ্সিত দেবতার সমীপে লইয়া গিয়া প্রার্থনার উত্তর আনয়ন না করিতে পারিবে কেন?

আমি তোমাকে যে হিপনটিস্‌তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলাম * তাহার পরীক্ষায় তুমি বোধ হয়, অবগত হইতে পারিয়াছ যে, একজনের চিন্তা-শক্তিতে অভিভূত হইয়া অন্যে তাহার প্রার্থনার উত্তর দিয়া থাকে। তোমাদের জড় বিজ্ঞানেও ইহার প্রমাণ আছে,—একখণ্ড লৌহকে তামার তারের মধ্যে রাখিয়া সেই তারের দুই মুখ একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে লৌহখণ্ডটির মধ্যে এক নূতনশক্তি সঞ্জাত হইয়া, উহাকে চুম্বকলৌহে পরিণত করে। গৃহের মধ্যে কোথায় একটি ব্যাটারি চালাইয়া দিলে, সেই গৃহস্থিত যাবতীয় চুম্বক-শলাকা তাহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে। সেইরূপ হইতে পারে এই জন্য যে, আমাদের মস্তিষ্কে কোন একটি অজ্ঞাতপদার্থের অস্তিত্ব বশতঃ সেই চিন্তা অপরের মস্তিষ্কেও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই পদার্থ মহাব্যোম বা তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ইথর বা অন্য নামধেয় কিছু হইতে পারে। ফলতঃ নামে কিছুই আসিয়া যায়না,—আসল একটা এমন

* মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" দেখ।

পদার্থ আছে যে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রার্থনার উত্তর পাওয়া এই চিন্তা-প্রক্রিয়ারই কার্য্য।

শিষ্য। চিন্তা করিলে, সকলেই দেবতার নিকট হইতে প্রার্থনার উত্তর পাইতে পারে?

গুরু। নিশ্চয় পারে।

শিষ্য। তবে আমরা পাইনা কেন?

গুরু। আমরা চিন্তা করিতে জানিনা বলিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনার উত্তর পাই না।

শিষ্য। চিন্তার আবার কোনপ্রকার প্রণালী আছে নাকি?

গুরু। যাহাকে তীব্র বা গাঢ় চিন্তা বলে,—চিত্তের তন্ময়ত্ব ভাব বা অবিচ্ছিন্ন একমুখী চিন্তা করিতে শিক্ষা করিলে, দেবতার নিকট হইতে প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিপনটিস্ করিতে হইলেও এই একাগ্রতার প্রয়োজন।

শিষ্য। উহা কি প্রকারে অভ্যাস করিতে হয়?

গুরু। আমাদের প্রচলিত পূজা আরাধনা ও সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতিতে।

শিষ্য। আমায় তাহা শিক্ষা দেন।

গুরু। আরও একটু অপেক্ষা কর। এখনও তোমার পূর্ব্বকার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয় নাই। তুমি দেবতাগণের পরিচয় বা আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখনও তাহা বলা হয় নাই,—আগে তাহা বলিয়া, পশ্চাৎ আরাধনার কথা বলিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্র ও অহল্যাহরণ।

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া তবে আগে দেবতা-তত্ত্বই বুঝাইয়া দিন।

গুরু। এক একটি করিয়া দেবতার পরিচয় লইয়া আমরা আলোচনা করিব,—অবশ্য একেবারে একসঙ্গে সকল দেবতার আলোচনা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। দেবতা কোন্ পদার্থ, কি শক্তি, কি তত্ত্ব, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের তত্ত্ব জানাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুমি একটি দেবতার নাম কর।

শিষ্য। সর্ব্বাগ্রে স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের নামই মনে আইসে। কারণ, তিনি দেবতাদিগের রাজা,—আবার তাঁহার জীবন মানুষদিগেরও অননুকরণীয় রহস্যে পূর্ণ; তাঁহারই কথা সর্ব্বাগ্রে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাঁহার জীবনী এমনি ক ঘৃণ্য রহস্যে পূর্ণ যে, তাহা মনুষ্য-দিগেরও অননুকরণীয়।

শিষ্য। সে কথা আপনার নিকটে পুনরুল্লেখ করাই ধৃষ্টতা। ইন্দ্রে এমন দোষ নাই, যাহার অতীত আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রথমে, ইন্দ্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন। দ্বিতীয় জ্ঞান-গুরু বৃহস্পতির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। তারপর উপদেষ্টা হিতকারী ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে বধ করেন,—তদনন্তর নিজ রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য—নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য দধীচিমুনির জীবননাশক হয়েন। আর আমাদেরই দেশের নিতান্তবিলাসী রাজগণের মত বেশ্যার নাচ, ফুলের মধু, মলয়ের বাতাস, সোমরস পান ইহাই তাঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। এই সকল পাঠ করিয়াই বিধর্ম্মীগণ আমাদের দেবতাগণ সম্বন্ধে শ্লেষাদি করিয়া থাকেন।

গুরু। বিদেশীয়গণ, তথা বিদেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন তোমরা কখনও শাস্ত্রের আলোচনা কর না, শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পার না;—কাজেই দেবতার ঐরূপ দূষণীয় ভাবই দেখিয়া থাক।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই তিনটি অবস্থা আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। কারণ রাজ্যের ইন্দ্র,—স্থূলরাজ্যে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভাবান্তরিত,—তাই তিনি রাজা। শ্রুতিতে, ইন্দ্রদেব ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহের ভোগকর্ত্তা জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। দেহরূপ স্বর্গরাজ্যের রাজা জীবাত্মা বা ইন্দ্র; আর সংসারের অজ্ঞান ও আসক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহকে দৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইন্দ্রের অর্থাৎ জীবাত্মার প্রথম দৃষ্টি পড়িল, কামিনী-যৌবন-সৌন্দর্য্যের উপর। জ্ঞানাদি বিদূরিত হইল,—গুরুপত্নী বলিয়াও ভয় হইল না! সৌন্দর্য্যের মোহে, কামিনী-কাম-ঘোরে জীবের তাহা থাকে না—তারপরে জীবাত্মার সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন বিশেষে

ঘিরিয়া গেল,—ভাবার্থ এই যে, তখন সর্ব্বাঙ্গে সেই ভোগের অনুতাপ,—অহল্যা পাষাণী হইল। কামিনীর কামদেহের পরিবর্ত্তন এমনি করিয়াই ঘটিয়া থাকে। তখন জীবাত্মা বুঝিতে পারিল, কি কুকার্য্য করিয়াছি। অনুতাপে আত্মানুশোচনায় কদর্য্যচিহ্ন চক্ষুতে পরিণত হইল,—যেমন সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা জ্বলিয়াছিল, জ্বালাগুলা সব চক্ষুরূপে পরিণত হইল—সে কাজে যে কত অনিষ্ট, প্রতিঅঙ্গে তাহা দেখিবার ক্ষমতা থাকিল।

তারপরে, ইন্দ্র অর্থাৎ জীবাত্মা ভোগে উন্মত্ত হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞান গুরু প্রভৃতিকে অবহেলা করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উঠিলেন,—অহঙ্কারের প্রভাবই এইরূপ। জ্ঞানমার্গকে অহঙ্কারে জীবাত্মা দূরে সরাইয়া ক্রিয়া-ভোগে মজিয়া পড়ে, ইহা সর্ব্বত্র। যখনই অহঙ্কারে মত্ত হইলেন, অমনি অসুররূপী আসক্তি বৃত্তিসমুদয় আত্মাতে (ইন্দ্রকে) অধীন করিয়া তাহার স্বাধীন স্বর্গের শ্রী হরণ করিয়া বসিল।

জীবাত্মা নিরুপায়। অহঙ্কারে উন্মত্ত হওয়ায় বৃহস্পতিরূপী বিজ্ঞান-শক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন,—বৃত্র নামক মহাসুর তাঁহাকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল। স্বর্গ অর্থে আনন্দ। তখন ইন্দ্র, কিসে আপন অধিকার লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,—বিবেক তাঁহার মর্ম্মদংশন করিতে লাগিল, এই বিবেকই পুরাণের বিশ্বরূপ।

ইন্দ্র নিরুপায় হইয়া বিশ্বরূপের শরণাগত হইলে, বিশ্বরূপ নারায়ণ-বর্ম্ম নামক কবচ প্রদান করতঃ ইন্দ্র বা জীবাত্মাকে মায়া হইতে বিমুক্ত রাখিতে উপায় স্থির করিলেন। প্রকৃত যুদ্ধে যেমন অভেদ্য কবচের দ্বারা বা লৌহবর্ম্মের দ্বারা তীক্ষ্ণশরাদির আঘাত হইতে অঙ্গকে রক্ষা করা যায়, তেমনি নারায়ণ-কবচ দ্বারা আত্মা অধর্ম্মের বা আসক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

শিষ্য। সেই নারায়ণ-বর্ম্ম কি প্রকার,—তাহার উল্লেখ শাস্ত্রে আছে কি ?

গুরু। হাঁ, আছে।

শিষ্য। কোন্ গ্রন্থে আছে ?

গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতে।

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানটি আমাকে শুনাইয়া দিন।

গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের সপ্তম হইতে অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয়টির বর্ণনা আছে। আমি তোমাকে তাহা শ্রবণ করাইতেছি,—

"দুর্দ্দান্ত অসুরগণ দেবরাজের এই অসুস্থাবস্থা শ্রবণ করিবামাত্রই শুক্রের আদেশ ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের তীক্ষ্ণবাণ প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে দীর্ঘবাহু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া অবনত মুখে তাঁহার শরণ লইলেন। জন্মরহিত ভগবান্ আত্মযোনি তাঁহাদিগের এইরূপ পীড়িতাবস্থা দর্শন করতঃ দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং কহিলেন—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সাতিশয় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ। আহা! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সংবর্দ্ধনা কর নাই! অসুরেরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া আপনা আপনিই নষ্ট হইতেছিল, সুতরাং তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল ছিল, তোমরা তাহাদিগের অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও যে এক্ষণে তাহাদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইলে, নিশ্চয় জানিবে, তাহা এই অন্যায় কর্ম্মের ফল। ইন্দ্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, গুরু শুক্রাচার্য্যের অবমাননা করিয়া দেবশত্রু অসুরগণের বলক্ষয় হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই গুরুকে পূজা করিয়া আবার সেই বল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। শুক্রাচার্য্যকে গুরু পাইয়া তাহারা

আমার আলয় পর্য্যন্ত অধিকার করিল। শুক্রের শিষ্য হইয়া তাহারা যে মন্ত্র লাভ করিয়াছে, তাহা কুত্রাপিই প্রতিহত হইবার নহে। অতএব তাহারা কি ত্রিলোককেও গ্রাহ্য করে? গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবিন্দ যে নরেশ্বরদিগকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের কোথাও অমঙ্গল হয় না। অতএব, তোমরা শীঘ্র গিয়া ত্বষ্টার পুত্র আত্মতত্ত্ববেত্তা, তপস্বী, ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে ভজনা কর। অসুরগণের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে; যদি তাহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া তোমরা তাঁহার পূজা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের কার্য্য সাধন করিবেন।

* * ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবতাদিগের মনোব্যথা দূর হইল। তাঁহারা ত্বষ্টৃ-তনয় বিশ্বরূপের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—আমরা তোমার আশ্রমে অতিথি আসিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। বৎস! তোমার পিতৃগণের এক্ষণে যে বাঞ্ছা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ না হইলে নয়। অতএব, তুমি তাহা সম্পাদন কর। ব্রহ্মন্! যে সকল সচ্চরিত্র পুত্রের নিজের পুত্র হইয়াছে, পিতৃশুশ্রূষা করা তাঁহাদিগেরও পরম ধর্ম্ম; সে সকল পুত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, (সুতরাং যাহাদিগের পুত্র হয় নাই।) তাঁহারা যে পিতার সেবা করিবেন, তাহা আর বলিতে হয় না! আচার্য্য * ব্রহ্মার; পিতা প্রজাপতির;—ভ্রাতা মরুৎপতির; মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর, ভগিনী দয়ার; অতিথি স্বয়ং ধর্ম্মের; অভ্যাগত ব্যক্তি অগ্নির; এবং সর্ব্বপ্রাণী নিজের মূর্ত্তি। অতএব, বৎস! তোমার পিতৃগণ শত্রু হইতে পরাভব-প্রাপ্তি রূপ যে মনোব্যথা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি তপস্যা দ্বারা তাহা দূর করিয়া, তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ও গুরু, আমরা তোমাকে উপাধ্যায় স্বরূপে বরণ করিলাম। আমাদিগের

* যিনি উপনয়ন দিয়া গায়ত্রী দান করেন।

অভিপ্রায় এই যে, তোমার তেজোদ্বারা সহসা শক্রজয় করিতে পারিব। প্রয়োজন হইলে, কনিষ্ঠের পাদবন্দন করিতে নিন্দা নাই। কেবল বয়ঃক্রমই জ্যেষ্ঠতার কারণ নহে; বেদজ্ঞানও তাহার একটি কারণ।

দেবগণ পুরোহিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর, মহাতপা বিশ্বরূপ প্রসন্ন হইয়া স্নিগ্ধবাক্যে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন, এবং সাতিশয় উৎসাহ-সহকারে তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণের যে লক্ষ্মী শুক্রের বিদ্যাবলে রক্ষিত হইয়াছিলেন, ক্ষমতাশালী ত্বষ্টৃনন্দন বৈষ্ণব-বিদ্যাদ্বারা তাঁহাকেও হরণ করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিলেন! যে বিদ্যাদ্বারা রক্ষিত হইয়া ইন্দ্র অসুর সেনা জয় করিয়াছিলেন, উদারবুদ্ধি বিশ্বরূপ তাঁহাকে সেই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিলেন।

অবিদ্যাবৃত্তিরূপী অসুরগণের আসক্তি ও মোহাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত হইতে স্থূলদেহকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্ররূপী জীবাত্মা ভগবৎপরায়ণতা-রূপী বিবেকের নিকট উদ্বোধিত হইয়া কর্ম্মময় বিশ্বরূপের নিকট মন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রের নারায়ণ-কবচ।

শিষ্য। ইন্দ্র যে নারায়ণকবচের দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া অবিদ্যাবৃত্তি বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলুন।

গুরু। ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া ইন্দ্রের জিজ্ঞাসাক্রমে যে ভাবে নারায়ণ নামক বর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম অধ্যায় হইতে বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইন্দ্রের জিজ্ঞাসামতে বিশ্বরূপ বলিলেন,—

"যে ব্যক্তি নারায়ণ-কবচ ধারণ করিবেন তাঁহাকে প্রাতে উত্থান করিয়া স্নানাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে হইবে। পরে মন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে কর-চরণ প্রক্ষালন করতঃ উত্তরমুখী হইয়া আচমন করিতে হইবে। তৎপরে অপর কথোপকথনাদি হইতে সাবধান হইয়া অতি পবিত্রভাবে সে আপনার দ্বাদশাক্ষরী বিষ্ণুমন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।

হে ইন্দ্র! এই নিয়মে নারায়ণ-কবচ ধারণ করিলে, উপস্থিত যত কিছু ভয় থাকে, সেই সকল হইতে জীব মুক্ত হইয়া থাকে।

প্রথমে যুগল পদ, পরে ক্রমে ক্রমে যুগল জানু, যুগল উরু, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল, শিরোদেশ—এই অষ্টাঙ্গে একবার শির হইতে ক্রমে পদতল পর্য্যন্ত ওঁকার ন্যাস করিবে, পুনরায় পদতল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গে ঐ ওঁকার ন্যাস করিবে।

অনন্তর ঐ অষ্টাঙ্গে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র দ্বারা একবার সংহার ন্যাস ও একবার উৎপত্তি ন্যাস করিবে। তৎপরে করন্যাস আবশ্যক। দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্রের দ্বারা প্রণব হইতে য়-কার পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষরকে প্রণব-পুটিত করিয়া দক্ষিণ করের তর্জ্জনী হইতে বাম করের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। তাহাতে শেষ যে চারিটি অক্ষর থাকিবে, তাহাদের উভয় হস্তের উভয় অঙ্গুষ্ঠে আদি ও অন্ত পর্ব্বে ন্যাস করিবে।

তদনন্তর মর্ম্মস্থানসমূহে ন্যাস করিবে।—যথা,—

"ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা প্রতি মর্ম্মস্থানে ন্যাস করিবে। হৃদয়ে ওঁকার ন্যাস করিবে। ভ্রূ যুগলে ষ কার, এবং ণ কারকে শিখাস্থলে ন্যাস করিবে। উভয় নেত্রযুগলে ব কার ন্যাস করিবে। ন কারকে অঙ্গের সকল সন্ধিস্থলে ন্যাস করিবে। পরে মন্ত্রের যে উচ্চারণ হইবে,

তাহা চতুর্দ্দিকে উচ্চারণ করিবে। পরে মকার উচ্চারণ করিতে করিতে আপনাকে যেন সেই বিষ্ণুমন্ত্র-মূর্ত্তিময় দেখিবে।

মন্ত্র মূর্ত্তিময় হইয়া আপনাকে বিষ্ণুময় ভাবনা করিবে। সেই ভাবনাতে ধ্যেয় বস্তু যে ভগবান্,—তাঁহাকে জ্ঞান, বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্যাদি ছয় শক্তিমান্, এবং বিদ্যা, তেজ ও তপস্যাদি মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্ বলিয়া স্থির করিয়া এই বক্ষ্যমান্ মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয় ভগবানের ধ্যানাত্মক যে, নারায়ণের কবচ তাহা এই,—

ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্ব্বরক্ষাং,
ন্যস্তাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে।
দরারি-চর্ম্মাসি-গদেষু-চাপ-
পাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ॥

ইহার অর্থ এই,—হরি পতগেন্দ্র গরুড়ের স্কন্ধদেশে পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া আছেন; যাঁহার অষ্টবাহু; যিনি সেই অষ্টবাহুতে শঙ্খ, চক্র, চর্ম্ম, অসি, গদা, ধনুঃ, বাণ ও পাশ ধারণ করিতেছেন, এবং যিনি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন; সেই হরি আমাকে রক্ষা করুন।

অনন্তর প্রার্থনা করিবে,—

হে ঈশ্বর! জলে বরুণদেবের পাশভয় আছে এবং ভীষণ যাদোগণ আছে, তাহাদের হইতে আপনি মৎস্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। স্থলে বহু বিঘ্ন আছে, অতএব মায়াশ্রয়ে আপনি যে বামন নামে ব্রাহ্মণকুমার হইয়াছিলেন, সেই রূপ দ্বারা তথায় আমাকে রক্ষা করুন। হে শিবরূপ! আপনি যে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে ত্রিলোক অধিকার করিয়া আছেন, তদ্দ্বারা আকাশস্থ দৈব বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

যে প্রভু নৃসিংহরূপে অসুরপতিগণের মহাশত্রু হইয়াছেন, যাঁহার ঘোর অট্টহাসে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত হইলে ভয়ে অসুরনারী-গণের গর্ভপাত হইয়াছিল,—সেই প্রভু আমাকে যেন দুর্গমধ্যে ও রণাঙ্গনে ও বনাঙ্গনে রক্ষা করেন।

যে প্রভু যজ্ঞময়ী মূর্ত্তিতে বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ধরাকে নিজ দংষ্ট্রায় ধারণপূর্ব্বক রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি যেন আমাকে গমনকালে পথস্থ বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

যিনি ভরতাগ্রজরূপে লক্ষ্মণ সহোদরের সহিত অরণ্যে অরণ্যে বিহার করিয়াছিলেন; সেই রামচন্দ্র নামধারী ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে প্রবাস হইতে রক্ষা করুন। যিনি জমদগ্নিনন্দন মহাবীর্য্যবান্ পরশুরামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্ষিতিতলে মহাবীর্য্য প্রকাশ করেন, সেই ভগবান্ আমাকে গিরিভূধর হইতে রক্ষা করুন।

যিনি নারায়ণ মূর্ত্তিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের উদ্ধার করিয়া-ছিলেন, তিনি যেন আমাকে ব্যাভিচারী ধর্ম্মপথ হইতে ও ভ্রম হইতে রক্ষা করেন। যিনি নররূপে অবতীর্ণ হইয়া মায়াগর্ব্ব নাশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন সংসার-গর্ব্ব হইতে আমাদের রক্ষা করেন। যিনি দত্তাত্রেয় মূর্ত্তিতে যোগপথের সংস্কার করিয়াছিলেন, তিনি যেন আমাদের যোগ-সাধনের সকল দোষ হইতে রক্ষা করেন। যিনি কপিল মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া মুক্তিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ আমাকে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে উদ্ধার করুন।

যিনি সনৎসনাতনরূপে অসঙ্গভাবের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সকল কামনা হইতে রক্ষা করুন। যিনি হয়শীর্ষরূপে ভক্তিপথ বিস্তার করিয়াছেন, আমি যদি পথমাঝে ভ্রমবশে কখনও কোন দেবমূর্ত্তিকে অবহেলন জন্য অপরাধী হইয়া থাকি, সেই ভগবান্ যেন আমার এই

অপরাধ ক্ষমা করেন। যদি আমি বিষ্ণুপূজা করিতে কোন প্রকার অঙ্গহীন করিয়া শাস্ত্রোক্ত দ্বাবিংশতি অপরাধের মধ্যে কোন প্রকার অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে সাধু মূর্ত্তিমান নারদরূপী ভগবান্ যেন আমার সেই সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেন। আমি সংসারে আসিয়া পাপকর্ম্ম করিয়া যত প্রকার নরকের অধিকারী হইয়াছি, ভগবান কূর্ম্মরূপী হরি যেন আমাকে সেই অশেষ নরক হইতে উদ্ধার করেন।

আমি যদি কখনও অখাদ্য আহারে পীড়িত হইয়া থাকি, তাহা হইলে ধন্বন্তরিরূপী ভগবান যেন আমাকে রক্ষা করেন। সুখ, দুঃখ এবং ভয় হইতে নির্জ্জিতাত্মা ভগবান ঋষভদেব যেন আমাকে রক্ষা করেন। লোকাপবাদ হইতে যজ্ঞপুরুষ হরি আমাকে রক্ষা করুন। মৃত্যু হইতে ভগবান বলদেব আমাকে ত্রাণ করুন। মহাহিংস্র সর্পভয় হইতে ভগবান অনন্তদেব আমাকে ত্রাণ করুন।

ভগবান দ্বৈপায়ন, আমাকে ভক্তির বিরোধী বিজ্ঞানযুক্তি হইতে রক্ষা করুন। পাষণ্ডগণ প্রবর্ত্তিত আপ্তমুগ্ধকর, অধর্ম্ম পথ হইতে বুদ্ধরূপী ভগবান আমাকে উদ্ধার করুন। যিনি ধর্ম্ম রক্ষার্থে এবং সংসারের শান্তি স্থাপনার্থে কালে কালে নানা অবতার অব ধারণ করেন, তিনি যেন কল্কিরূপে আমাকে কলিকালের অজ্ঞান-মলিনাভা হইতে রক্ষা করেন।

ভগবান কেশব ভাবে গদা হস্তে আমাকে যেন ঊষাকালে রক্ষা করেন। ভগবান গোবিন্দ প্রাতঃকালে বা প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে বেণুহস্তে আমাকে ত্রাণ করুন। ভগবান নারায়ণ রূপে বজ্রহস্তে আমাকে পূর্ব্বাহ্নে রক্ষা করুন। শঙ্খকর ভগবান বিষ্ণুরূপী হরি আমাকে মধ্যাহ্নে রক্ষা করুন।

উগ্রধন্বা মধুসূদন আমাকে অপরাহ্নে রক্ষা করুন। যিনি ব্রহ্মাদি

মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করেন, তিনি আমাকে সায়ংকালে রক্ষা করুন। মাধবরূপী হরি আমাকে প্রদোষ সময়ে রক্ষা করুন। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে হৃষীকেশ আমাকে রক্ষা করুন। একমাত্র পদ্মনাভ আমাকে নিশীথ সময়ে ত্রাণ করুন।

যে ঈশ্বরের বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, সেই ভগবান্মূর্ত্তি আমাকে শেষরাত্রে রক্ষা করুন, যে ভগবন্মূর্ত্তি জনার্দ্দন ভাবে বিরাজমান, তিনি যেন আমাকে অতি প্রত্যূষে রক্ষা করেন। দামোদররূপী ভগবান আমাকে প্রভাত-নিশীথে রক্ষা করুন। ভগবান বিশ্বেশ্বর যিনি কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনি আমাকে নিশাভাগের প্রতি সন্ধ্যাকালে রক্ষা করুন।

কবচে যে ভগবন্মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধক আপনার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্ব সময়ে রক্ষা বিধান করিয়া শেষে সেই মূর্ত্তির অষ্টকরস্থিত অস্ত্রাদির ধ্যান এইরূপে করিবে,—

হে চক্র! তোমার নেমি যুগান্ত-প্রলয়-কালীন অতি তেজস্বী ও তীক্ষ্ণ হইতেছে, তুমি ভগবানের শক্তিতে প্রযুক্ত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাক। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমার শত্রু-সেনাসমূহের বল, যেমন বায়ু সখা অগ্নি তৃণ সমূহকে সহজে দগ্ধ করে, তদ্রূপ তুমি ক্ষয় কর এবং দগ্ধ কর।

হে গদে! তুমি অজিত পুরুষ ভগবানের অতি প্রিয়বস্তু হইতেছ, তুমি বজ্রের ন্যায় অতি তেজোবান্ হইয়া বীর্য্যস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ কর। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। দৈত্য সাহায্যকারী কুষ্মাণ্ড, বৈনায়ক, যক্ষ, রক্ষ, ভূত ও দুষ্ট গ্রহগণকে নিজ বলে আমাকে রক্ষার্থে প্রেরণ কর এবং আমার শত্রুকে বিচূর্ণিত কর।

হে পাঞ্চজন্য শঙ্খ! তুমি ভগবান কৃষ্ণের হস্তে ধৃত ও তাহার মুখ-

বায়ুতে পূর্ণ হইয়া ভীষণ স্বরে ত্রিভুবনের পাপহৃদয় কম্পিত করিয়া থাক, এক্ষণে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি জাতুধান, প্রমথ, প্রেত, মাতৃ, পিশাচ এবং ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি ঘোর অশুভ দৃষ্টি বিধাতাগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ফেল।

হে অসিবর! তুমি ভগবান হরির হস্তে ধৃত হইয়া আছ। তোমার ধার অতি তীক্ষ্ণ হইতেছে। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি, সমস্ত অরি সৈন্যকে ছেদন কর, ছেদন কর। হে চর্ম্ম! পাপীগণের দৃষ্টিকে নিজের শতচন্দ্রসম জ্যোতির দ্বারা আবরণ করাই তোমার বিধি হইতেছে। এক্ষণে আমি তোমার শরণ লইলাম, আমার শত্রুগণের পাপ দৃষ্টি অনুগ্রহ করিয়া হরণ কর।

ইহ সংসারে গ্রহসমূহ হইতে, কেতুসমূহ হইতে, দুষ্ট মানব হইতে, সরীসৃপ হইতে, দংষ্ট্রী হইতে এবং কোনপ্রকার ভৌতিক উপায় হইতে আমার পক্ষে যে সকল অনিষ্ট ঘটনা ঘটিতে পারে, সে সমস্ত যেন ভগবানের নামানুকীর্ত্তন এবং রূপানুচিন্তন-বলে সদ্যঃ ক্ষয় হইয়া যায়। * * *

ইন্দ্র যে নারায়ণ কবচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যাহার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, তাহার অনুবাদটুকু তোমাকে শুনাইলাম।

শিষ্য। আমি ভাবিয়াছিলাম, কবচ বা বর্ম্ম বুঝি কি প্রকার একটি পদার্থ হইবে।

গুরু। পদার্থ দ্বারা জীবাত্মার রক্ষা হয়,—এতকাল পরে বুঝি এই বুদ্ধি যোগাইল? পদার্থ হইতে বিচ্যুত ভাবই জীবাত্মার মুক্তি বা রক্ষা,—আর পদার্থে জড়িত হওয়াই জীবাত্মার বন্ধন বা অধোগতি।

শিষ্য। আমাকে এই কথাটির ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি,—অবিদ্যা-বৃত্তিরূপী অসুরগণের

আসক্তি ও মোহাদিরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত হইতে সূক্ষ্মদেহ রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্ররূপী জীবাত্মা ভগবৎ পরায়ণতা বিবেক-মন্ত্রাদির অনুষ্ঠান-সাধক বিশ্বরূপের নিকটে শিক্ষা করিলেন,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—স্থূলদেহে কতকগুলি কার্য্য করিলে, মনের দ্বারা কতকগুলি সাত্ত্বিক চিন্তা করিলে, সূক্ষ্ম শরীরের বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যেমন সুগন্ধ আঘ্রাণে, সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, সুস্বর শ্রবণে মন আনন্দিত হয়; এবং তাহাতে সূক্ষ্ম দেহেরও কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি থাকে; যোগিগণ বলেন, তদ্রূপ শরীরের মধ্যে আটটি প্রধান সূক্ষ্ম ক্রিয়ার স্থান আছে। সেই স্থান সমূহকে ক্ষয় করাইয়া মনের দ্বারা সাত্ত্বিক চিন্তা করিলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রমে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সেই নিবৃত্তি নিবন্ধন সূক্ষ্ম শরীরের মোহ-সংস্কার নাশ হইলে যে জ্ঞান চেষ্টা করা যায়, মনোবুদ্ধ্যাদি তত্ত্বাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞান-নিয়ম-মতে মন্ত্রাদি দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইবার জন্যই এই অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদিরূপী বিবিধ নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। সূক্ষ্ম শরীরকে পবিত্র করিতে স্নান, অভ্যঙ্গ, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্তভাবে উপবেশন, বিবিধ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পরে মন্ত্রের দ্বারা প্রথমে অঙ্গন্যাস, পরে করন্যাসাদির বিধিও আছে। এই নারায়ণকবচের জন্য দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্র দ্বারা প্রথমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস বিধি; তৎপরে "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রের দ্বারা কেবল অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদির বিধি শাস্ত্রে আছে। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ইহাকেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে অঙ্গন্যাসাদির বিশেষ আলোচনা সর্ব্বপ্রকার নিয়মাদি লিখিত হইয়াছে। ফল কথা সর্ব্বত্রই অঙ্গন্যাসাদি এইরূপ জীবাত্মার উন্নতি সাধক জানিবে।

শিষ্য। অঙ্গন্যাসাদি দ্বারা জীবাত্মার উন্নতি হয়, বুঝিতে পারিলাম,—

কিন্তু কবচের মধ্যে ভগবানের অবতার প্রভৃতির কথা যাহা কথিত হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশ্য কি ?

গুরু। ভগবানের অবতার সমূহের দ্বারা জীবনের সকল বিপদের রক্ষা বিধান হইয়া থাকে ; কেন না, ইহাতে জীবের ঈশ্বর-পরায়ণতা ব্যতীত আর অপর শিক্ষা কিছুই নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের স্থূল শরীরকে অজ্ঞান সংস্কার ও রিপু প্রাবল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শাস্ত্রে মন্ত্র কবচাদির সৃষ্টি হইয়াছে। অঙ্গন্যাসে বাহ্যক্রিয়া দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্যের উপায়, পরে করন্যাসে ইন্দ্রিয় স্থৈর্য্যের উপায় দেখাইয়া, ভগবানের অবতার ও তল্লীলা এবং বীর্য্যস্মরণে জীবের মনোবৃত্তির অজ্ঞান-সংস্কার দূরীভূত করণোপায় স্থির করা হইল, বুঝিতে হইবে। এই সকল ঈশ্বর ভাবে, আপনাদের সমস্ত বিপদ, অহঙ্কার এবং পাপ হইতে ঈশ্বরের সমীপে প্রতিশ্রুত হইয়া পরিতাপ সহযোগে যাহাতে উদ্ধার হওয়া যায়, সেই বিধি প্রকাশ পাইল। এই নিয়মে জীব যেন ঈশ্বর পরতা শিক্ষা প্রাপ্ত হইল।

শিষ্য। তৎপরে উক্ত কবচে সর্ব্বদা বা দিবানিশির প্রহরে প্রহরে সন্ধিক্ষণে সন্ধিক্ষণে যে রক্ষার প্রার্থনা করা হইল,—তাহার কোনও তাৎপর্য্যার্থ আছে না কি ?

গুরু। নিরর্থক কিছুই শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। প্রহরে প্রহরে মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ;—তাহাতে যদি বিষ্ণুভক্তির কোনও প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইয়া ভক্তিসাধনে বিরোধ সংঘটন হয়, তজ্জন্য দিবানিশি যে ভাবে বিষ্ণু স্মরণ করা যায়, সেই উপায়ই উহাতে কথিত হইয়াছে।

ফলতঃ নারায়ণ-কবচের কথায় বলা হইল,—অসুরগণকে পরাজয় করিতে অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না। হৃদয়কে বিষ্ণুময় করিতে

পারিলেই মনের রিপু ও আসক্তি নামক প্রবৃত্তিবাচক অসুরেরা আপনিই ধ্বংস হইয়া থাকে।

যে কোন দেবদেবীর স্তব কবচাদি আছে, তাহারই তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ জানিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা।

শিষ্য। সুরপতি ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি, কিন্তু কোন্ ব্রাহ্মণকে যে হত্যা করিয়াছিলেন,—তাহা জানি না।

গুরু। যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নারায়ণ-কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বরূপকে হত্যা করেন।

শিষ্য। ইহাও বোধ হয় পুরাণের রূপক ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। গল্পটা আমি শুনিতে চাই।

গুরু। বিশ্বরূপ অসুরবংশীয়া কামিনীর গর্ভে ও দেবতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই দৈত্যসাধু মহাত্মা বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। এক মস্তকস্থ মুখে তিনি সোম পান করিতেন, দ্বিতীয় শিরস্থ মুখে সুরাপান ও তৃতীয় মস্তকস্থ মুখে অন্ন ভক্ষণ করিতেন।

বিশ্বরূপ সাধু হইলেও অন্তরের কপটতা নাশ করিতে পারেন নাই। তিনি যখন যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রের মঙ্গল হেতু দেবগণের উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতেন, তখন তাঁহাদের নিজ পিতৃবংশীয় বলিয়া সবিনয়ে উচ্চমন্ত্রে

আহ্বান করিতেন। কিন্তু গোপনে গোপনে আপনার মাতৃস্নেহ পরবশ হইয়া মাতৃবংশীয় অসুরগণকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পুরোহিতের এইরূপ কপটাচরণ দেখিয়া দেবপতি ইন্দ্র তাঁহাকে কপট ও অধার্ম্মিক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মবধভয়ে এবং দৈত্যসম্মান হেতু ক্রোধে তিনি অস্থির হইয়া শেষে রোষবশে স্বয়ং বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার যে মস্তক সোমপান করিত, তাহা পাবক-পক্ষী, এবং সুরাপায়ী মস্তক চটক ও অন্নভোজী মস্তক তিত্তিরী পক্ষী হইল। *

শিষ্য। ইহার তাৎপর্য্যার্থ কি, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। ইন্দ্রের এই ব্রহ্মহত্যা ব্যাপারে দুইটি তাৎপর্য্যার্থ মনে আইসে। প্রথমে যে যতই পণ্ডিত হউক, যতই সাধুভাব শিক্ষা করুক,—সময়ক্রমে তাহার স্বকীয় ভাব প্রকাশ পাইয়া পড়ে। বিশ্বরূপের ন্যায় সাধু সজ্জনকেও যখন ইন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান লোকে বিশ্বাস করিয়া উপকার লাভ করিতে পারেন নাই, তখন সংসারে সামান্য মানবের কথা কি হইতে পারে। ইহা লৌকিকভাব ; কিন্তু ইহার প্রকৃতভাব এই যে—ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি জীবাত্মা, অহঙ্কারে মলিন হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় বিজ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ম্ম-বিবেকের আশ্রয়ে আত্মবিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ প্রলোভনে—আর মাতৃশক্তি বা সংস্কারে বিবেকও বিচলিত হয়। বিবেক কাহার না আছে? বন্ধুর মৃত্যুতে বিবেকের উদয় হয়, কিন্তু গৃহে গিয়া গৃহিণীর মুখ দেখিলেই বুক ভরিয়া মোহের উদয় হয়। যতই সাবধান হওয়া যাউক না কেন, জীবাত্মা কর্ম্মসহযোগে ব্রহ্মজ্ঞান আহরণ করিতে চেষ্টা করিলে, শুদ্ধ

* শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ।

জ্ঞানোদয় হওয়া দূরে থাকুক, অজ্ঞান মলিনতাই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ইন্দ্রের এই ব্রহ্মহত্যা।

বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় বলিতে ত্রিবিধ কর্ম্মশক্তি। কর্ম্মশক্তি হইতে তিনটি বৃত্তির উদ্ভব হয়,—তাহাদিগের নাম মোহ, ভ্রম ও ভোগ। সোম-পানে মোহ উপস্থিত হয়, সুরাপানে ভ্রম উদ্ভব হয় ও অন্নাদি ভক্ষণে ভোগ আসিয়া জুটে। এই তিন বৃত্তি হইতে যজমান কর্ম্মজ্ঞান হইতে আসক্তিপর হইয়া থাকে। তিন বৃত্তিই বিশ্বরূপে শিরত্রয়। কর্ম্ম-বিবেকের মলিনতা উহাই। বিবেক আইসে,—কিন্তু কর্ম্ম মলিনতা হইয়া অবশেষে মজিয়া পড়িয়া মরিয়া যায়। জীবাত্মা যখন তাহাকে রিপুপর বলিয়া বুঝিলেন, তখন তাহাকে ছেদন বা নিজ অন্তর হইতে বিষয় জ্ঞান নাশ করিলেন। সেই বিষয়-জ্ঞান সংসারে ত্রিবিধভাবে বিভক্ত। মোহ চাতক, ভ্রম চটক এবং ভোগ তিত্তিরী পক্ষীরূপে কথিত হইল।

ঐ তিন প্রকার পক্ষীর তিন প্রকার স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যায়, তথাপি চাতক মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না,—কাজেই সে মেঘের মোহে ভুলিয়া আছে। চটক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বালুকাভক্ষণ করিয়াও প্রিয় সঙ্গমে ভ্রান্ত থাকে। তিত্তিরী নিত্য নিত্য নূতন নূতন আহারের জন্য অনুরত থাকে ;—সে যেন আহারের জন্যই জন্মিয়াছে, তাহার আর কোন কার্য্যই নাই, অনুক্ষণ আহার করাই তাহার জীবনের কার্য্য। ভাব বুঝাইবার জন্য পক্ষীর কল্পনা,—কিন্তু প্রকৃত কথা, কর্ম্মজ্ঞানের ঐ তিন বৃত্তি বিশুদ্ধ অন্তঃ-করণের দ্বারা যখন পরিব্যক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়, তখন উহা ঐ পক্ষীত্রয়ের স্বভাবের ন্যায় ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয় মাত্র। ব্রহ্মবিৎ দুর্জ্জন হইলেও ব্রাহ্মণ সম্মানের কিছু অংশী হইতে পারে। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই

ইন্দ্রকর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বধ জন্য ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা পাপ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

শিষ্য। ইন্দ্রের সেই ব্রহ্মহত্যা পাতক কিসে অপনোদিত হইয়াছিল? যদিও উহা রূপক, তথাপি আমাদের পক্ষে তাহা জ্ঞাতব্য। আমার বিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্রে যে রূপক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদিগের মত অজ্ঞানী জনগণকে সাংসারিক কার্য্যে সাবধান করিয়া মোক্ষপথের পথিক করাই তাহার উদ্দেশ্য। গল্পটা বলুন।

গুরু। পুরন্দর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক নিবারণ করিতে পারিতেন, তথাপি অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। সংবৎসর ভোগ করিয়া অবশেষে ভূতগণের শুদ্ধির নিমিত্ত ঐ পাতককে চারিভাগে বিভক্ত করতঃ পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতিতে নিক্ষেপ করিলেন। বিবর সকল আপনা আপনিই পরিপূর্ণ হইবে; এই বর লইয়া পৃথিবী ঐ পাপের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে যে মরুভূমি দেখিতে পাও, তাহাই ঐ পাতকের স্বরূপ। ছেদন করিলে পুনর্ব্বার প্ররোহ জন্মিবে; এই বর পাইয়া বৃক্ষগণ আর এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। তাহাদিগের যে নির্য্যাস দেখা যায়, তাহাই ঐ পাতক। সর্ব্ব সময়েই সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব; এই বর লাভ করিয়া নারী এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। ঐ পাপ রজোরূপে মাসে মাসে দৃষ্ট হয়। ক্ষীরাদি অপর দ্রব্যের সহিত মিলিত হইতে পারিব; এই বর পাইয়া জল অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। জলে যে ফেন ও বুদ্‌বুদ্ দেখিতে পাও তাহাই ঐ পাপের চিহ্ন। যে পুরুষ জল হইতে ফেনাদি অন্যত্র নিক্ষেপ করেন, তিনি জলের ঐ পাতক নাশ করেন। *

শিষ্য। এ কথাগুলির তাৎপর্য্য কি?

* শ্রীমদ্ভাগবত; ষষ্ঠ স্কন্ধ ৯ম অঃ।

গুরু। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবধ্য,—আর ক্রোধের ফল সকলকেই লইতে হয়। জীবাত্মা নারায়ণ-কবচে আবৃত ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন,—নারায়ণ-কবচের বলে সহজেই পাতকরাশিকে অর্থাৎ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে বা মন হইতে তাহার সংস্কারকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইলেন। অন্যে হইলে কখনই তাহা পারিত না। ভূমি, বৃক্ষ, জল ও রমণী ইহারাই আসক্তির আধার। পূর্ব্বোক্ত কথায় তাহা বলা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বৃত্রাসুরের জন্ম।

শিষ্য। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধোপাখ্যান ও তাহার তাৎপর্য্যটি শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। মহাত্মা ত্বষ্টা প্রজাপতি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়পুত্র অন্যায়রূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইন্দ্রকে শাসন করিবার জন্য আপনার ব্রহ্মযজ্ঞ-কুণ্ডে আহুতি দিয়া বলিলেন, "হে ইন্দ্র শত্রো! বিবর্দ্ধিত হও। আমার এই আহুতিতে উত্থান করিয়া অনতিবিলম্বে শত্রুকে বিনাশ কর।"

"হে ইন্দ্র-শত্রো!" এই সম্বোধন পদটি বৈদিকস্বরে উচ্চারণ হওয়ার কালে পূর্ব্ব পদটি উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে, উহা বহুব্রীহি সমাস হইয়া পড়ে, তাহাতে ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যার,—এমন লোকের উৎপত্তি বুঝায়। মহাত্মা ত্বষ্টা ভ্রমক্রমে সেইরূপ স্বর উচ্চারণ করিয়াছিলেন

বলিয়া, বৃত্র ইন্দ্রের শত্রু না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের শত্রু অর্থাৎ সংহারক হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি ত্বষ্টা যে দণ্ডে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, সেই দণ্ডেই তথা হইতে এক ঘোর-দর্শন এবং যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় জীবগণের পক্ষে অতীব ভয় দর্শন এক অসুর উত্থান করিল।

সেই অসুর দিনে দিনে বিক্ষিপ্ত শর-গতির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালীন গগনের ঘনচ্ছটার ন্যায় তাহার অঙ্গের ভীম ভাব দগ্ধ শৈলতুল্য অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিল।

তাহার কেশ ও শ্মশ্রু তপ্ত তাম্রের ন্যায় কপিল বর্ণের ছিল। তাহার যুগল লোচন যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অত্যন্ত প্রচণ্ড তেজোময় হইয়াছিল। তাঁহার হস্তধৃত ভীষণ ত্রিশূল যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমিতে দ্বিভাগ করিয়া মধ্যস্থলে বিরাজিত ছিল।

যখন সেই মহাসুর নৃত্য ও উল্লম্ফন করিত, তখন তাহার পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইত। যখন সে গিরি-গহ্বর তুল্য গম্ভীর মুখ ব্যাদান করিত, তখন যেন আকাশকে গ্রাস করিতেছে, বোধ হইত, এবং জিহ্বা দ্বারা যেন নক্ষত্র সমূহকে লেহন করিতেছে, এইরূপ জ্ঞান হইত। উভয় দন্তের নিষ্পেষণে পৃথিবীকে চর্ব্বণ করিবার ভয় উপস্থিত হইত। তাহার ভয়ে পৃথিবীস্থ জীবগণ ত্রাস-কম্পিত কলেবরে দিনাতিবাহিত করিত। *

* ইন্দ্রশত্রো। অর্থাৎ "হে ইন্দ্রের শত্রো।" বলিয়া হোম করা হইল; তথাপি যে দানব উৎপন্ন হইল, সে ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ হন্তা না হইয়া ইন্দ্রই তাহার হন্তা হইলেন, অতএব মন্ত্রের বিফলতা ঘটিল, এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উচ্চারণের স্বরভেদে উচ্চারণ করাতে "ইন্দ্রশত্রো" শব্দে "ইন্দ্রের শত্রু" না বুঝাইয়া 'ইন্দ্র যাহার শত্রু' এইরূপ অর্থ বুঝাইল। সুতরাং ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিলেন।

মহাত্মা ত্বষ্টা প্রজাপতি, আপনার তপোময়ী মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী এই অসুর মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন; ত্বষ্টা নন্দন হইয়া অতি দারুণ পাপ-স্বরূপে তপস্যায় ত্রিভুবন আবৃত করিল বলিয়া সাধুগণ উহাকে বৃত্র নামে অভিহিত করিলেন।

শিষ্য। ইহারও বোধ করি তাৎপর্য্যার্থ আছে? কারণ, ইন্দ্র যখন রূপক। তাঁহার ব্রহ্মহত্যা যখন রূপক,—তখন বৃত্রাসুরের উদ্ভবও বোধ হয় রূপক হইবে?

গুরু। হাঁ, তাহা আছে বৈকি। জীবাত্মারূপী ইন্দ্রে কর্ম্মজ্ঞান সত্বারূপী ত্বষ্টার মোহিনীস্বরূপ কর্ম্ম-বিবেক বিশ্বরূপকে নিষ্কামভাবের বিরোধী দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করাতে ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইল। তদুপস্থিতির অন্তে ঘোর অজ্ঞান-বৃত্রাসুর কর্ম্ম-জ্ঞান হইতে প্রকাশ পাইয়া জীবাত্মাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইন্দ্র বিষ্ণুপরায়ণ থাকাতে তাঁহাকে কোন ক্রমে কেহ বিপন্ন করিতে পারে নাই বা পারে না। ইহাই ত্বষ্টার মন্ত্রচ্যুতির কথা। কিন্তু তথাপি কর্ম্মরূপী শক্রর চক্র-জাল অত্যন্ত দুর্ভেদ্য,—তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে। ত্বষ্টার আন্তরিক চেষ্টায় বৃত্রের উদ্ভব,—বৃত্র বা অজ্ঞান-শক্তিই বিশ্বাবরণকারী;—অজ্ঞান হইতে ইহাই উদ্ভূত হইয়া জীবাত্মাকে জড়াইয়া ধরিতে গেল, এবং তাঁহাকে স্বর্গ বা আনন্দ-শ্রী হইতে বিচ্যুত করিল। শাস্ত্রে গল্পটা এইরূপ ভাবে আছে,—

দেবতাগণ, বৃত্রাসুরের দ্বারা ত্রিভুবনে ভীষণ উৎপাত হইতেছে দেখিয়া, ত্বরায় নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সসৈন্যে তাহাকে নাশ করিতে আগমন করতঃ যতই তীব্র তীব্র স্বর্গীয় অস্ত্র ক্ষেপন করিতে লাগিলেন, ততই সেই অসুর অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিছুতেই কাতর হইল না।

অস্ত্রাদি বিফল হইল দেখিয়া, দেবগণ একেবারে বিষাদিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন; অসুরের তেজে যেন তাঁহাদের তেজ অস্তমিত হইয়া আসিল। তখন তাঁহারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সেই অনন্যগতি ভগবান্ হরিকে সমাহিত হইয়া স্মরণ করিতে লাগিলেন।

দেবতাগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব এস্থলে তোমাকে একটু শ্রবণ করাইতেছি, তাহা হইলে আমি দেবতাসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি,—তাহা তোমার আরও দৃঢ়প্রত্যয় হইতে পারিবে। দেবতাগণ ধ্যানযোগে ভগবান্‌কে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন, "এই বায়ু, অগ্নি, আকাশ, জল, ক্ষিতি সংযোগ এই ত্রিভুবন এবং ব্রহ্মাদি হইতে আমাদের ন্যায় অভাজন দেবতাগণও যাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, যিনি সকলের অন্তক স্বরূপ হইতেছেন, সর্ব্বপূজ্য মহাকাল যাঁহার আশ্রয়ে সুরক্ষিত আছেন, সেই রক্ষাকর্ত্তা হরির শরণ আমরা গ্রহণ করিলাম—তাহাতে অবশ্যই আমাদের দুরিত ক্ষয় হইবে।

যাঁহার মায়াতে বিশ্ব বিস্মিত, কিন্তু যিনি তাহাতে অভিমানী নহেন; যাঁহার লাভ ক্ষয় জ্ঞান নাই, যিনি চিরদিন পরিপূর্ণকাম হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যিনি চির প্রশান্ত হইয়াছেন,—যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বাশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে অপর দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, কুকুর যেমন স্বলাঙ্গুলে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিয়া জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ সে ব্যক্তি মূর্খতা দোষে বিপদ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকে; কখনই উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না; অতএব, আমরা এমন ভজনীয়ের আশ্রয় লইলাম, তিনিই আমাদের সকল বিপদ বিনাশ করিবেন।

যাঁহার মৎস্য-মূর্ত্তির শৃঙ্গে প্রলয়-বিপদে বিপন্ন ভগবান্ মনু, জগৎস্বরূপ নিজ নৌকাকে আবদ্ধ করিয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন। আমরা ত্বষ্টৃনন্দন হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়া সেই মৎস্য মূর্ত্তিমান্ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ

করিতেছি, তিনি যেন কৃপা করিয়া আমাদের উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

পুরাকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভুও যাঁহার নাভি-কমলে প্রকাশ পান, সেই ভীম উর্ম্মি ও বায়ুবেগ-কম্পিত প্রলয়-সাগরের মধ্যস্থিত কমল মাঝে থাকিয়া প্রলয়কালীন বিপদ হইতে যাঁহার ধ্যানে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভগবানের শরণ লইলাম, তিনি যেন উদ্ধার করেন।

যিনি একমাত্র সৃষ্টির ঈশ্বর হইয়া আপনার মায়ায় প্রথমে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন; আমরা সৃষ্ট হইয়া এই চরাচরকে পরে সৃজন করিতেছি; এবং আমরা যাঁহার সমীপবর্ত্তী থাকিয়া, তাঁহারই শক্তিতে সৃষ্টি কার্য্য করিতে করিতে এমত অভিমানী হইয়াছি যে, আমরাই কর্ত্তা, এই ভাব ধারণ করিয়াছি; এই হেতু যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, সেই ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় হউন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

যুগে যুগে যখনই আমাদের শত্রুগণ বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের মহা পীড়া প্রদান করে, তখনই সেই যুগে যুগে যিনি আমাদের রক্ষা করিবার জন্য দেবর্ষি তির্য্যক্ ও মানব আকার আশ্রয় করিয়া, আত্মমায়া সহযোগে নানাভাবে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের রক্ষা ও দুর্জ্জনকে দমন করেন;—উপস্থিত বিপদ হইতে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

যিনি বিশ্বে আত্মরূপে পরম দেবতা, যিনি বিশ্বের প্রধান কারণ, যিনি ইহার কার্য্য-সম্বা পুরুষ, এবং যিনি স্বয়ংই একরূপে জগৎ হইতেছেন। যিনি ভক্তজনের উদ্ধারকারী হইতেছেন, সেই মঙ্গলদাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম,—সেই মহাত্মা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

* শ্রীমদ্ভাগবত,—ষষ্ঠ স্কন্ধ, ৯ম অঃ।

ইন্দ্র ধ্যানযোগে স্তব করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ শঙ্খ চক্র গদা-পদ্মধারী হইয়া আবির্ভূত হইলেন।

হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে দেবতারা তাঁহাকে সম্মুখে দর্শন করিলেন। দেবতাগণ ভগবদ্রূপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া একেবারে আহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইয়া দণ্ডবতে ভূমে পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমাকুলচিত্তে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;—

"দেবতাগণ ! আমি তোমাদিগের অতিশয় বিজ্ঞানযুক্ত স্তব শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। কারণ, এই স্তব যাঁহারা পাঠ করিবেন বা ভাবনা করিবেন, সেই সকল সংসারীবৃন্দের অন্তরের আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে। সেই আত্মা বিষয়ক স্মৃতিনিবন্ধন তাহা-দিগের আমাতে অচলা ভক্তি জন্মিবে।

হে দেবতাগণ ! যাঁহাদিগের নিকটে আমি প্রীতি প্রাপ্ত হই ; ইহ সংসারে তাহাদের আর অলভ্য কি থাকে ? যাঁহারা আমার তত্ত্ব বিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারা আমাতে একান্ত মতি সংস্থাপন ও মৎপ্রীতি উৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই আমার নিকটে ভিক্ষা করেন না।

যে ব্যক্তি গুণময় বিষয়েরই তত্ত্বালোচনা করে, সেই ব্যক্তি আপনার পরম মঙ্গলের বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহে। সেই অজ্ঞ ব্যক্তি যাহা কামনা করে, দাতা তদনুরূপ অজ্ঞ না হইলে, কেমন করিয়া সেই মূর্খকে তাহার অসৎ কামনা পূর্ণ করিতে দিবে ?

শিষ্য। দেবতাগণের ভগবানের স্তব, ভগবানের আবির্ভাব ও ভগবানের আত্মসুখ্যাতি শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ, অবশ্য ইহার তাৎপর্য্য আছে ?

* শ্রীমদ্ভাগবত ;—৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ৯ম অঃ।

গুরু। আছে বৈ কি।

শিষ্য। তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বারূপী দেবতাগণের সহযোগে জীবাত্মারূপী ইন্দ্র, বৃত্ররূপী প্রখর অজ্ঞানকে জয় করিতে না পারিয়া আত্মজ্ঞানবলে সেই ঘোর অজ্ঞানকে নাশ করিবেন। আত্মজ্ঞান স্বকীয় পুরুষকারের সাহায্যে লাভ হয় বটে, কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ না হইলে, তাহা প্রকৃত ভাবে স্থায়ী হয় না। তাহাতেই ভগবানের ধ্যান ও স্তবের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে।

শিষ্য। সাধুগণের স্তবে ঈশ্বরের প্রীতি-আকর্ষণ যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর স্তবের বশীভূত,—একথা স্বীকার করিতে হয়? কিন্তু তাহা হইলে, সেই নির্ব্বিকার নিরহঙ্কার ভগবানকে নিজ কীর্ত্তি-গাথা শ্রবণাকাঙ্ক্ষী, আরও সোজা কথায় তোষামোদ প্রিয় বলা যাইতে পারে।

গুরু। ভুল বুঝিতেছ। স্তবের অর্থ তাহা নহে। দেবগণের ন্যায় বিশ্বের হিত-চেষ্টায় অর্থাৎ স্বার্থশূন্য হইয়া যাহারা ঈশ্বরপরায়ণ হইবার জন্য, তাঁহার লীলা ও গুণানুবাদ করেন, তাহাতে তাঁহাদেরই হিত হইয়া থাকে,—ঈশ্বরের কিছুই নহে। বর্ণমালা পাঠ ও অভ্যাস করিলে যেমন বর্ণমালার কোনই লাভ নাই,—যে পাঠ ও অভ্যাস করে, ভবিষ্যতে তাহারই গ্রন্থাদি পাঠের সুবিধা হয়। সাধন চেষ্টায় এবং স্তবে যে ভাব প্রকাশ হয়, তাহাতে ঈশ্বরের প্রীতি আকর্ষণ হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, স্তবাদিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করে মাত্র। জীবের অজ্ঞান দূর হইলে, ভগবৎ-প্রীতিরূপী বিজ্ঞানভাব তাহারা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বলা হইল যে, জীবে আত্মোন্নতি সাধনই করে, ভগবানের কোন উপকার করে না। স্তবাদিতে কেবল স্তাবকেরই যে উপকার হয়, তাহা নহে,—উহা যাহারা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারাও আপনাপন অজ্ঞান জয় করিতে সমর্থ হয়।

স্তবের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া কৌশলে ভক্তের সম্মান দেখাইবার জন্য ভগবানের শ্রীমুখ দ্বারা বলা হইল যে, "আমার প্রীতিমাত্র যাহারা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আর কোন কামনাই থাকে না। তাহারা জগতের শাসন হইতে উপরত হইয়া চিরমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ মুক্তিদাতা—বাঁধিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। কিন্তু জীবাত্মার এখন যে অবস্থা, তাহাতে মুক্তি সুদূরপরাহত। কেন না, তাঁহার হৃদয়ে তখন জীবাংসাবৃত্তি প্রবলা। পর-আপন জ্ঞান আছে,—স্বার্থ ধ্বংস জ্ঞানের উদয় হয় নাই। তাই ভগবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমরূপী মহর্ষি দধীচির সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। সকলেরই শিক্ষার আবশ্যক,—আদর্শ না পাইলে সেই শিক্ষা লাভ হয় না। নিঃস্বার্থের আদর্শ দেখাইবার জন্য দধীচি নামক মুনির সদনে ইন্দ্রের গমন-পরামর্শ। দধীচি অর্থ নিঃস্বার্থের পরম দেবতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দধীচির অস্থি ও বৃত্রবধ।

শিষ্য। ভগবান্ হরি নিজে সর্ব্বগুণাধার,—নিজেই নিঃস্বার্থতার জ্ঞান জীবাত্মারূপী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেই ত পারিতেন ?

গুরু। তাঁহার নিজ ও পর কিছুই নাই, সকলই তিনি। যেখানে যে গুণের প্রাধান্য হইয়াছে, সেই স্থানেই তাহা শিক্ষা করা ভাল,—তিনি সমুদ্র, জীব গোষ্পদ। সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদকে উন্নত করা যাইতে পারে না, তাই পুকুরের আদর্শ লওয়াই ব্যবস্থা। তাই ভগবান্,

জীবাত্মাকে জ্ঞানরূপী নিষ্কামী দধীচির নিকটে প্রেরণ করিলেন,—ইহাই বলা হইল। তাই ভগবান্ জীবাত্মাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন,—যেমন উপযুক্ত চিকিৎসক কখনই রোগীকে তাহার বাঞ্ছা অনুসারে কুপথ্য ভোজনে অনুমতি দেন না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আপনার মলিনত্ব স্বরূপ আত্মজ্ঞান বুঝিয়াছেন, তিনি কখনই অজ্ঞ সংসারী ব্যক্তিকে কর্ম্মের অনুগত শিক্ষা দান করেন না।

হে ইন্দ্র! তুমি যে কামনা করিতেছ, তাহা আমার নিকটে পূর্ণ হইবে না। দধীচি নামে এক ঋষিসত্তম আছেন, তাঁহার দেহ, বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদিতে অত্যন্ত পবিত্র হইয়া আছে; তুমি ঋষির পবিত্র অস্থি অতি ত্বরায় ভিক্ষা করিয়া লও।

সেই ঋষির ক্ষমতার কথা অধিক কি বলিব; তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় এতদুর পারদর্শী যে অশ্বশির লাভ করিয়াও অশ্বিনীকুমারগণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন,—অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ সেই বিদ্যা অশ্বশিরঃশ্রুতি নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। অশ্বিনীকুমারগণ তাঁহার নিকটে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি পরম দয়ালু,—আপনারা তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিলেই তিনি তাহা দান করিবেন। তাঁহার অস্থি হইতে বিশ্বকর্ম্মা যে বজ্র নির্ম্মাণ করিবেন, সেই বজ্রে বৃত্রাসুর নিধন হইবে।

সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বিসর্জ্জনেই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ! জীবাত্মার এই শিক্ষা না হইলে, পরমোন্নতির সম্ভাবনা নাই। দধীচি আপন দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরের উপকার করিয়াছিলেন,—ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে, তখন আর কি জন্য আমিত্বের ক্ষুদ্রতা থাকিবে? সেই জ্ঞানের উদয়ে ইন্দ্রাদির অধিষ্ঠাতা দেবগণ ও তদধিপতি অন্তঃকরণ বা জীবাত্মা-রূপী ইন্দ্র বুদ্ধি নামক বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে অস্ত্র পাইবেন, তাহা একটি

পরম বিজ্ঞান,—কাজেই সেই বিজ্ঞান বজ্রে তমোরূপী দৈত্য নিধন হইয়া যাইবে।

শিষ্য। দধীচির অস্থি যেরূপে সংগ্রহ হইল, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। ভগবানের ইঙ্গিতাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণ অথর্ব্বনন্দন দধীচির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সবিনয়ে তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন,—আপনাকে মরিতে হইবে, আপনার দেহের অস্থি সমূহ লইয়া আমরা বজ্র নির্ম্মাণ করতঃ আমাদের শত্রু বৃত্রাসুরকে সংহার করিব।

দধীচি কোপপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমরা না দেবতা! তোমাদের মত স্বার্থপর জীব জগতে আর আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। আমার দেহটি পরিত্যাগ করিয়া আমি চিরদিনের মত এই সুজলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু পথের পথিক হইব, আর তোমরা আমার অস্থি লইয়া তোমাদের শত্রু সংহার করিয়া সুখভোগ করিবে। কি আশ্চর্য্য! এমন কথা মুখে আনিতেও তোমাদের মনে বিবেকের বিন্দুমাত্র ভাবও উদয় হয় নাই? দেখ, মরিতে কে চাহে। বাঁচিবার কামনা সকলেই করিয়া থাকে।

ইন্দ্র করযোড় করিয়া বলিলেন,—"মহর্ষে! আপনার সদৃশ মহান্ পুরুষেরা ভূতগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের যশঃ পবিত্র, তাঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মের প্রশংসা করেন। অতএব আপনারা কি না দান করিতে পারেন? লোক স্বার্থপর, ইহা সত্য কথা; তাহারা পরের বিপদ বুঝিতে পারে না; যদি পারিত, তাহা হইলে কেহ যাচ্ঞা করিত না; আর ক্ষমতা থাকিতেও দাতা 'না' 'না' বলিত না।

সহাস্য মুখে ঋষি কহিলেন, আপনাদিগের নিকটে ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে

আমার ইচ্ছা ছিল, এই কারণে আমি ঐরূপ প্রত্যুক্তি করিয়াছি,—এই দেহ নিশ্চয়ই প্রিয় বটে, কিন্তু আজি হউক, কালি হউক, আর দশবৎসর পরেই হউক,—এই দেহ আমাকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। অতএব ইহা আমি আপনাদিগকে এখনই দান করিব। হে দেবগণ! যে ব্যক্তি প্রাণীর প্রতি দয়াবশতঃ অস্থির দেহ দান করতঃ ধর্ম্ম ও যশ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না করে, স্থাবরেরাও তাহার নিমিত্ত দুঃখিত হয়। যিনি প্রাণীর শোকে ও হর্ষে আপনি শোকান্বিত ও আনন্দিত হন, পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ তাঁহার ধর্ম্মকেই অব্যয় বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। ধন, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়জন এবং দেহ, সকলই ক্ষণভঙ্গুর;—শৃগালাদির ভক্ষ্য। এ সকলের দ্বারা পুরুষের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি হয় না। কিন্তু তথাপি মানুষ এতদ্দ্বারা পরেব উপকার করিতে চাহে না, ইহা বিষম দুঃখ ও কষ্টের কথা।

মহাত্মা দধীচি মুনি এইরূপ বলিয়া ভগবান্ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে এক করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। ঋষি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমুদয় বন্ধন বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে যে দেহ নষ্ট হইতেছে,—তিনি পরমযোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহা জানিতে পারিলেন না।

অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা সেই মুনির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। পুরন্দর ভগবানের তেজঃ সহযোগে গর্ব্বিত হইয়া সেই অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন।

এই বৃত্রাসুর বধোপাখ্যানে জীবাত্মার উন্নতি ও পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের সুন্দর যোগের কথা বলা হইয়াছে। সামবেদের ছন্দার্চ্চিকাংশেও এই বৃত্রাখ্যান বিষয়ক মন্ত্র বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, দেবতাগণ মন্ত্রশক্তিস্বরূপ হইতেছেন,—

সাধকের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ ইন্দ্র, বিজ্ঞান অস্ত্রে দধীচির দেহ বা অধ্যাত্ম উপায় স্বরূপ, অথবা স্বার্থত্যাগের পরমাদর্শ লাভ করতঃ তদভ্যাসে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণে সাত্ত্বিকীভাব আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহযোগিতায় আপনার কর্ম্মজনিত বৃত্রনামক অজ্ঞান নাশ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র ও তাঁহার কার্য্যকলাপের তাৎপর্য্যভাব তোমার নিকটে বর্ণনা করা গেল।

প্রসঙ্গক্রমে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, স্তব ও কবচের কথাও ইহাতে বলা হইয়াছে,—তুমি এগুলি সর্ব্বত্র সমান অর্থেই ভাবিও। তবে দেবতা বিশেষের স্তব-কবচের অর্থ বিভিন্ন থাকিতে পারে,—যে দেবতার যে শক্তি, তাঁহার নিকটে তাহাই প্রার্থনা আছে। কিন্তু মূল ভাবার্থ ঐ প্রকার,—সে অর্থগুলিও তাহার তাৎপর্য্যার্থে তুমি করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। সমস্ত দেবতার স্তব-কবচাদি পৃথক্ পৃথক্ বলিতে হইলে, শ্রোতা ও বক্তার মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুর প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সূর্য্য ও চন্দ্র।

শিষ্য। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা ও অষ্টবসু প্রভৃতিকে মানবের ভাগ্য-বিধাতা বলা যাইতে পারে। ইঁহারা কোন্ পদার্থ? পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-মতে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গুরু। নাম, রূপ প্রভৃতি ঘুচাইয়া এই অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির বিষয় ভাবিতে গেলে, দিশেহারা হইয়া পড়িতে হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক-

গণ কেবল জড়ের আলোচনাতে নিরত আছেন, তাঁহারা জড়েরই পরিচয় অবগত হইতে পারেন। কিন্তু এখনও বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্ব নিরাকরণেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এইত তোমার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এত যন্ত্রাদির পরীক্ষা, এত সাধের গৌরবাত্মক সাহঙ্কার লাফালাফি.—এই ৫৬টি মূল ভূতের অনুসন্ধান,— যাহা তোমরা পাঠ করিয়া বলিতে, হিন্দু ঋষিগণ সেকালে—সকল তত্ত্বের আবিষ্কারে সক্ষম হয় নাই—হিন্দু ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, এক অপরা শক্তি হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে,—সেই পঞ্চভূতের হাতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। কিন্তু এতদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ লম্ফ ঝম্প করিয়া বলিয়াছিলেন,—ভুল ভুল হিন্দুদের মহাভুল, মূলভূত পাঁচটি নহে, ছাপ্পান্নটি। অমনি আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত বাবুগণ বলিলেন,— কি লজ্জা, কি পরিতাপের বিষয়! আমরা এমন ভুলের বংশেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি—ছাপ্পান্ন ভূতের স্থলে পাঁচটি ভূত! ইহারাই আমাদের জ্ঞানী পূর্ব্ব পুরুষ!

কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভুল ভাঙ্গিল,—অসত্য বহির হইয়া পড়িল। একজন পাশ্চাত্য,পণ্ডিত বলিয়া দিলেন,—না, না, হিন্দু মতই সর্ব্বত্র সমীচীন,—রসায়নোক্ত মূল ভূত সকল যে এক অদ্বিতীয় ভূতের পরিণাম মাত্র, বিজ্ঞানের এই কল্পনা একদিন সত্যে পরিণত হইবে। * বিজ্ঞানের এই কল্পনা বৈজ্ঞানিক-প্রবর সার উইলিয়ম ক্রুক্স মহোদয় অতি অদ্ভুত প্রতিভাবলে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রসায়নোক্ত ছাপ্পান্নটি মূলভূত (Elements) প্রকৃত প্রস্তাবে এক অদ্বিতীয় মূল ভূতেরই পরিণতি মাত্র। রাসায়নিক এত

* World Life p. 48.

দিন যাহাকে পরমাণু বলিতেন, তাহা বস্তুতঃ পরমাণু নহে। তাহা এই মূল মহাভূতের (ক্রুক্স্ যাহার নামকরণ করিয়াছেন Protyle) পরমাণু পুঞ্জের সংহননজনিত ফলভূতি। ফলকথা,—চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, গ্রহ নক্ষত্র যাহা কিছু বল,—সকলই সেই এক মূলা প্রকৃতির সূক্ষ্মতমা শক্তি। সমস্ত দেবতার কথা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতে গেলে, বড় অধিক বিষয় বলিতে হয়,—আর প্রত্যেক শক্তি-তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতাও আমাদের অতিশয় অল্প। মোটের উপরে, দেবতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে চিন্তার পথ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে,—শক্তি তত্ত্ব চিন্তনীয়; অতএব, সেই সূত্র ধরিয়া দেবতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, সকলেরই মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

সূর্য্যদেবতা সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে,—কিন্তু তুমি বোধ হয়, অবগত আছ যে, আমাদের এই পৃথিবী সৌর মণ্ডলের একটি অনতিবৃহৎ গ্রহমাত্র। অর্থাৎ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যে সকল গ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, পৃথিবী তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর ভ্রাতৃস্থানীয় আরও সাত আটটি গ্রহ আছে,—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি। কোন কোন গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে; যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। কে বলিবে, এই সকল গ্রহ উপগ্রহ, সজীব প্রাণীবৃন্দের আবাসভূমি নহে? খুব সম্ভব, ঐ গ্রহ উপগ্রহে নানাশ্রেণীর জীব জন্তুর সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে প্রভেদ। সম্ভবতঃ তাহারা সম্পূর্ণই বিভিন্ন। অতএব, পৃথিবীর বৈচিত্র্যের সহিত যদি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বৈচিত্র্য একযোগে ভাবা যায়, তবে তাহা কতই সুবিশাল হইয়া পড়ে।

সূর্য্য বলিতে যিনি জগৎ সংসার সমস্ত প্রসব করেন। এই জন্য সূর্য্যকে সবিতা ও ভর্গ কহে। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা সূর্য্যের বাহ্যাংশ,—বাহ্যাংশ জড়েরই প্রতিরূপ বলিয়া জড়চক্ষুতে

প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু হিন্দু, যোগের সূক্ষ্মচক্ষুতে দর্শন করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা কতকটা এই প্রকারে বুঝা যাইতে পারে।

সূর্য্যের ভাব ও তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥
হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেব বাহ্য সূর্য্যস্ত চান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকেতৌ চ জ্যোতিশ্চিত্রকরঞ্চ যৎ ॥
প্রাণিনাং হৃদয়ে জীবরূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি।
স এব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপয়া বিদ্যতে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

যে জ্যোতির প্রভায় সমস্ত তামসিকভাব দূর হয়, সেই সকল জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ বস্তু তাঁহাকে আদিত্যের অন্তর্গত বলিয়া ভাবিতে হয়; তিনিই সকল জীব-জগতের হৃদয়-আকাশে চেতয়িতা হইয়া বাস করেন। বাহ্য সূর্য্যের অন্তরে যে জ্যোতিঃ আকাশে প্রকাশ হয়, সেই জ্যোতিঃ, হৃদয়-আকাশে জীবের অন্তরেও প্রকাশিত থাকে। তাঁহারই জ্যোতিঃ, কি অগ্নি, কি ধূমকেতু, কি নক্ষত্রাদিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। যে ভর্গ দেবতা প্রাণিগণের হৃদয়ে জীবরূপে অর্থাৎ চেতয়িতা রূপে আছেন, তিনিই বাহ্য জগতের অন্তরে বিরাট্ পুরুষরূপে থাকিয়া জগতকে সচেতন করেন।

সূর্য্যের ধ্যান এই প্রকারেই হইয়া থাকে। এই ধ্যান যে, কোন জড়বস্তুকে লক্ষ্য করে নাই, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। জ্যোতিঃ বলিতে অগ্নির দীপ্তি বলিয়া বোধ হয় তুমি ভাব নাই;— যেহেতু অগ্নি প্রভৃতি হইতে আলোক প্রকাশ হইয়া যেমন জড় অন্ধকার

বিনাশ করে এবং বহুদূর বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের চৈতন্য-সত্ত্বা জগতের অচেতনত্ব বিনাশ করিয়া সচেতন করে বলিয়া তাহার নাম জ্যোতিঃ অর্থাৎ উজ্জ্বল। শাস্ত্রে আছে,—

দীপ্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রোচতে দ্যোততে দিবি।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

"যে সত্ত্বা, অনুজ্জ্বল বা অচেতন বস্তু সচেতন করে, ক্রীড়ার উপযুক্ত করে,—যাঁহার ক্ষমতায় উজ্জ্বলতা ও শোভা প্রকাশ পায়, তাহাকেই দীপ্তি বা জ্যোতিঃ কহে।"

এই তেজোরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ না বলিয়া অন্য কিছুও ভাবা যাইতে পারিত। সেই আশঙ্কা দূরীকরণ মানসে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাৎ জগদন্তে হরত্যপি।
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা॥

"যে তেজ হইতে এই জগৎ অর্থাৎ জড়ভাব শোভিত বা বর্দ্ধিত ও সচেতন হয়, এবং অন্তে হৃত হইয়া থাকে, সেই সপ্তার্চ্চি ও সপ্ত রশ্মিযুক্ত সত্ত্বা কালরূপী অগ্নির ন্যায় রূপধারণ করে।"

এই যে তেজের সপ্তার্চ্চির কথা বলা হইল, ইহাই প্লক্ষদ্বীপান্তর্গত প্লক্ষবৃক্ষস্থিত অগ্নিদেবতা। অতএব, শূন্য, অগ্নি প্রভৃতি সংজ্ঞা যে একমাত্র ব্রহ্ম বস্তু বোধক, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

প্লক্ষদ্বীপবাসিগণ সূর্য্যকে যেভাবে ধ্যান করেন, তাহা বৈদিক মন্ত্র-স্বরূপ। সামবেদে তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ঐ ব্রহ্ম ভাবীয় সূর্য্যদেবকে বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সিদ্ধি অনুভব ধর্ম্ম,—এবং সাধনাই অনুষ্ঠান ধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনি প্লক্ষবাসিজনগণের কথা উল্লেখ করিয়া গেলেন, আমি তাহা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। খুব সম্ভব, তাঁহারা সূর্য্যলোকবাসী হইতে পারেন। শাস্ত্রে তাঁহাদের এইরূপ বর্ণনা আছে,—

এই সপ্তবর্ষে সাতটি পর্ব্বত ও সাতটি নদীও আছে। ইহা চির প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বত সাতটির নাম,—মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমালা। নদী সমূহের মধ্যে অরুণা, নৃমনা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা এই সাতটি প্রধানা।

এই স্থানেও বাহ্যজগতের স্তরে চারিবর্ণের বাস আছে। হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধনয়ন ও সত্যাঙ্গ ঐ চারিটিবর্ণের নাম। উহারা সকলেই দেবতার ন্যায় সুদৃশ্য ও সহস্রায়ু;—তাঁহারা সকলেই নদীতে স্নান ও উহাদের জলস্পর্শ করিয়া রজো ও তমোগুণ বর্জ্জিত হইয়া পবিত্র থাকেন। তাঁহারা স্বর্গবাসীর সমান হইয়াও সর্ব্বদা ব্রহ্মবিদ্যাময় হইয়া বেদের অনুষ্ঠাতা আত্মারূপী সূর্য্যকে উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই প্লক্ষাদি পঞ্চবর্ষে যাঁহারা বাস করেন, সেই পুরুষগণের আয়ু অতি দীর্ঘস্থায়ী। স্বাধীন ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বিষয়-সম্পর্কহীন। তাঁহাদের মনের বল, দেহের বল, ও ধৈর্য্যবল এবং বুদ্ধি ও বীর্য্য অতিশয় তীক্ষ্ণ। বিশেষতঃ অণিমাদি সিদ্ধি সমূহ তাঁহাদের অন্তরে স্বভাবতঃ অকুণ্ঠিতভাবে বর্ত্তমান আছে। *

শাস্ত্রের মতে চন্দ্রলোকেও বাহ্যজগতের ন্যায় চারিবর্ণের লোক বাস করেন। তাঁহাদের ঐ চারিবর্ণের নাম যথা,—শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর

* শ্রীমদ্ভাগবত ; পঞ্চম স্কন্ধ।

এবং ইষুন্ধর। এই চারিশ্রেণীর প্রজাই যিনি আত্মা বা বেদময় চন্দ্ররূপী ব্রহ্ম; তাঁহাকে ধ্যান করেন।

তাঁহারা যে মন্ত্রে চন্দ্রের উপাসনা করেন, তাহা এইরূপ,—

"যিনি আপনার রশ্মি-তেজে কৃষ্ণ ও শুক্ল সময় প্রকাশ করিয়া দেবগণের ও পিতৃগণের তর্পণের বা অন্নদানের সময় স্থির করিয়া দিয়াছেন, সেই সোমদেব আমাদের ন্যায় সকল প্রজার রাজা হউন।"

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন, বাহ্যজগতের ন্যায় জীবের হৃদয়ে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে সমস্ত দেবতাই বর্ত্তমান আছেন,—জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহারা আছেন। চন্দ্র-সূর্য্যাদি দেবতা কি ভাবে জীবদেহের কোথায় কোথায় অবস্থিত আছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। দেহমধ্যে যে ছয়টি চক্র বা পথ আছে, তাহার মূলাধার চক্রকে শাস্ত্রে জম্বুদ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর মণিপুর চক্রকে প্রাগুক্ত প্লক্ষদ্বীপ বলা হইয়াছে। মণিপুর চক্রে অগ্নির বাস। যথা,—

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদল বিলসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে।
নীলাম্ভোজ প্রকাশৈরূপকৃতজঠরে ডাদিকান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ॥
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহির সমং মণ্ডলং তৎত্রিকোণং।
তদ্বাহ্যে স্বস্তিক্যাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলষিতং তত্র বহ্নেঃ সবীজং॥

"মূলাধারাদির ঊর্দ্ধে নাভিমূলে একটি পথ আছে, তাহার দশটি পত্র ঘনমেঘের ন্যায় নীলবর্ণ; ঐ দশপত্র জঠরের উপকার সাধন করে। পত্রগুলির ড-কার হইতে ফ-কার পর্য্যন্ত চন্দ্রবিন্দু সংযুক্তবর্ণে নামকরণ করা হইয়াছে। তথায় ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিদেবকে ধ্যান করিবে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের স্বস্তিকাদি-ক্রমে তিনটি দ্বার আছে।"

মণিপুর নামক যে দেহাংশের কথা বলা হইল ; উহার দশপত্র দশটি প্রাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঐ স্থান হইতে তেজ প্রাণাদির চেষ্টা মতে দেহের সর্ব্বত্র সক্রিয়া হয়। ঐ তিন দ্বারের মধ্যে একটিতে রস গ্রহণ, একটিতে রসাদির সঞ্চরণ, আর একটিতে মলমূত্রাদির বিকারের নিঃসরণ হইয়া থাকে।

যে প্লক্ষদ্বীপের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহা উদরস্থ বৃহৎ নাড়ী। ঐ নাড়ীর শাখা প্রশাখা আছে ;—তাহারা রস রক্ত লইয়া দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দেয়। জীবদেহের কণ্ঠ স্থানকে প্লক্ষদ্বীপ বলা হয়। তন্ত্রে উহার নাম বিশুদ্ধ চক্র। ঐ স্থানে যে সকল শক্তি ও চৈতন্য বর্ত্তমান আছে, সাধকের পক্ষে তাহা মোক্ষ প্রদানকারী, এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেককারী। অধো হইতে সমস্ত স্থান জয় করিয়া মনকে ভাবের প্রকাশক বিশুদ্ধ চক্রস্থানে আনিয়া বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন ; এই জন্য এই স্থানের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল নদী ও পর্ব্বতাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহারা চৈতন্যবহা নাড়ী। শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

> সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা।
> শরান্ চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ ॥
> সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং।
> মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতং শীলশুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ॥

কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে—সুধাসাগরের ন্যায় অতি বিশুদ্ধাপীতবস্ত্রা শাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার চারি হাতে শর, ধনু, পাশ এবং অঙ্কুশ আছে। সেই পদ্ম-কর্ণিকার মধ্যে শশচিহ্ন শূন্য অর্থাৎ অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সুধাংশু বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। যোগিগণ এই স্থানকে মোক্ষের দ্বার বলিয়া অবগত হয়েন।

সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া ক্ষয় ও বর্দ্ধন করেন; চন্দ্র তাহাদের অভাব পূরণ করেন। এই বিশুদ্ধ চক্রস্থ শাকিনীশক্তি জীবের কুভাব দমনার্থ সশস্ত্রে বিরাজমানা,—আর চন্দ্রের গলিত সুধা, তাঁহার ভাবের পরিপুষ্টি করিতেছে। এই চক্রে রশ্মি পূর্ণতা সাধন করে বলিয়া যাঁহারা ভাবের সাধক, তাঁহারা পূর্ণিমায় অর্থাৎ ভাবের পূর্ণ বিকাশে দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, আর কৃষ্ণা তিথিতে যখন ভাবের হ্রাস হয়, তখনই পিতৃগণের কৃপা ভিক্ষার্থে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। মাতৃ-পিতৃ স্বরূপশক্তি সনাতনী কালীর পূজা তাই অমাবস্থায় হইয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রহ, নক্ষত্র ও অষ্টবসু প্রভৃতি।

শিষ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে গ্রহগণ অচেতন জড়পিণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে সেই গ্রহগণ চৈতন্য-সত্বাপূর্ণ ও মানবের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—ইহার তাৎপর্য্য কি, আমি বুঝিতে পারি না।

গুরু। জগতে জড় বলিয়া যাহা আছে, তাহাও চৈতন্যসত্বা বিহীন নহে। চৈতন্যসত্বা বিহীন হইলে, তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিবর্ত্তন বাদটা আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। কেন না, ক্রমবিবর্ত্তন জড়ের হইবার সম্ভব নাই,—জড়ের কোন ক্রিয়া নাই। ক্রিয়াশূন্যতাইত জড়! জড়ের মধ্যেও চৈতন্য-সত্বা থাকে, তবে কোথাও কম, কোথাও অধিক।

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানবাদিগণ জড়তত্বের আলোচনা করিয়া, জড়-

তত্ত্বেরই কিয়ৎপরিমাণে অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন,—সূক্ষ্মের বা চৈতন্যের অনুসন্ধান কিছুমাত্রই প্রাপ্ত হযেন নাই। সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক যোগী না হইলে এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধান মিলে না।

তুমি কি মনে কর যে, কবে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হইবে, কোন্ দণ্ডে কোন্ মুহূর্ত্তে গ্রহণ হইবে—এবং কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ দিকে কিরূপ গ্রাস হইয়া মোক্ষ হইবে, ইহা যাঁহারা বিজ্ঞানবলে প্রথমাবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছিলেন,—তাঁহারাই আবার এতদূর ভ্রান্ত ছিলেন যে, মিছামিছি গ্রহগণের ক্রিয়াশক্তি বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন? তোমার আমার বা রামা শ্যামা কিম্বা ইক্রে পিক্রে ইহাদের মস্তিষ্ক হইতে যে, তাঁহাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই!

গ্রহগণ যত দূরদেশে এবং যে ভাবেই অবস্থান করুন,—যে অনন্ত ব্যোম সকলের সবকেই নিকটবর্ত্তী করিয়া দূরত্ব নাশ করিয়া থাকে, সেই ব্যোমতত্ত্ব এখানেও আমাদের ভাগ্যে গ্রহগণের দূরত্ব-বহুত্ব বিনষ্ট করিয়া দেয়। আর যেমন জড় জগতে জড়াধিষ্ঠিত দেবশক্তি অপরিবর্ত্তনশীলনিয়মক্রমে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, গ্রহাধিষ্ঠাতৃদেবতাগণও তদ্রূপ মানব-ভাগ্যের উপরে—তথা জড়জগতের উপর কার্য্য করিয়া চলিতেছেন।

এখনও কি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় না যে, বৃহস্পতির সঞ্চার হইলে, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে। অমাবস্যায় গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেলিয়া থাকে, সিংহরাশিতে সূর্য্যগত হইবার সময় বৃষ্টি অনিবার্য্য,—এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি বুঝিতে পারা যায় না যে, গ্রহের বাহ্যভাগ জড়পিণ্ড হইলেও তাহার অন্তরে চৈতন্য-সত্ত্বা কার্য্য করিয়া থাকে, অথবা জগতে আপন আপন শক্তি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

প্রাকৃত জগতে যেমন গ্রহের শক্তি প্রকাশ; মানব-ভাগ্যেও তদ্রূপ

গ্রহ-শক্তির কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন ঋতু বিশেষে বা ঋতুর পরিবর্ত্তনে বাহ্যপ্রকৃতির ভাগ্য-জীবন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তদ্রূপ গ্রহের পরিবর্ত্তনেও মানব-ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ঋতু বিশেষের পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্যপ্রকৃতির সুখ দুঃখ আসিয়া থাকে, অর্থাৎ শীতের কুহেলিকায় বিষণ্ণ-মুখী প্রকৃতি আবার বসন্তের আগমনে প্রফুল্লমুখী হয়,—এই যেমন পরিবর্ত্তন, আমাদেরও তদ্রূপ গ্রহবিশেষের পরিবর্ত্তনে সুখ দুঃখাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। যদি গ্রহের পরিবর্ত্তনেই আমাদের সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হয়, তবে কর্ম্মফলটা বাদ পড়িয়া যায়।

গুরু। কর্ম্মফল লইয়াই গ্রহ,—যাহার যেমন কর্ম্মফল, তাহার তেমনি রাশি-নক্ষত্রাদিতে জন্ম হয়;—গ্রহাদিরও সেইরূপ ভাবে সঞ্চার হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য বল, সুখ দুঃখ বল, মান অপমান বল,—সমস্তই গ্রহের ফলে। কর্ম্মফল অনুসারেই গ্রহগণ সেইরূপ অদৃষ্টাকাশে সঞ্চরণ করেন?

শিষ্য। বিরুদ্ধগ্রহের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিলে নাকি, দুঃখ বা ব্যাধি প্রভৃতির আক্রোশ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? শাস্ত্রে ঐরূপ আছে।

গুরু। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে; নিশ্চয়ই তাহা ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। আবার ভ্রমের অন্ধকারে পড়িলাম।

গুরু। কেন?

শিষ্য। যাহা কর্ম্মফলে ঘটিবে, তাহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে। ভুলিয়া যাও, ঐত দোষ। পুরুষকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে,—সেই পুরুষকারের সাধনাই দেবতা ও আরাধনা। দেবতা আরাধনায় পুরুষকার লাভ হয়, পুরুষকারের বলে

কর্ম্ম-সংস্কার বা কর্ম্মফল সম্পূর্ণরূপে না হউক, তাহার প্রবল গতিকে রুদ্ধ করা যাইতে পারে।

শিষ্য। বুঝিলাম। নক্ষত্র সকলও কি ঐ প্রকার?

গুরু। নক্ষত্রেরও অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা আছেন। শাস্ত্র-মতে তাঁহাদিগের আরাধনা করিলে, পুরুষকারের সাধনাই হইয়া থাকে।

শিষ্য। অষ্টবসু কি কি?

গুরু। দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, শম্ভু, বিভাবসু;—এই অষ্টবসু। ইহারাও জগতের ক্রিয়াশক্তি।

শিষ্য। দক্ষপ্রজাপতি হইতে দেবতাগণের উৎপত্তি। দক্ষপ্রজাপতি কি,—আর তাঁহার দ্বারা কি প্রকারেই বা দেববংশের উৎপত্তি হইয়াছে,—তাহার তাৎপর্য্যই বা কি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা বলুন।

গুরু। সমস্ত দেবতার কথা বিষদভাবে আলোচনা করিতে গেলে, অনেক সময়ের কাজ, সন্দেহ নাই। তবে মোটামুটি কতকগুলি জানিয়া রাখিতে চেষ্টা কর,—সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া অন্যান্য দেবতাতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা নিজে করিও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দক্ষপ্রজাপতি ও তদ্বংশ।

শিষ্য। দক্ষপ্রজাপতি ও তাঁহার সৃষ্টির বিষয়টি বর্ণনা করুন।

গুরু। ভগবান বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা করিলে যেরূপে ক্রমে ক্রমে দৈবীসৃষ্টি পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছি, তৎপরে প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রজাপতিগণের সৃষ্টি হয়,—দক্ষও একজন প্রজাপতি। দক্ষ সৃষ্টি করেন, কিন্তু কেহই সংসারে আসক্ত হয় না। সকলেই ভগবানের

উপাসনার জন্য নিষ্কাম ব্রত অবলম্বন করেন। বলা বাহুল্য, তখনও যৌন সম্বন্ধ হয় নাই। প্রজাপতি যাঁহাদিগকে সৃজন করিতেছিলেন, মানসেই তাঁহারা সৃষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টপুত্রাদিকে সংসারে আসক্ত করিতে না পারায় প্রজাপতি দক্ষ চিন্তাকুলিত হইলেন,—এবং কি প্রকারে সৃষ্ট প্রজাগণকে সংসারে আসক্তির বাঁধনে বাঁধা যাইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য এবং সেই ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা।

দক্ষের তপঃপ্রভাবে ও স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—"হে প্রচেতানন্দন দক্ষ! তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছ; অতএব তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি প্রজাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছ; তাহাতে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। প্রজার বৃদ্ধি হয়, ইহা আমারও ইচ্ছা। ব্রহ্মা, ভব, তোমরা, মনুগণ ও প্রধান প্রধান দেবগণ আমার বিভূতি। তোমরা প্রাণীদিগের উৎপত্তির কারণ;—তপস্যা আমার হৃদয়, বিদ্যা (মন্ত্র জপ) আমার দেহ, ক্রিয়া আমার আকৃতি, সুসিদ্ধ যজ্ঞ সকল আমার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, ধর্ম্ম আমার মন, এবং যজ্ঞভোজী দেবগণ আমার প্রাণ। সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বত্র আমিই চিৎস্বরূপে বর্ত্তমান ছিলাম। আমিই গৃহ্য, এবং আমিই গ্রাহক ছিলাম। আমা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তৎকালে আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি প্রকাশ পায় নাই;—সুতরাং আমি, যেন নিদ্রিত ছিলাম। আমি নিজে অনন্ত, এবং আমার গুণও অনন্ত গুণের সাহচর্য্যে আমার যে গুণময় শরীর হইয়াছিল, সেই শরীরই আদ্য, জন্মরহিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। আমার বীর্য্য-সম্ভূত সেই দেব-দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে গিয়া যখন আপনাকে সেই বিষয়ে অসমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন আমি উঁহাকে বলিয়াছিলাম, তপস্যা কর। বিভু, সেই তপস্যা দ্বারাই

তোমাদের নয় জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করেন। হে দক্ষ! পঞ্চজন নামক প্রজাপতির অসিক্লী নামে এক পরমা রূপবতী দুহিতা আছে; তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভার্য্যা কর। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর রমণেচ্ছারূপ ধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম;—সেই রমণীরও ধর্ম্ম। অতএব তুমি তাহার গর্ভে অনেক সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে। যৌন সম্বন্ধে উদ্ভূত বলিয়া এবং আমার মায়া হেতু তাহারা স্ত্রী-পুরুষে সংযুক্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং আমার পূজা করিবে।

বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি, এই কথা বলিয়া স্বপ্নানুভূত বিষয়ের ন্যায় দক্ষের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

শক্তিশালী দক্ষ, হরির মায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া সেই পঞ্চজন-নন্দিনীর গর্ভে হর্য্যশ্ব নামক দশ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহার ও অযুত পুত্রের সকলেরই স্বভাব ও ধর্ম্ম একই প্রকারের হইল। তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। সেই স্থানে নারায়ণ-সরঃ নামে এক প্রধান তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ সিন্ধু সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। বহু তপস্বী মুনি ও সিদ্ধগণ তথায় বাস করেন। উহার জলস্পর্শ করিবামাত্র দক্ষের তনয়গণের চিত্ত হইতে রাগাদি মল ধৌত হইয়া গেল; এবং পরমহংসীয় ধর্ম্মে তাঁহাদিগের মতি হইল। তাঁহারা পিতার আজ্ঞানুসারে প্রজাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও আসনাদি জয় করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা এইরূপে তপস্যা করিতেছেন। দেখিয়া ঋষি কহিলেন, হে হর্য্যশ্বগণ! তোমরা পাবক বট, কিন্তু পৃথিবীর অন্ত দর্শন কর নাই, সুতরাং অজ্ঞ; অতএব কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে? তোমরা পণ্ডিত বট, কিন্তু এক রাজ্যে আছে, যাহাতে

একমাত্র পুরুষ; এক বিল আছে, যাহা হইতে কাহাকেও বহির্গত হইতে দেখা যায় নাই; এক স্ত্রী আছে, যাহার নানাবিধ রূপ; এক পুরুষ আছেন, যিনি পুংশ্চলীর স্বামী; এক নদী আছে, যাহার উভয় দিকই প্রবাহিত; এক গৃহ আছে, যাহা পঞ্চবিংশতি পদার্থে বিনির্ম্মিত; এক হংস আছে, যে সুমধুর ধ্বনি করে; এবং এক বস্তু আছে, যাহা বজ্র ও ক্ষুর দ্বারা বিরচিত ও স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা এই সকল দর্শন কর নাই, আর—তোমাদিগের পিতার আজ্ঞা তোমাদের কর্ত্তব্য কি না, তাহাও জ্ঞাত নহ। অতএব, কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবে?

হর্য্যশ্বগণ দেবর্ষির এই কূটবাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বভাবতঃ বিচার-শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা আপনাআপনিই অর্থ বিচার করিতে লাগিলেন;—জীব নামক অনাদি লিঙ্গ শরীরই পৃথিবী; তাহার "অন্ত" অর্থাৎ নাশ না দেখিয়া মোক্ষের অনুপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর একমাত্র; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের শ্রেষ্ঠ; এবং আপনাতেই অবস্থিত। পুরুষ সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার কোনটিই ঈশ্বরে সমর্পিত নহে; অতএব সে সকল কর্ম্মে কি হইবে? যেরূপ পাতালে প্রবেশ করিলে, বহির্গত হওয়া যায় না, সেইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না; পুরুষ সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশায় যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকল কার্য্যের কি ফল দেখিবে? পুরুষের নিজ নিজ বুদ্ধি রজঃ প্রভৃতি গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট। উহা পুংশ্চলীর ন্যায় পুরুষের মোহ উৎপাদন করে। পুরুষ উহার অন্ত না জানিয়া যে সকল নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কি ফল দর্শিবে? যেরূপ দুষ্টা ভার্য্যাকে বিবাহ করিয়া পুরুষের স্বাধীনতা নষ্ট

হয়, সেইরূপ বুদ্ধির সংসর্গে জীবের স্বাতন্ত্র্য দূরীভূত হয়। তিনি তখন বুদ্ধির অবস্থাভূত সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। পুরুষ এই জীবকে জানিতে না পারিয়া যে সকল কার্য্য করে, সে সমুদয় বুদ্ধির বিচার করিয়া করা হয় না; অতএব সে কর্ম্মে কি ফল দর্শিবে? উৎপত্তি ও ধ্বংসকারী মায়াই নদী। জলপতিত ব্যক্তি যে স্থান দিয়া উত্থান করিবে, সেই স্থানেই নদীর বেগ অধিক। মানুষ ঐ নদীতে মগ্ন; সুতরাং বিবশ হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে।—সে সমুদয়ই মায়াময়। সে কর্ম্মে কি হইবে? অন্তর্য্যামী পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অদ্ভুত আশ্রয়। মানুষ সেই কার্য্য-কারণের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে না জানিয়া বৃথা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর প্রতিপাদক জ্ঞান ঘন বস্তুর প্রকাশক এবং মোক্ষও বন্ধনের উপদেশক শাস্ত্র না জানিয়া মানুষ যে সকল কার্য্য করে, সে সমুদয়ই বাহ্যিক; তাদৃশ কর্ম্মে কি হইতে পারে? ভ্রমণশীল তীক্ষ্ণ কালচক্র সর্ব্বজগৎ আকর্ষণ করিয়া স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছে; এই চক্রকে না জানিয়া পুরুষ যে সকল কার্য্য করে, সে সকল কেবল কর্ম্ম করিব বলিয়াই করা হয়; অতএব তাহার কি ফল হইবে? শাস্ত্রই আমাদিগের পিতা; কর্ম্ম করিতে নিষেধ করাই তাঁহার আজ্ঞা। যে ব্যক্তি সেই আজ্ঞা না জানিয়া গুণ-ময় প্রবৃত্তি-মার্গে রত হয়, সে কিরূপে আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে?

হর্য্যশ্বগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ঐক্যমত অবলম্বন পূর্ব্বক নারদকে প্রদক্ষিণ করতঃ সেই পথে গমন করিলেন,—যে পথে গেলে আর ফিরিতে হয় না। ঋষিও হরি-পাদপদ্ম-গুণগানে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদীয় সঙ্গীতে কেশবের চরণাম্বুজ যেন সাক্ষাৎ প্রকাশিত হইল।

এদিকে নারদ হইতে সৎপুত্রগণের বিনাশ হইয়াছে, শ্রবণ করতঃ দক্ষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ব্রহ্মার অনুমোদনে সৃষ্টি কামনায় পুনর্ব্বার পঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্বনাম সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

তাঁহারা পিতৃ-আদেশ মতে ব্রতধারী হইয়া নারায়ণ সরোবরে তপস্যার্থ গমন করিলেন। তীর্থ-জলস্পর্শে পবিত্রচিত্ত ও প্রজাকামী হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে নারদ তথায় আগমন করতঃ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকেও নিষ্কাম পথে লইয়া যোগমার্গে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করাইলেন। সবলাশ্বগণ জ্যেষ্ঠেরা যে সমীচীন ও প্রত্যক্‌বৃত্তি * লভ্য পথে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই পথে গমন করিলেন।

এই পুত্রগণের দ্বারাও প্রজা হইল না এবং নারদ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া দক্ষ নারদকে যথোচিত ভৎসনা করিলেন ও সৃষ্টি-কার্য্য বিষয়ে হতাশ হইয়া ব্রহ্মার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি কতকগুলি কন্যার জন্ম প্রদান কর। সেই কন্যাগণের বাহু-জালে দেবতাগণকে বাঁধিয়া তাহাদিগের দ্বারা যে সকল শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহারা মানুষকে রমণীর মুখসুধায় বাঁধিয়া ফেলিবে। এতদ্ভিন্ন প্রজা সৃষ্টির আর অন্য উপায় দেখা যাইতেছে না।

অতঃপর প্রচেতা-নন্দন দক্ষ ব্রহ্মার পরামর্শ মতে অসিক্লীনাম্নী ভার্য্যার উদরে ষষ্টিকন্যার উৎপাদন করেন। কন্যাগণ সকলেই দেবতাকে ভাল বাসিতেন। দক্ষ, ঐ ষষ্টি কন্যার মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, ভূতকে দুই, অঙ্গিরাকে দুই, কৃশাশ্বকে দুই এবং তার্ক্ষ্যকে অবশিষ্ট চারি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

* যোগ প্রভেদ,—অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ।

এই কন্যাগণে আসক্ত হইয়া দেবতাগণ যে সকল সন্তান উৎপাদন করিলেন, তাহারা আবার রমণীর রূপের আসক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল, ক্রমে আসক্তিতে জগৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তোমাকে বলাই বাহুল্য যে, এই বংশ সমস্তই প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের বিস্তৃতি। এই শক্তি-সাহচর্য্যে জগতের কামনা বাসনা এবং আসক্তি। দক্ষ, রজোগুণের আদর্শ কর্ম্মাভিমানী শক্তিস্বরূপ। সেই দক্ষ হইতে সত্ত্বারূপে যে সকল পুত্রাদির উৎপত্তি হইল, তাহারা শক্তি-সংযোগ ব্যতীত কার্য্যকর হইতে পারে না,—এই জন্য নিষ্কাম পথ দেখান হইল। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, শক্তিব্যতীত কোন সত্ত্বার ক্রিয়া হয় না। তাহারা প্রকাশ মাত্রেই—নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে।

উপাখ্যানছলে এস্থলে দেখান হইল যে, দক্ষের মত কর্ম্মাসক্তের পুত্রও যদি নিষ্কামভাব অবলম্বন করে এবং সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হয়, তবে কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম পথ অবলম্বন করিতে পারে। এই সত্ত্বাস্বরূপ পুত্রগণের কর্ম্মে সংযোগ হইল না বলিয়া, আসক্তি স্বরূপা কন্যাগণের উৎপত্তি, বাস্তবিক কামিনীগণই জীবকে বাঁধিবার মুখ্য অস্ত্র স্বরূপা।

এক্ষণে সেই আসক্তিরূপিণী শক্তিগণ ধর্ম্ম, কশ্যপ, চন্দ্র, ভূত, অঙ্গিরা কৃশাশ্ব এবং তার্ক্ষ্য নামক ছয় প্রজাপতি অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গের ছয় অধ্যাত্মস্বভাবকে দান করিলেন। অর্থাৎ কর্ম্মাসক্তিগণের সহিত উক্ত ছয় কর্ম্ম স্বভাবের মিলন করাইলেন। ঐ কন্যা রূপিণী আসক্তিগণের মধ্যে দশটি প্রধান আসক্তির সংযোগ হয়। ঐ দশ প্রবৃত্তির শক্তির সহিত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম জীব জগতে আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের প্রকাশ করিতে থাকিলেন।

ধর্ম্ম ব'লতে এখানে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রথম পত্নীর নাম ভানু,—ভানুকে বিজ্ঞান-শক্তি বলে। সেই বিজ্ঞান শক্তি হইতে ঋষভদেব বা সত্য প্রকাশক জ্ঞানের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে ইন্দ্রাসন বা ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের উৎপত্তি হয়। *

আকর্ষণ শক্তিকে লম্বা বলা হইয়াছে। ঐ আকর্ষণ বিকর্ষণ হইতে ভূত জগতের ক্রিয়া স্বরূপ বিদ্যোত অর্থাৎ আলোক নামক অধ্যাত্মতেজের উদ্ভব। বিদ্যোত অর্থে, যে শক্তি ভৌতিক আকর্ষণাদিতে সক্রিয়,—যাহাকে তাড়িৎ শক্তি বলে। উহা হইতে স্তনয়িত্নু বা বিদ্যুৎ অথবা ঘর্ষণাগ্নির জন্ম। ধর্ম্মের তৃতীয় পত্নী ককুদের সহযোগে কীকট এবং তাহা হইতে দুর্গাভিমান দেবতা, এবং যামার সংযোগে স্বর্গ ও নন্দী প্রভৃতির জন্ম হয়। ককুদ শব্দে আনন্দদাত্রী বা আনন্দ-শক্তি সেই আনন্দ-শক্তি হইতে সংসার-দুর্গের কার্য্য শক্তি স্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তি। যামা শব্দে নিবৃত্তি শক্তি,—তাহা হইতে স্বর্গ অর্থাৎ পুণ্য এবং নন্দী অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ হয়। বিশ্বা শব্দে উদ্ভব শক্তি। উদ্ভব শক্তির সংযোগে সমস্ত জীবৌষধির উদ্ভবের ক্ষমতা লাভ হয়। এই দেবতাদের অনুভবের জন্য প্রতি যজ্ঞাদি কার্য্যে ইঁহাদের নাম শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে।

সাধ্যানাম্নী ধর্ম্মকন্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধনা। তাহা হইতে সাধনোপায় স্বরূপ সাধ্য দেবতাগণের উৎপত্তি। ঐ সাধনোপায় হইতে আট (ফল) এবং সিদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে। মরুত্বতী শব্দে যজ্ঞবিস্তার কারিণী শক্তি অর্থাৎ সাধু ইচ্ছা। তাহা হইতে যজ্ঞদেবতা বা মরুত্বান্-গণের (সাধুসঙ্কল্পের) এবং জয়ন্তের (বৈরাগ্যের) উৎপত্তি হইয়াছে।

* ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মহাভারতের আদিপর্ব্বের নীলকণ্ঠের টীকায় সমালোচিত হইয়াছে।

এই বৈরাগ্যই মুক্তিদাতা। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে শক্তি জীবের মনোগতির চালনা করে, তাহার নাম মুহূর্ত্তা,—তিনিও ধর্ম্মের পত্নী। তাহা হইতে কর্ম্মফল বা সংস্কার লাভ হয়। সংকল্প অর্থে, জীবের বাসনা। তাহা হইতে সংকল্পের প্রকাশ। সংকল্প হইতে কাম বা বাসনার জন্ম। বসু শব্দে মঙ্গল। ধর্ম্মের বসু নাম্নী পত্নী হইতে আটটি মঙ্গলবৃত্তি—যাহাদের দ্বারা সংসারের আহারাদি পঞ্চস্বভাবের উদয় হয়,—তাহাদের প্রকাশ হইয়াছিল। এই অষ্ট বসুর শক্তি সংযোগে যে সকল বৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাহা জীবের কল্যাণদ শক্তি।

ধর্ম্মপত্নী স্বরূপা বসু নাম্নী আধ্যাত্মিক ক্রিয়া প্রকাশিকা শক্তি হইতে অষ্টবসু স্বরূপ প্রাণিবৃত্তির প্রকাশ হয়। যে সকল শক্তি-বৃত্তি দ্বারা জীবের সূক্ষ্ম দেহ কর্ম্মময় থাকে, তাহারাই অষ্টবসু নামে পুরাণে কথিত হইয়াছে। মন-প্রধান-ক্রিয়া-শক্তির নাম দ্রোণ;—অভিমান, সেই দ্রোণ শক্তি হইতে জীবদেহে প্রকাশিত হয়। অভিমান হইতেই জীবের মনে কখনও আনন্দ, কখনও দুঃখ, কখনও ভয় এবং কখনও দ্বেষের উদয় হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে ভৌতিক অভাব পূরণার্থে যে শক্তি বর্ত্তমান থাকে তাহাকে প্রাণ বলে। ঐ প্রাণ উর্জ্জস্বতী তেজের সহিত মিলিত হইয়া সহ্য, আয়ু ও পুরোজব বা সাহসের উৎপাদন করে। বুদ্ধির সহিত মনের সম্মিলন-শক্তিকে ধ্রুব বা নিশ্চয়তা কহে। কেহ কেহ বিবেকও বলেন। নিশ্চয়তা ধরণী পৃথ্বীশক্তির সহিত মিলিয়া বাসনা-মতে জীবের বহুরূপী দেহ প্রকাশ করে।

অর্থ শব্দে সংস্কার বুঝায়;—তাহা হইতে বাসনার প্রকাশ হয়। বাসনা হইতে অভিলাষ বা তৃষ্ণাদির এবং ভোগাদির উদয় হইয়া থাকে। জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়া থাকে। ধরা অর্থে বিচার শক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে। অগ্নি ও ধরার সংযোগে দ্রবিণ অর্থাৎ ভোগ ও স্কন্দ

বা কার্য্যের প্রকাশ হয়। ঐ স্কন্ধ হইতে বিশাখাদি নক্ষত্রের উৎপত্তি বলিতে দেহের প্রাণ বৃদ্ধি নক্ষত্রানুসারে উপস্থিত হয়। দোষ শব্দে বিজ্ঞান ব্যবস্থা ;—তাহা হইতে ভক্তিরূপী শর্ব্বরী এবং এতদুভয়ের সংযোগে ভাবতত্ত্বরূপা শিশু মদনের উদ্ভব। বস্তু বলিতে চিরসঞ্চিত কর্ম্ম। তাহাতে আঙ্গিরসী অর্থাৎ অনুষ্ঠান সংযুক্ত হইলে, স্মৃতি-ক্ষমতা স্বরূপ বা স্বভাব-ক্ষমতা স্বরূপ বিশ্বকর্ম্মার উদ্ভব হয়। এই স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে চাক্ষুষ মন্বন্তরের অধিপতি মনু, বিদ্যা ও বুদ্ধি সহযোগে প্রকাশ হয়েন।

বিভাবসু বলিতে সূর্য্যের স্বপ্নপতেজ,—তাহার প্রথম উষা সম্মিলন হইতে ব্যুষ্ট প্রাতঃ, রোচিষ, অপরাহ্ন এবং আতপ মধ্যাহ্নের প্রকাশ হয়। ঐ আতপ হইতে পঞ্চযামী দিবাভাগের উদয় হয়। পঞ্চযাম বলিতে প্রত্যূষ, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, ও প্রদোষ, এই পঞ্চযামেই জীবগণ নিজ নিজ অদৃষ্ট কর্ম্ম করিতে জাগ্রত থাকে।

এইরূপে জগতের সূক্ষ্ম সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাকেই দৈবীসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। ইহার পরে, অন্যান্য সৃষ্টির কথা যাহা বলা হইল,—তাহা ক্রমে স্থূল সৃষ্টি। সময়াল্পতা প্রযুক্ত সে সকলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা অতিশয় অসম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দুর্গাশক্তি।

শিষ্য। দেবতা-তত্ত্ব কতকটা আপনার কৃপায় বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আপনি যে সকল দেবতার কথা বলিলেন, তাহা সূক্ষ্ম দেবশক্তিই বটে,—আমরা নিত্য যে সকল দেবতার পূজা করিয়া থাকি, যাঁহাদিগের পূজোৎসবে সমগ্র হিন্দু এক প্রাণে, এক মনে, এক কার্য্যে ব্রতী হয়, আমাকে সেই দেব-দেবী তত্ত্ব একটু বুঝাইয়া দিন। যে সকল দেবতার আমরা মুর্ত্তি গড়াইয়া বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া গোছাইয়া পূজা করিয়া থাকি;—যে সকল দেবতার প্রতিমা দেখিয়া বিধর্ম্মিগণ আমাদিগের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা (Idolatry) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন,—সেই সকল দেব-প্রতিমা সম্বন্ধে আমি কিছু শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। বিদেশীয় বিধর্ম্মিগণ হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও হিন্দুধর্ম্মের

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই ঐরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন! হিন্দুদিগের (Idolatry) নহে, উহা সূক্ষ্ম দার্শনিকের (Symbolism) বলিয়া জানিও।

শিষ্য। এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাকে আমাদের প্রচলিত পূজাপদ্ধতির অন্তর্গত দেবদেবীর আধ্যাত্মিকতা বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, দেবদেবীর আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব বুঝাইতে হইবে। কলির মানবের হাতে পড়িয়া দেবদেবীর আরও কতরূপে বিশ্লেষণ-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। কি জানিতে চাহিতেছ বল?

শিষ্য। মনে করুন, দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসবে সমগ্র বঙ্গের সমগ্র হিন্দু এক প্রাণে এক উৎসবে মাতিয়া উঠে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয়,—সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া একটি আনন্দের তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে বহিতে থাকে,—কিন্তু আমরা জানি না,—অনেকেই জানে যে, আমরা কাহার আরাধনা কেন করিতেছি। ইহা করিলে আমাদের কি উপকার আছে। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, দুর্গা কি;—তাঁহার দশ ভুজ কেন, তিনি অসুর বিনাশে যুদ্ধে নিমগ্না কেন?

গুরু। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা শক্তি,—সেই সমষ্টি শক্তিই দশভুজা দুর্গা। দশভুজা দুর্গার উৎপত্তির উপাখ্যানটি অবগত আছ কি?

শিষ্য। ভালরূপ জানি না,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার বলুন।

গুরু। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবীর আবির্ভাব হয়। কেন ও কিরূপে তিনি আবির্ভূতা হয়েন, তাহা তোমাকে শুনাইতেছি।

মহারাজ সুরথ একদিন মহামুনি মেধসকে এই দেবীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎ স্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাংবর॥

"ভগবন্! আপনি যে মহামায়ার কথা ব্যক্ত করিলেন, সেই দেবী কে? কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি, এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি? হে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ! তাঁহার স্বভাব কিরূপ, এবং স্বরূপই বা কি? তৎ সমস্ত আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।"

সুরথ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজ্ঞাশীল ঋষি মেধস বলিলেন,—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

"সেই মহামায়া নিত্যা, তিনি বিশ্বরূপিণী। এই সমস্ত বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি লোকে তাঁহার উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকে; তাহা আবার বহু প্রকার। উহা আমি তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

"দেবগণের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থে যখন তিনি প্রকাশমানী হয়েন, তখনই লোকে তাঁহাকে "উৎপন্না" বলিয়া বর্ণনা করে, কিন্তু তিনি নিত্যা।"

শিষ্য। দেবতাগণের কার্য্য কি,—এবং দশভুজা দুর্গা তাহা কি প্রকারেই বা সিদ্ধ করিয়াছিলেন?

গুরু। দেবতা কি, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তির সংগ্রাম অনিবার্য্য; এই সংগ্রামে কখনও দেবতা জয়ী, কখনও অসুর জয়ী। যখন দেবতা পরাভূত হয়েন, তখন অসুর জয়ী হয়,—জগৎ পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ-শক্তিতে ভাসিয়া পড়ে।

দেবগণ হীনশক্তি হইয়া পড়েন,—তখন পুণ্য-শক্তি রক্ষার জন্য এই মহা-শক্তির আবির্ভাব হয়।

"পুরাকালে যখন মহিষাসুর দৈত্যদিগের অধিপতি এবং পুরন্দর নামক ইন্দ্র দেবগণের রাজা হইয়াছিলেন, তখন পূর্ণ একশত বৎসর পর্য্যন্ত দেবাসুরে সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাবীর্য্যবান্ অসুরগণ কর্তৃক দেবগণ ও দেবসৈন্য সকল পরাভূত হইলে, মহিষাসুর দেবতা-দিগকে জয় করতঃ ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ করে।

তাহাতে পরাভূত দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সহায় করিয়া তাঁহার সহিত হরি-হর সন্নিধানে গমন করেন। এবং মহিষাসুর অমরবৃন্দকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, তৎসমস্ত আনুপূর্ব্বিক হরি-হরের গোচরে নিবেদন করিলেন। সেই মহিষাসুর এক্ষণে নিজে সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতা সকলের অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন।

সেই দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক দেবগণ স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যদিগের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। আমরা সেই দেবাদির চেষ্টা-চরিত্র যথাযথ আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম, এবং প্রপন্ন হইয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। কৃপাপূর্ব্বক সেই অসুরের বধোপায় চিন্তা করুন।

দেবগণের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শিব ও বিষ্ণু, ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদের বদনমণ্ডল ভ্রূকুটি-ভঙ্গি দ্বারা কুটিল হইয়া উঠিল। তাহাতে অতিশয় কোপযুক্ত বিধি, বিষ্ণু ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ সকল নির্গত হইল।

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দেহ হইতে মহত্তেজোরাশি বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া একত্রিত হইল। তখন দেবগণ দেখিতে পাইলেন, ঐ তেজঃপুঞ্জ-

নিজশিখাদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া উঠিল।

তারপর, সেই সুরগণের শরীর বিনির্গত একত্রীভূত অনুপম তেজঃ-পুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল। আর সেই দ্যুতি দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শঙ্করের তেজ হইতে সেই স্ত্রীর মুখমণ্ডল প্রকটিত হইল। আর যমের তেজে কেশ ও বিষ্ণুর তেজে বাহুদ্বয় প্রকাশ পাইল। চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরুদেশ এবং ধরণীর তেজোদ্বারা নিতম্ব বিনির্ম্মিত হইল।

ব্রহ্মার তেজ হইতে পাদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি সকল, বসুগণের তেজ হইতে হস্তদ্বয়ের দশাঙ্গুলি ও কুবেরের তেজঃ প্রভাবে নাসিকা বিকশিত হইল। আর দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজ হইতে দশনসমূহ এবং অনলের তেজে ত্রিনয়ন উৎপন্ন হইল। সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজ হইতে কর্ণদ্বয় এবং অন্যান্য অমরবৃন্দের তেজঃপ্রভাবে শিবার অপরাপর অবয়ব সমুদয় সমুদ্ভব হয়। অনন্তর মহিষাসুর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত দেবতাগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে সমুৎপন্না দেবীকে দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন।

আর, পিনাকধারী ত্রিপুরারি শূল হইতে অন্য শূল নির্গত করতঃ সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও স্বীয় চক্র হইতে সমুৎপন্ন অন্য এক চক্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

সমুদ্র শঙ্খ এবং অগ্নি শক্তি দান করিলেন। পবনদেব ধনু ও বাণ-পূর্ণ তূণীর প্রদান করিলেন। দেবাধিপতি সহস্রলোচন ইন্দ্র, ঐরাবত হইতে ঘণ্টা, নিজ বজ্র হইতে আর এক বজ্র উৎপাদন করতঃ তাহাও দেবীকে সম্প্রদান করেন। যম কালদণ্ড ও বরুণ পাশ অস্ত্র সমর্পণ করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু প্রদান করিলেন।

দিবাকর দেবীর সমস্ত রোমকূপে আপন কিরণ দিলেন এবং কাল, খড়্গ ও নির্ম্মলচর্ম্মের বর্ম্ম দান করিলেন। ক্ষীরোদ সাগর বিমল হার, —অবিনশ্বর অম্বর, দিব্য মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সমস্ত বাহুভূষণ, কেয়ূব, নির্ম্মল নুপূরদ্বয়, উৎকৃষ্ট কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক সকল প্রদান করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা অতি নির্ম্মল কুঠার, অন্যান্য নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র সকল এবং অভেদ্য কবচ দান করিলেন। জলনিধি, শিরোদেশে ও গলদেশে অমল কমলমালা এবং সুশোভন শতদল-হার অর্পণ করিলেন। হিমালয়, বাহনের জন্য সিংহ এবং অশেষ ধনরত্ন প্রদান করিলেন ও ধনাধিপতি কুবেরও সুরাপূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন।

এই ধরণী-মণ্ডল-ধারণ-কর্ত্তা সর্ব্বনাগেশ্বর অনন্তদেব মহামণি-বিভূষিত নাগহার দান করিলেন। তখন অন্যান্য দেবগণও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও নানাপ্রকার অলঙ্কার দান দ্বারা দেবীকে সম্মানিতা করিলে, তিনি মুহু-র্মুহুঃ উচ্চনাদে অট্ট অট্ট হাস্য আরম্ভ করিলেন। দেবীর সেই মহা-ভয়ানক হাস্যরবে সমস্ত নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; এবং তাহা হইতে অতি মহান্ প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হইলে সমস্ত লোক বিচলিত হইল,—আসমুদ্র ধরাধর সহিত ধরণী-মণ্ডল কাঁপিতে লাগিল। এই মহাভীষণ-নাদিনী মহামায়া হইতে অসুরগণ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে মনে করিয়া দেবতা সকল তখন মহোল্লাসে সেই সিংহবাহিনী দেবীকে "দেবি! তোমার জয় হউক" বলিলেন,—মুনিগণ ভক্তিঅবনত কায়-মনে দেবীকে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন।'*

এই দেবী কি,—তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি? সমস্ত দেব-শক্তির সমষ্টি শক্তি। শক্তি যখন ব্যষ্টিভাবে অবস্থিত, তখনই দেবশক্তি

* মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী।

—আর সমষ্টি অবস্থাগত যখন, তখনই মহাশক্তি মহামায়া দশভুজা দুর্গা। দেবী মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

"দেবি! তুমি ভয়ঙ্করী, তুমি নিত্যা, তুমি গৌরী ও জগদ্ধাত্রী। তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যোৎস্নাদায়িনী, তুমি চন্দ্রমাশালিনী, এবং সুখ-স্বরূপা, তোমাকে বার বার নমস্কার। তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি বুদ্ধিরূপা, তুমি সিদ্ধিরূপা, নতমস্তকে আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমিই অলক্ষ্মীরূপা—আবার তুমিই রাজলক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা; অতএব হে দেবি মাহেশ্বরি! তোমাকে বার বার নমস্কার।

হে দুর্গে! তুমি নিতান্ত দুরধিগম্যা, অথচ সঙ্কটবারিণী, তুমি সারা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি সকল কারণের কারণ, অর্থাৎ সর্ব্বজননী, সুতরাং তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; এবং তুমি প্রতিষ্ঠা স্বরূপা ও তুমি কৃষ্ণবর্ণা ও কখন বা ধূম্রবর্ণা হইয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার।

হে দেবি! তুমি অতি সুন্দর হইতে পরমাসুন্দরী, আবার ভয়ঙ্করাও তুমি। অতএব, আমরা অবনতশিরে পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জগৎপ্রতিষ্ঠাকর্ত্রী, দেবরূপা এবং ক্রিয়াস্বরূপিণী, আমরা তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া অর্থাৎ মহামায়া রূপে অধিষ্ঠিতা আছেন, সেই তুমি, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই দেবী অর্থাৎ তোমাকে বার বার নমস্কার করি। যে দেবী সমস্ত প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে বিরাজমানা আছেন, সেই দেবী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যে দেবী সকল প্রাণীতে নিদ্রারূপে অধিষ্ঠিতা, সেই দেবী তুমি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতে ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে (অবিদ্যাস্বরূপে) শক্তি-রূপে ও তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা আছেন, সেই দেবী তুমি ;—তোমাকে বার বার নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বজীবে ক্ষমারূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে ও শান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমিই সেই দেবী ;—তোমাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে বিরাজমানা আছেন, সেই দেবী তুমি ;—তোমাকে বার বার নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বজীবে কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, তৃপ্তিরূপে, স্মরণশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই দেবী তুমি ;—তোমাকে বার বার নমস্কার।

যে দেবী সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে দয়ারূপে বাস করিতেছেন, তুষ্টি-রূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিরূপে অধিষ্ঠিতা আছেন, সেই দেবী তুমি ;—তোমাকে বার বার নমস্কার।

যে দেবী ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী, যাঁহার প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং যিনি পৃথিবী, সলিল, তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশেষতঃ যিনি সমস্ত প্রাণীতে ওতঃপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তুমিই সেই দেবী,—তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি নিজে জগৎ ব্যাপিয়া সমস্ত প্রাণীতে জীবাত্মারূপে বিরাজিত আছেন, সেই দেবী তুমি ; তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

শিষ্য। চৈতন্য পুরুষ ঈশ্বরই সর্ব্বজীবে সমন্বিত,—তিনিই ত্রিজগৎব্যাপ্ত, ইহাই এতদিনে ধারণা হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ বিদেশীয়গণ এই-রূপই বলেন,—এক্ষণে এই মহাশক্তিই সর্ব্বভূতে সমাশ্রিত ও জগৎ পরিচালিকা বলিয়া পরিচয় পাইতেছি। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ হয়ত, এই

* মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী।

সকল কারণেই আমাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্ব শক্তিমান্ এক ঈশ্বরের উপরে নির্ভর না করিয়া, আরও কতকগুলিকে তাঁহার অংশীদার করিয়া পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকি।

গুরু। পাশ্চাত্যগণ এখনও এ সকল তত্ত্বের অনেকদূরে অবস্থিত; তাহা তোমাকে আগেই বলিয়াছি। তাঁহারা যেখানে জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় কিছু স্থির করিতে পারেন নাই,—সেই স্থানে মহাকষ্টে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগৎকে স্থূলভাবে দেখান; সেই জন্য তাঁহার দৃষ্টি স্থূলজগতেই সীমাবদ্ধ। জগতের যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম স্তর আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। তাঁহার মতে পদার্থের ঘন (Solid), তরল (Liquid) এবং বাষ্পীয় (Gaseous) এই তিনটি অবস্থা আছে। যেমন জলের তিন অবস্থা,—বাষ্প, জল, এবং বরফ। কেহ কেহ কায়ক্লেশে আজি কালি পদার্থের আকাশীয় (Etheric) অবস্থাও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ইহার উপর আর উঠিতে প্রস্তুত নহেন বা সক্ষম নহেন। অথচ প্রাচীনেরা ক্ষিতি (Solid), অপ্ (Liquid) তেজ (Gaseous) ও মরুৎ (Etheric), পদার্থের এই চারি অবস্থার উপরে মহাব্যোমের † উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রের স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও দুইটি সূক্ষ্মতর অবস্থার উল্লেখ আছে। সেই অবস্থাদ্বয়ের নাম অনুপপাদক ও আদি। অতএব, আর্য্যঋষিদিগের মতে এই স্থূল জগতের (যাহার শাস্ত্রোক্ত নাম ভূর্লোক) পর পর সাতটি স্তর আছে। সেই স্তর কয়টির সূক্ষ্মতম হইতে যথাক্রমে নাম,—আদি, অনুপপাদক, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ ও পৃথিবী। এক এক স্তরের ভূত, এক একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব! এবং

† ব্যোমকে ইথার বলিয়া যে স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ইংরেজী মতের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য,—বস্তুতঃ ইথার মরুৎ পদার্থ।

এক একটি তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী আমাদের এক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই তত্ত্বের সংযোগে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে যে বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উদ্ভূত হয়, আমরা যথাক্রমে তাহাদের নাম দিই—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, আদি ও অনুপাদক তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয় সাধারণ মানবে নাই। এক এক তত্ত্বের উপাদানভূত পরমাণুর পারিভাষিক সংজ্ঞা "তন্মাত্র"। পার্থিব পরমাণুর নাম গন্ধতন্মাত্র, জলীয় পরমাণুর নাম রসতন্মাত্র, তৈজস পরমাণুর নাম রূপতন্মাত্র, বায়বীয় পরমাণুর নাম স্পর্শতন্মাত্র, এবং আকাশীয় পরমাণুর নাম শব্দতন্মাত্র।

এ পর্য্যন্ত গেল স্থূল জগতের কথা,—ভূর্লোকের কথা। আর্য্যঋষিরা বলেন যে, এই ভূর্লোকের পর পর আরও ছয়টি লোক আছে। তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম। এই সপ্তলোকের নাম যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। * সপ্তলোকের প্রত্যেকেই ভৌতিক উপাদানে গঠিত;—পরস্পর কেবল স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্য। প্রত্যেক লোকের আবার সাতটি করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকের সপ্তস্তরের কথা আগেই বলা হইয়াছে,—অপর ছয়লোকেরও এইরূপ সাতটি করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকের যাহা সূক্ষ্মতম স্তর—আদিতত্ত্ব, তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের (Protyle) এই প্রোটাইল সম্বন্ধে তোমাকে সকল কথা আগেই বলিয়াছি। অর্থাৎ ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব সেই জগতের পরম পরমাণু (ultimate Atom) সেই লোকের অদ্বিতীয় মহাভূত। সেই মূলতত্ত্বের সংহননেই নিম্নের অপরাপর ছয়স্তরের উপাদান গঠিত হয়। ভূর্লোকের যে আদি তত্ত্ব (Protyle), তাহাই বিচিত্ররূপে সংহত হইয়া যথাক্রমে অনুপপাদকতত্ত্ব, শব্দতন্মাত্র

* এই সপ্তলোকের কথা "জন্মান্তররহস্য" নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

(আকাশতত্ত্ব), স্পর্শতন্মাত্র (বায়ুতত্ত্ব), রূপতন্মাত্র (তেজস্তত্ত্ব), রসতন্মাত্র (অপ্‌তত্ত্ব) ও গন্ধতন্মাত্র (পৃথিবীতত্ত্ব) উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু প্রোটাইল ভুবর্লোকের আদিতত্ত্ব নহে। বস্তুতঃ ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব, ভুবর্লোকের স্থূলতম স্তর (পৃথিবীতত্ত্ব) হইতে স্থূল। ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের তুলনায় ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব পরম পরমাণু নহে; কিন্তু ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের পরমাণুপুঞ্জের সংহনন জনিত। ভুবর্লোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এইরূপ পরস্পর বিশ্লেষণ করিয়া সত্যলোকের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদিতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই আর্য্যঋষির কথিত মূল প্রকৃতি এই সর্ব্ব সূক্ষ্মতম একমেবাদ্বিতীয় মহামূলভূত পর পর স্তরে স্তরে সংহত ও পরিণত হইয়া সর্ব্বনিম্নস্তরে (ভূর্লোকে) আদিতত্ত্ব প্রোটাইলের রূপ ধারণ করে। অতএব, প্রকৃতি প্রোটাইলজাতীয় হইলেও এক পদার্থ নহে।

এই মূল প্রকৃতির নামান্তর মায়া। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।

"মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। মায়া ও প্রকৃতি এক তত্ত্বেরই নামান্তর। যাহা এ পিঠে মায়া, তাহাই ও-পিঠে প্রকৃতি। অর্থাৎ যাহা পরাক্ দৃষ্টিতে (Objective point of view হইতে) প্রকৃতি, তাহাই প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে (Subjective point of viewর হইতে) মায়া। প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় লিখিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

"এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী। গুণ বলিলে, আমরা এখন Quality বা Attribute বুঝি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ

সেরূপ গুণ নহে। মূল প্রকৃতি এই তিনটি পরস্পর বিরোধী প্রবণতার (Tendency) রঙ্গভূমি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অদ্বিতীয়, নির্দ্দোষরূপে সম, মহামূলভূতে (অর্থাৎ সত্যলোকের Absolutely homogeneous matter এতে) এই তিনটি পরস্পর বিরোধিনী প্রবণতার নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে। এই সঙ্ঘর্ষ চিরস্থায়ী। যখন কালবশে এই বিরোধী গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (Equilibrium) সংঘটিত হয়, তখন তাহার নামকরণ করা হয়, প্রকৃতি। সে প্রলয়ের অবস্থা,—অব্যক্তাবস্থা। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, যখন প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির অভিমুখী হয়, তখন তাহার নাম প্রধান। সৃষ্টির মুখে প্রকৃতি স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া সত্য প্রকৃতি সপ্তলোকে অনুলোম ক্রমে ব্যাকৃত হয়। আর প্রলয়কালে এই সপ্তলোক বিলোমক্রমে স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অব্যাকৃত হইতে হইতে অবশেষে অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিতে উপশান্ত হয়।"

এই প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি,—ইনিই আমাদের সৃষ্টি স্থিতি সংহার-কারিণী। এই প্রকৃতির সহিত আর এক প্রকৃতি নিত্য সম্বন্ধে জড়িতা আছেন,—সেই প্রকৃতি পরা প্রকৃতি; তিনিই ব্রজভূমে শ্রীশ্রীমতী রাধিকা; আর এই অপরা প্রকৃতি দুর্গা বা কালী প্রভৃতি মহাশক্তি।

শিষ্য। তবে কি এই অপরা প্রকৃতি শিবের শক্তিরূপে কার্য্যশীল?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তাহা হইলে ইনি ঈশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভূতা?

গুরু। ঈশ্বর হইতে কে পৃথগ্‌ভূত? জগতের এক বিন্দু বালুকণাও তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে। সেই তিনি,—তিনি যখন ব্যষ্টি, তখন সকল বিভিন্ন; তিনি যখন সমষ্টি, তখন সব এক। এই অপরা প্রকৃতি

* সাহিত্য।

সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতা নন্দকে যাহা বলিতেছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সেইটুকু শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে,—ভগবান হইতে দুর্গাশক্তি কিরূপ বিভিন্ন।

একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন,—

"দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি! আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেবদেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি ও লজ্জা স্বরূপিণী। উনিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী এবং সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যা শক্তি,—সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তিরূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবী রূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে দুস্তরতারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা রূপিণী, সাধুগণের সুবুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধা-স্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা,—ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বীস্ত্রীতে পতিভক্তি রূপা,—সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তিরূপা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্গোৎসব।

শিষ্য। দুর্গাশক্তি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমাদের দুর্গোৎসব তত্ত্বে কি ভাব ও তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহা বলুন।

গুরু। দুর্গোৎসব, শক্তি আরাধনা। যখন নবীন বসন্তে দিকে দিকে নব শক্তির আবির্ভাব হইয়া উঠিল; যখন বৃক্ষে বৃক্ষে শুষ্কপত্রের পরিবর্ত্তে নব পত্রের উদ্গম আরম্ভ হইল; যখন নবীন মুকুলে নবমধু সঞ্চারিত হইল; যখন পাখীরা নূতন কণ্ঠে নূতন স্বরে কাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রাণ পুলকিত করিতে লাগিল; যখন কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম-পরাগ-ধূসর ভ্রমরকুল আকুল হৃদয়ে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল, যখন কোন্ দেশের নূতন ফুরফুরে বাতাস আসিয়া প্রাণের কাণে নবীন রাগিণীর মূর্চ্ছনা শুনাইতে লাগিল, তখন ভক্ত বুঝিলেন,—এ শক্তি কোথায় আছে? কোন্ মহাশক্তির কণা-শক্তিতে জগৎ আজি এত মোহময়ী। সে বুঝি আসিয়াছে,—সে বুঝি আসিবার জন্য উন্মত্তা হইয়াছে! কে সে? আমাদের মা;—মা! মা! তুমি কোথায়?

ভক্ত তাই তাঁহার ধ্যানে বসিল। সে ধ্যানের প্রতিমা, দুর্গা প্রতিমা।

দশভুজা দশবাহুদ্বারা আমাদের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত, অগ্নি, বায়ু, ঊর্দ্ধ, অধঃ প্রভৃতি দশদিক রক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতির ঘোর মহিষাসুরকে পাশে আবদ্ধ করিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে

ভীষণ শূল আবদ্ধ করিয়া, কেশে ধরিয়া রাখিয়াছেন। পশুরাজ সিংহ—ভীষণ বলবিক্রম-শালী ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃসিংহ তাঁহার বাহন। দক্ষিণে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাতা জ্ঞানগুরু গণপতি; তৎপরে ধর্ম্মৈশ্বর্য্য-প্রদায়িনী লক্ষ্মী দেবী। বামে বিপুল বলবিক্রমশালী দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়; তৎপরে বাগ্‌বাদিনী বাণী। সর্ব্বদেবতা—সর্ব্বাশ্রয় তাঁহার পশ্চাতে, চালে বিচিত্রিত!

ভক্ত একবার বসন্তে সে রূপের পূজা করিল। প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিল।

বসন্তের অন্ত হইল,—বর্ষার দুর্দ্দিনে জগৎ ছাইল। মানব মায়ের কথা ভুলিয়া গেল। শরৎ আসিল,—শরতের সুখ-স্তিমিত সৌন্দর্য্যে ভক্তের আবার মায়ের কথা মনে পড়িল। দূর প্রবাসে মায়ের কথা মনে পড়িলে সন্তানের যেরূপ আকুলতা জাগিয়া উঠে, ভক্তেরও তাহাই হইল। কিন্তু মাকেত জাগান হয় নাই;—শক্তি যে জীবাত্মাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বাধারে নিদ্রিতা।

ব্রহ্মা ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, সুপ্তা মাতাকে জাগাইয়া আরাধনা কর। সুপ্তা মাতাকে জাগাইবার জন্য বোধন কর।

ব্যবস্থা পাইয়া ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চারিদিকে শোভার ভাণ্ডার বিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তের প্রাণে মায়ের কথা জাগিয়া উঠিয়াছে—

নীলিম গগনে ভাতিছে চন্দ্রমা,
শেফালি শোভিছে ফুটিয়া।
সু-কাশ কুসুমে বিতারি সুষমা
দিগঙ্গনা লুটিছে হাসিয়া।

করুণ মলয়-পরশ-অলসে
কম্পিত কনক-বীথিকা।
চরণ-সরোজে শোভিবে বলিয়া
হাসিয়া ঝরিছে যূথিকা।
ঊষার রক্তিম উদার অধরে
সুরভি উঠেছে ফুটিয়া।
ছুটি আসি কোন্ অতীত রাগিণী
পরাণে পড়িছে লুটিয়া।
আরোপি হৃদয় চারিদিকে তীর
বা'জায়ে মঙ্গল বাজনা।
করিব বোধন লভিতে শকতি
প্রসুপ্তা শকতি-চেতনা।

শিষ্য। একটা কথা।

গুরু। কি?

শিষ্য। সেই দশভুজা দুর্গা দেবগণের শক্তি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দেবগণের শক্তি হইতে জাতা। তিনি আবার কেমন করিয়া জগন্মাতা হইবেন?

গুরু। তোমার যে ইচ্ছাশক্তি, তাহা কি তোমার জন্য? মনে কর, তুমি ইচ্ছা করিতেছ, কাশী যাইব,—কাশী যাইবার যে ইচ্ছা, স্থূলভাবে তাহা তোমা হইতে জাত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি তাহা তোমা হইতে জাত? তাহা নহে;—স্বাভাবিকী

শক্তি। দেবগণে যে সূক্ষ্ম শক্তি ছিল, তাহার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল মাত্র। বিন্দু বিন্দু বারি মিশিয়া যেমন মহাসাগরে পরিণত হয়, তদ্রূপ সমগ্র শক্তির সমষ্টি শক্তি সেই মহাশক্তি।

শিষ্য। এখনও বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বলিলেন, দুর্গা অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি ত সৃষ্টির সময়েই হইয়াছেন,—আবার হইলেন কি প্রকারে?

গুরু। ইচ্ছা শক্তিত আমাদের আছেই,—তবে সন্দেশ খাইবার ইচ্ছা আবার নূতন করিয়া হয় কেন? স্থুল কথা এই যে, অপরা প্রকৃতি দেবগণের শক্তি সমুদয় একীকরণ করিয়া জগতের আরও হিতার্থে আরও স্থূলতরা হইলেন।

মহিষাসুর বধের পূর্ব্বে যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার তাহা হইতে আরও একটু স্থূল হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই দেবগণের শক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া আরও স্থূলা হইলেন। মহিষাসুর বধের পর দেবগণ তাঁহাকে যে অতীব মনোহর স্তব করিয়াছিলেন। আমি তাহা পাঠ করিতেছি, শুনিলে তুমি মহাশক্তিসম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা-
নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকা মখিল-দেবমহর্ষি-পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।

সা চণ্ডিকাখিল-জগৎ-পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতিযানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুর-দেবগণাদিকেষু ॥
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবী।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্য-মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।

মোক্ষার্থিভি র্মুনিভিরস্ত-সমস্ত-দোষৈ-
র্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীত-রম্য-পদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্‌।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈক-কৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশি-মৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা॥
ঈষৎ সহাসমমলং পরিপূর্ণ-চন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্‌।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥
দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটী-করাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্ক-সদৃশ-চ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীবচিত্রং
কৈর্জ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥
দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।

বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥
ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈবকর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতীকরোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতামতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখন্তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥
দৃষ্টৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।

লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা।
ইত্থংমতির্ভবতি তেম্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥
খড়্গপ্রভানিকর-বিস্ফুরণৈ স্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তি-নিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দু-খণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥
দুর্ব্বৃত্তবৃত্ত-শমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্য মন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিম্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়প্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবন্নমস্তে ॥

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টা-স্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যা-নিস্বনেন চ ॥

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাং স্তথা ভুবম্ ॥
খড়্গ-শূল-গদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

শিষ্য। অতি সুন্দর স্তব। চণ্ডীপাঠের সময়ও পুরোহিতমহাশয়ের নিকট ইহা শ্রুত হইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে; কিন্তু তখন হয়ত বিশেষ মনঃ সংযোগ করি নাই বলিয়া এত মধুর লাগে নাই। যদিও উহার সংস্কৃত অতি কোমল ও মধুর,—সহজেই ভাব বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু হয়ত অনেক স্থলের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার বাঙ্গালা অনুবাদ আমায় শুনাইয়া দিন।

গুরু। দেবগণ কহিলেন,—"যে মহাদেবী! নিজ নিজ শক্তি-প্রভাবে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন, যিনি সকল দেবতার শক্তি হইতে সমুৎপন্না হইয়াছেন, যিনি দেব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকেন, আমরা ভক্তিবিনম্রাদি সহকারে সেই জগদম্বাকে নমস্কার করি; তিনি আমাদিগের শুভ সম্পাদন করুন।

অনন্তদেব, শিব ও বিরিঞ্চি যাঁহার অতুলনীয় শক্তি ও প্রভাব বর্ণন করিতে অক্ষম, সেই চণ্ডিকাদেবী নিখিল জগৎ পরিপালন এবং অশুভ ভয় সকল বিনাশার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করুন।

যিনি সুকৃতিশালী লোকদিগের আলয়ে লক্ষ্মী ও পাপীদিগের গৃহে

অলক্ষ্মীরূপে অবস্থিতি করেন, এবং যিনি বিমল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, আর যিনি সৎলোকের শ্রদ্ধা ও সৎকুল-জাত ব্যক্তিবৃন্দের লজ্জা স্বরূপিণী, সেই দেবী তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! তুমি এই নিখিল বিশ্ব পরিপালন কর।

দেবি! তোমার এই অচিন্তনীয় রূপ এবং মহা মহা অসুরনাশিনী অমিত শক্তি আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি করিয়া বর্ণনা করিব? তুমি সর্ব্ব দেব ও দৈত্যাদিগের মধ্যে এই ঘোরতর সমরে যে চেষ্টাচরিত্র প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা আমাদিগের বাক্য ও মনের অতীত, অতএব তাহাই বা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব।

তুমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, তুমিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী, রাগাদির বশীভূত হইয়া আমরা তোমার মহিমা কিরূপে বুঝিব? আমরা ত সামান্য প্রাণী, বিধি, বিষ্ণু ও মহাদেব শিবও তোমার তত্ত্ব অবগত নহেন, তুমিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ীভূতা অর্থাৎ সর্ব্বাধার; আবার এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অংশভূত;— অথচ তুমি নির্লিপ্ত ও অবিকৃতা। তুমিই পরম প্রকৃতি আদ্যাশক্তি অজ ও নিত্যজনী এবং অনন্ত স্বরূপা!

হে দেবি! তুমি অগ্নিজায়া স্বাহাস্বরূপা এবং তুমিই পিতৃগণের পত্নী স্বধা স্বরূপিণী। যজ্ঞকালে হোতা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান সময়ে তোমাকে স্বাহা নামে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই দেবগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। আর পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকালে পিতৃযজ্ঞকারিগণ তোমাকেই স্বধা নামে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

মা জগদম্বে! তুমিই মুক্তিদায়িনী পরমা বিদ্যা। তদ্ধেতু মুমুক্ষু মুনিগণ ক্রোধদ্বেষাদি দোষ সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করতঃ

ব্রহ্মজ্ঞান লাভাশয়ে হে ব্রহ্মময়ী দেবি! তোমারই চিন্তা করিয়া থাকেন। তুমি একমাত্র চিন্তাগম্যা।

তুমি শব্দরূপা ব্রহ্মপদার্থ; তাই লোকে তোমাকে পরম রমণীয় উচ্চগীতি-পাঠবিশিষ্ট ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করে। তুমিই দেবরূপিণী অপরিচ্ছিন্না, এবং তুমিই জগৎ প্রতিপালন জন্য কৃষি-কর্ম্মাদি স্বরূপা। আর, হে মহাদেবি! তুমিই নিখিল জগতের সমস্ত দীনজনের দারিদ্র্য-দুঃখ বিনাশ করিয়া থাক।

যে ধারণাবতী বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্ব শাস্ত্রের ফলস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, হে দেবি! তুমিই সেই ধারণাবতী বুদ্ধি স্বরূপা। মাতঃ! তুমিই দুর্গম ভবসাগরতারিণী তরণী স্বরূপিণী। সামান্য সংসার সাগরের তরণী কর্ণধারদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি একাকিনী, অদ্বিতীয়া ও ভবসমুদ্রের নৌকা স্বরূপা। তুমিই মধুকৈটভারি হরির অঙ্কলক্ষ্মী এবং শশিমৌলী বিহারিণী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা।

অত্যুত্তম কনক-কান্তি সদৃশ পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দিত তোমার পরম রমণীয় ঈষদ্ধাস্যযুক্ত মুখকমল দর্শন করিয়াও মহিষাসুর বিমোহিত না হইয়া, ক্রোধান্ধ চিত্তে যে, তোমার সুকোমল গাত্রে প্রহার করিল, ইহা অতীব-পর অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

অপর আরও অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার এই যে, হে মহাদেবি! তোমার রোষ-কষায়িত ভ্রুকুটী-ভীষণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, সেই মহিষাসুর প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই! কেননা, ক্রোধরক্তলোচন মহাভীষণ শমনের বদন মণ্ডল অবলোকন করিয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না।

জগদম্বে! জগতের হিতের নিমিত্ত তোমার আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব তুমি এ প্রপন্ন জনগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া অসুর বংশ ধ্বংস কর। আমরা জানি, এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাসও করি যে, তুমি ক্রুদ্ধ

হইলে মহিষাসুরের অগণ্য সৈন্য যুদ্ধস্থলে এখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

দেবি! আপনি যাঁহাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করেন, তাহারাই ধন্য এবং দেশমান্য হইয়া উঠেন। তাঁহাদের ধনজন ও কীর্ত্তি-কলাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁহাদেরই ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। তাঁহারাই পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যবর্গ লইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করেন, এবং কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

হে দেবি! তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তাহারাই শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সুকৃতিশালী হইয়া স্বর্গ লাভের অধিকারী হয়েন। অতএব এই ত্রিভুবনে তোমার প্রসন্নতা ব্যতীত কোন কার্য্যই ফলপ্রদ হইতে পারে না।

মাতঃ দুর্গে! সঙ্কটে পড়িয়া ভয়ার্ত্ত প্রাণীসকল তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদিগের ভয় বারণ করিয়া দাও। আর, উদ্বেগশূন্য জনগণ তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। এবং তুমিই সকলের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করিয়া থাক। প্রাণিনিকরের সর্ব্বপ্রকার উপকার সাধনার্থ তোমাভিন্ন অন্য কাহার চিত্ত সদা সর্ব্বদা দয়ার্দ্র থাকে? দেবি! দৈত্যগণ নিধন হইলে, জগতের সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ হইবে বলিয়া, তুমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াছ। আর তাহারা পাপ সঞ্চয় করিয়া যাহাতে নরক-যন্ত্রণা ভোগ না করে, তজ্জন্য তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করতঃ স্বর্গবাসেরও উপযুক্ত করিয়া দিয়াছ।

তোমার দৃষ্টিমাত্রেই ত তাহারা ভস্মীভূত হইত? কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া তাহাদিগকে সমরে স্বহস্তে অস্ত্র প্রহারে সংহার পূর্ব্বক পবিত্র করতঃ স্বর্গবাসী করিয়াছ। অতএব তোমার শুভ ইচ্ছা ও দয়ার কথা আর কি বলিব!

দেবি! অসুরগণের লোচন-পুঞ্জ তোমার সুধাসিক্ত ইন্দু-বিনিন্দিত সৌম্যকান্তিবিশিষ্ট মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়াছে বলিয়াই অসুরগণ এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে।

দেবি! আপনি দৃষ্টিমাত্র সমস্ত অসুরকে বিনাশ করিতে পারিতে; তাহা না করিয়া যে অস্ত্র ব্যবহার করিলে, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল তাহাদের প্রতি তোমার দয়া প্রকাশ, কেন না, অস্ত্রাঘাতে বিনাশ করিয়া স্বর্গধামে পাঠাইলে।

দেবি! দুরাত্মা দৈত্যদিগের দমন সম্বন্ধে যে সকল চেষ্টাচরিত্র প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার তুলনা কোথাও নাই; তোমার অসুরনাশিনী শক্তি আমাদের অতি অচিন্তনীয়। শত্রুদিগের প্রতি তুমি যে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে দয়া প্রকাশ করিয়াছ, তাহাও অচিন্ত্য; কেন না, দৌরাত্ম্য-কারিদের প্রতি দয়া করা অতি অসম্ভব ও অসাধ্য ব্যাপার। হে দয়াময়ি! ইহা কেবল তোমাতেই সম্ভব।

জগদম্বে! তোমার এই অসুরনাশক অনির্ব্বচনীয় পরাক্রমের তুলনা নাই। শত্রুজয়প্রদ অথচ অতীব মনোহারী প্রীতি ও দয়া এবং তোমার এই রূপের মহিমা কেহই বলিতে পারে না, ও ত্রিভুবনে ইহার উপমাও মিলে না। বরদে! একত্রে সমরনিষ্ঠুরতা ও দয়া, ইহা কেবল তোমাতেই সম্ভব; ত্রিলোকে ইহার তুলনা নাই। মা! তুমি শত্রু সংহার করিয়া অখিল-ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছ। আর রিপুগণকে রণস্থলে বাণাঘাতে নিহত করিয়া, স্বর্গপ্রদান করিয়াছ, এবং আমাদিগেরও দুর্ম্মতিরূপ অসুরভীতি দূর করিয়াছ। অতএব, হে মাতঃ! তোমাকে নমস্কার।

দেবি! তুমি আমাদিগকে শূলদ্বারা রক্ষা কর। হে অম্বিকে! তুমি আমাদিগকে খড়্গদ্বারা রক্ষা কর এবং ঘণ্টাধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার

দ্বারাও আমাদিগকে রক্ষা কর। চণ্ডিকে, হে ঈশ্বরি! তুমি নিজ শূল ঘূর্ণায়মান করিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে রক্ষা কর। মহাশয়া! ত্রিলোকে তোমার যে সকল সৌম্যমূর্ত্তি ও অতিশয় ভয়ানক মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছেন, সেই সমস্ত বিগ্রহদ্বারা তুমি আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে! খড়্গ, শূল ও গদাদি যে সকল অস্ত্র তোমার কর-পল্লবে শোভা পাইতেছে, সেই সকল দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষযজ্ঞ।

শিষ্য। আপনি যাঁহাকে অপরা প্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, সেই দুর্গাশক্তি প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন,—ইহাও কি পুরাণের রূপক এবং ইহারও কি তাৎপর্য্যার্থ আছে?

গুরু। তুমি পুরাণের রূপক, কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেছ,—আগে জানিতে চাহি।

শিষ্য। যাহা নহে, অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনা, কোন ঘটনা বিশেষ বুঝাইবার জন্য যে বর্ণনা, তাহাকে আমি রূপক বলিতে চাহি।

গুরু। পুরাণে সেরূপ রূপক লিখিত হয় নাই। রঙ্গালয়ের অভিনেতা যেমন রামচন্দ্রের কার্য্যাবলী অজ্ঞ মানুষকে বুঝাইবার ও জানাইবার জন্য রামচন্দ্র সাজিয়া তাঁহার লীলার অভিনয় করে, তদ্রূপ শক্তি সকলও মহিমা ও শক্তি জ্ঞাপনার্থ স্থূলাকার ধারণ করেন। তবে তাহা রূপক এই জন্য যে, শক্তি বা চৈতন্যের রূপ গ্রহণের আবশ্যকতা

নাই,—সে যে রূপ, তাহা রূপক। সেই রূপকের এমন তাৎপর্য্য, এমন ভাব, এমন তাৎপর্য্যার্থ আছে,—যাহা বিশ্লেষণ করিলে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।

শিষ্য। তবেত রূপক সম্বন্ধে আমার ঘোর ভ্রান্তি ছিল। এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতির শিব-রহিত যজ্ঞের কারণ কি, উদ্দেশ্য কি ও তাৎপর্য্যার্থ কি,—তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। উপাখ্যান ভাগটি বোধ হয়, তুমি জান। ভাল, সংক্ষেপে আমি তাহাও বলিতেছি,—

কোন এক যজ্ঞস্থলে মহাদেব দক্ষ প্রজাপতিকে নমস্কার না করাতে, দক্ষ আপনাকে অতিশয় অপমানিত জ্ঞান করিয়া, সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এক শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল শিবকেই নিমন্ত্রণ করা হইল না।

নারদের উপরেই নিমন্ত্রণ করিবার ভার অর্পিত। নারদ দেখিলেন, কার্য্যটি অমনি অমনিই বা সমাধা হয় কেন, তিনি গিয়া দক্ষকন্যা সতীর নিকটে তাঁহার পিতার যজ্ঞের কথা বলিয়া আসিলেন।

সতী আর থাকিতে পারেন না। সমস্ত দেবতাগণ গমন করিতেছেন, —ত্রিলোকব্যাপী পিতৃযজ্ঞ না দেখিয়া কোন মেয়ে স্থির থাকিতে পারে; একদিন দুইদিন কাটিয়া গেল, বিমান-পথে দেবতাগণ চলিয়াছেন, সতী আর থাকিতে পারেন না, স্বামী সদানন্দের সন্নিধানে গিয়া পিতৃযজ্ঞ দর্শনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, বলিলেন;—

"হে নাথ! আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞমহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন. ঐ দেখুন, দেবতা সকল সেই যজ্ঞে গমন করিতেছেন। অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন আমরাও গমন করি।

আমার অন্যান্য ভগিনীরা স্ব স্ব স্বামী সমভিব্যাহারে বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার মানসে নিশ্চয়ই সেই স্থানে উপস্থিত হইবেন। অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি আপনার সহিত গমন করিয়া পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করি। শিব! আমার মন একান্ত উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব আমি অচিরেই যজ্ঞে গমন করিয়া ভগিনী, ভগিনীপতি ও মাতৃস্বসাদিগের এবং স্নেহার্দ্রচিত্তা জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। যজ্ঞে ঋষিরা যে ধ্বজা বা যূক উৎক্ষিপ্ত করিবেন, তাহাও দর্শন করিব। অজ! আপনি দেখিতেছেন, এই অত্যাশ্চর্য্য ত্রিগুণময় বিশ্ব আপনার মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া আপনাতেই প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু নাথ! আমরা হীন স্ত্রীজাতি; উৎসুক হওয়াই আমাদিগের স্বভাব। আমি আপনার তত্ত্বও বিশেষরূপে অবগত নহি; অতএব জন্মভূমি দর্শনে আমার ইচ্ছা হইতেছে। আপনার জন্ম নাই,—অতএব আপনি বন্ধুবিয়োগ জন্য দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। হে শিতিকণ্ঠ! চাহিয়া দেখুন,—বিমান-পথে চাহিয়া দেখুন, যে কামিনীদিগের সহিত প্রজাপতির কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারাও আপন আপন স্বামীর সমভিব্যাহারে ঐ দলে দলে গমন করিতেছেন। আহা! উঁহাদিগের কলহংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিমানদ্বারা নভোমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভাই হইতেছে। দেবশ্রেষ্ঠ! তবে পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে শ্রবণ করিয়া তনয়ার দেহ কেনই না প্রচলিত হইবে? বন্ধুর, স্বামীর, গুরুর এবং পিতার ভবনে নিমন্ত্রিত না হইয়াও গমন করা যায়। অতএব নাথ! প্রসন্ন হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনি আমাকে কৃপা করিয়া থাকেন। দেখুন আপনি পরমজ্ঞানী হইয়াও আমাকে নিজ দেহের অর্দ্ধ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করুন;—আমি প্রার্থনা করিতেছি।

এই স্থলে তোমাকে একটু বলিয়া রাখি যে,—দক্ষ কর্ম্মশক্তি। দক্ষ কাল-বঞ্চনার চেষ্টা করিলেন। তিনি আপন কর্ম্মশক্তির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভাবিলেন, মহাকাল শঙ্কর,—শঙ্করকে মান্য করা কি জন্য? ভগবান্ বিষ্ণু আছেন, তাঁহাকে ভজনা করা অবশ্য জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু মহাকালকে কেন? কর্ম্মশক্তির দ্বারা কালকে জয় করা যায়,—কালকে অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু কাল ত ঈশ্বরেরই বিকাশ,—কাল, কর্ম্মকে প্রণত হইবে কেন? কাল, কর্ম্মকে গ্রাহ্য করে নাই। কর্ম্ম ক্রুদ্ধ হইয়া আরও বিকাশে কালকে হীন করিতে প্রয়াস পাইলেন। শক্তি লাভ করিতে হইলেই যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন,—তাই দক্ষ ত্রিলোকব্যাপী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কাল-বঞ্চনা করিয়া, কালকে ফাঁকি দিয়া।

কালের শক্তি শঙ্করী বা সতী অথবা অপরা প্রকৃতি। এখন, কর্ম্ম-শক্তির পরিচালনায় অপরাশক্তিকে বাধ্য হইতেই হইবে। তুমি ঈশ্বরকে ডাক আর নাই ডাক, ঈশ্বরকে বোঝ আর নাই বোঝ, ঈশ্বরকে মান আর নাই মান,—কর্ম্ম করিলেই শক্তিকে আসিতেই হইবে। কিন্তু ঈশ্বর হীন কর্ম্ম দক্ষযজ্ঞ।

কর্ম্মের আকর্ষণে সতীকে বিচলিতা হইতে হইয়াছে,—তিনি আর সে যজ্ঞে না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ মহাকালের নিকটে বিদায় চাহিতেছেন। মহাকাল কেবল শক্তিকে বিদায় দিতে ইচ্ছুক নহেন, তিনি বলিলেন,—"শোভনে! তুমি বলিলে নিমন্ত্রিত না হইয়াও বন্ধুদিগের গৃহে গমন করা যায়; কিন্তু যদি বন্ধু, দেহাদিতে অহঙ্কার নিবন্ধন গর্ব্ব ও ক্রোধবশতঃ বন্ধুর দোষোদ্‌ঘাটন না করেন, তাহা হইলেই তোমার ঐ বাক্য শোভা পাইতে পারে। বিদ্যা, তপস্যা, ঐশ্বর্য্য, উৎকৃষ্ট দেহ, যৌবন এবং সৎকুল; এই ছয় সাধু মনেরই গুণ। কিন্তু

অসাধুদিগের পক্ষে আবার এই ছয়টিই দোষ স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের বিবেক নষ্ট করে। সেই হেতু তাহারা গর্ব্বে অন্ধ হইয়া উঠে; সুতরাং মহতের তেজো দর্শনে সক্ষম হয় না। স্বজনবোধে এতাদৃশ অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে দৃষ্টিপাতও করিবে না। ইহারা কুটিলবুদ্ধি বশতঃ অভ্যাগতদিগের প্রতি ভ্রুকুটী-করাল ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। লোক অরাতি-নিক্ষিপ্ত শিলীমুখাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথিত হইয়াও নিদ্রা যাইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি কুটিল-বুদ্ধি বন্ধুদিগের দুর্ব্বাক্য দ্বারা মর্ম্মস্থানে আহত হন, তাঁহার হৃদয় দিবানিশিই দুঃখ অনুভব করে।

সুভ্রু! তোমার পিতা প্রজাপতি দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট এবং তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের কনিষ্ঠা দুহিতা তুমি, তাহাও জানি, কিন্তু আমার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তুমি তাঁহার নিকট সম্মানলাভ করিতে পারিবে না। তিনি আমার সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধনই তাপিত হইয়াছেন। পুরুষ বুদ্ধির সাক্ষীর স্বরূপ (নিরহঙ্কারী) ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত তাপিত হইতেছে; এবং তিনি তাদৃশ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে না পারিয়া, যেরূপ অসুরেরা অনর্থক হরির দ্বেষ করে, সেইরূপ পরের কেবল দ্বেষ করিতেছেন।

হে সুমধ্যমে! যে কারণে তোমার পিতার সহিত আমার বিবাদ হয়, অর্থাৎ তিনি আমার উপরে এত জাতক্রোধ হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত আছ। আমি তাঁহার নিকটে নতশির হই নাই। অজ্ঞ জনেরা প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অভিবাদন পরস্পরে করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞজনেরা তাহাই অন্য প্রকারে উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন; তাঁহারা দেহাভিমানীকে অভিবাদনাদি না করিয়া মনোদ্বারা হৃদয়শায়ী পরম পুরুষকেই করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের নাম বসুদেব;

—কারণ আবরণ শূন্য পুরুষ সেই অন্তঃকরণে প্রকাশ পান। অতএব আমি অধোক্ষজ বাসুদেবকেই অন্তঃকরণ মধ্যে নমস্কার করি।

রম্ভোরু! দক্ষ তোমার দেহকর্ত্তা পিতা হইলেও তাঁহাকে দর্শন করা তোমার উচিত হয় না। তাঁহার মতানুযায়ীরাও তোমার দর্শনাপেক্ষ্য নহেন। দেখ, বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে তোমার পিতা, কোন অপরাধ না করিলেও আমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর যদি তুমি নিতান্তই আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তথায় গমন কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না।

সতী দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা এবং আদরের পাত্রী, স্বয়ং মহাকাল একথাও বলিলেন,—তাহার ভাব এই যে, সকল আসক্তিময় অবস্থার পরিণামে প্রকাশ হয়েন বলিয়া উহাকে কনিষ্ঠা বলা হইয়াছে। কাজেই সেই মহাশক্তি স্বরূপা অবিদ্যারূপিণী অপরা প্রকৃতির উপরে কাহার না প্রবলাসক্তি! কিন্তু অবিদ্যাই আবার মহাবিদ্যা, কাজেই তিনি ব্রহ্মপরা বা নিবৃত্তিপরা বলিয়া মহামোহিত কর্ম্মমতি দক্ষ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি যদি কালের কোলে না থাকিয়া কেবল কর্ম্মে বিরাজিত হইতেন, তবে দক্ষের এ জাতক্রোধ হইত না।

সতী কালের কোলে কালী। শ্মশানবাসিনী—যোগিনী ডাকিনী সহচারিণী উলঙ্গিনী মুক্তকেশী। ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত কর্ম্মমতি দক্ষ এমন কন্যা দেখিতেও চাহেন না। তাই মহাদেব বলিলেন, তিনি তোমার পিতা হইলেও বিনা নিমন্ত্রণে তোমার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। দক্ষ চাহে, কেবল কর্ম্মশক্তি, কালশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি চাহেন না;—তুমি কেন যাইবে? আমিত কিছুতেই যাইব না;—কাল-হীন কালী, জড়। তাঁহার দ্বারায় আবার কি কার্য্য হইতে পারিবে? যজ্ঞ পণ্ড হইবে,—

তোমারও দেহের পরিবর্ত্তন হইবে। অতএব এই অমঙ্গলকর কার্য্যে গমন করা কথনই তোমার কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু শক্তিসাধকের আকর্ষণ, শক্তি অবহেলা করিতে পারেন না। শক্তিকে ডাকিলেই—শক্তির সাধনা করিলেই শক্তিকে ছুটিতে হইবে। শক্তি আর থাকেন কি করিয়া, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। কাল-হীন কালীর গমনে যে কুফল হয়, দক্ষের কার্য্যে তাহা হউক; কিন্তু দক্ষ যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে—তাঁহাকে যাইতেই হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দশমহাবিদ্যা।

শিষ্য। শুনিয়াছি, এই সময়েই সতী দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করিয়াছিলেন,—তাহা কি সত্য?

গুরু। কোন কোন পুরাণের মত তাহাই বটে।

শিষ্য। কেন ও কি প্রকারে সতী দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করিলেন?

গুরু। শঙ্কর, দক্ষযজ্ঞে যাইতে সতাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন, সতীও বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একবার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, আবার শঙ্করের ভয়ে বারে বারে ফিরিতে লাগিলেন। বন্ধুদর্শনেচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁহার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। স্নেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে তিনি অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রোধের উদ্রেক হওয়াতে তাঁহার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন তিনি সেই রোষাগ্নি দ্বারা শঙ্করকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

শঙ্কর, করাল কালীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে দিকে যখন মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, সেই দিকে প্রকৃতির এক এক মূর্ত্তি দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। ইহাই দশমহাবিদ্যার সৃষ্টি।

শিষ্য। কাল, কালীর ভয়ে বিকম্পিত হইলেন? কাল ঈশ্বরের বিকাশ,—কালী অপরা প্রকৃতি। কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। বিষম সমস্যা। কাল বড় কি কালী বড়—এ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব। কাল ও কালী উভয়েই উভয়ের আধার। কাল ভিন্ন কালী থাকিতে পারেন না, আবার কালী ভিন্ন কালেরও অস্তিত্ব নাই। এই স্থলে সেই ঘটনাই দেখান হইল।

কালী যখন কালের কোল হইতে বিচ্যুত, তখন শঙ্কর জড়,—ভয়ে কম্পবান্। কালীও কালের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষ যজ্ঞে দেহ পরিবর্ত্তন করিলেন। দেহ পরিবর্ত্তন অর্থে, প্রকৃতির নূতন ভাবের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। দশমহাবিদ্যা প্রকৃতির কিরূপ অবস্থা?

গুরু। আমি যাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে তুমি বুঝিতে পারিয়া থাকিবে যে, "প্রধান অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে ত্রিগুণের বিকাশ। গুণসাম্যা প্রকৃতি-বীজ হইতে প্রথমে সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। মহত্তত্ত্ব নিহিত বীজ হইতে প্রথমে সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কার তত্ত্বের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কার তত্ত্বই অহঙ্কৃত অবিদ্যা বীজ। যাহা অহঙ্কার পূর্ণ মায়া, তাহা অবশ্য তমোগুণান্বিত। সৃষ্টিকালে প্রধানা প্রকৃতিকে যে পুরুষ অনুপ্রবিষ্ট হন, তিনিই সর্ব্বগুণান্বিত মহত্তত্ত্বে দেখা দিয়া ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। সে মহত্তত্ত্বের প্রকৃত অংশ যে মহামায়া ও বিদ্যা, তাহাই রজোগুণান্বিত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রীরূপে সমস্ত বিশ্ব-বীজ-স্বরূপা অহঙ্কৃতা অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। * * মহত্তত্ত্বের এই পুরুষই সত্ত্ব-গুণান্বিত

শ্বেতবর্ণ মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বর। তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতির মহামায়া রজোগুণান্বিত রক্তবর্ণা ঈশ্বরী।”

যখন কর্ম্ম-মতির সাধনাফলে সেই মহেশ্বরের সহিত প্রকৃতি বিচ্ছেদ সম্ভবপর হইল, তখন মহাকাল প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। শক্তি তখন কর্ম্মপথাভিগামিনী,—তিনি কালকে ভীত করিতে স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। দশদিকে দশমহাবিদ্যা হইলেন।

“প্রথম মহাবিদ্যা মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি কালী এবং দ্বিতীয় মহাবিদ্যা অনন্তদেশের প্রকৃতিরূপিণী দেশ-শক্তিদ্বারা কিরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। অনন্তদেশ-শক্তি তারা অনন্ত নাগবেষ্টিত প্রতিমায় ঋষিদিগের ধ্যানে দেখা দিয়াছেন। প্রতিমা সমস্তই ধ্যানজরূপ,—ধ্যানজরূপ সকল সূক্ষ্ম শক্তির প্রতিমা। আকাশই দেশ ও কাল। উক্ত দুই মহাবিদ্যা সেই কাল ও দেশ-শক্তি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আকাশই সর্ব্বশক্তির আধার। সুতরাং সেই আকাশ হইতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর উৎপত্তি। কারণ, শক্তির বল চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে, অক্ষুণ্ণ না থাকিলে তাহা শক্তি হইবে কিরূপে. এজন্য শক্তি চিরযৌবনা ষোড়শী। ষোড়শী সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ, এজন্য রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বলবীর্য্য সকলই। তাই এই সর্ব্বশক্তিরূপিণী রাজরাজেশ্বরীকে পঞ্চদেবতা ধ্যান করিতেছেন। কারণ, সেই আদ্যাশক্তি হইতেই তাঁহাদের শক্তি লাভ হইয়াছে। কালী-তারা মহাবিদ্যা হইতে এই তৃতীয় বিদ্যার উৎপত্তি। এই তৃতীয় বিদ্যাকে ঋষিগণ ত্রিগুণানুসারে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া সমষ্টি অর্থে ত্রিভুবনের ঈশ্বরীরূপে দেখাইয়াছেন। তাই চতুর্থ বিদ্যার নাম ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুই রূপ, এক কোমল কান্তি, আর এক প্রচণ্ড রূপ। ভুবনেশ্বরী মনোহর রূপে দেখা দিয়াছেন। এই ভৈরবীর চণ্ডীশক্তি অষ্টবিধ

প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত অষ্টনায়িকা। তন্ত্র, শক্তির এইরূপ নানা ধ্যানস্বরূপ দেখাইয়া শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। আর কোন্ বিজ্ঞান-শাস্ত্র শক্তিকে (force) এরূপ তন্ন তন্ন বিভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই অষ্ট নায়িকা ভিন্ন ভৈরবী আবার ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দেখা দেন। তাই ছিন্নমস্তা পরম্পরারূপে ষষ্ঠবিদ্যা বলিয়া পরিগণিতা। ভগবতী সর্ব্বমূর্ত্তিতেই বিশ্বপালিকাশক্তি। কারণ তিনি যেমন বিশ্বের সৃষ্টির কারণ, তেমনি স্থিতির কারণ। ছিন্নমস্তামূর্ত্তিতেই পালিকাশক্তিই প্রবলা থাকাতে তিনি ভৈরবী-মূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্রা হইয়াছেন। সর্ব্বরূপেই একই ভগবতী, তবে উপাসনার্থ বিভিন্ন ধ্যানস্বরূপের প্রতিমা গ্রহণ করা হয় মাত্র। ছিন্নমস্তারূপে কি প্রকারে পালন শক্তির প্রাবল্য হইয়াছে? ছিন্নমস্তায় আমরা ভগবতী অন্নপূর্ণার ত্রিধা শক্তি বিভাগ দেখিতে পাই। অন্নপূর্ণা যে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্ন স্বরূপ হইয়াছেন, তাহাই ছিন্নমস্তার ত্রিধা রক্তধারা। ছিন্নমস্তা নিজ দেহের ত্রিধা রক্তধারা পান করিয়া অন্নপূর্ণাকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন। কখন 'ৎ ভোক্তারূপে নিজ জগদ্দেহ হইতেই ভোগ্য অন্ন সংগ্রহ করিতেছেন, কখন সেই ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করিয়া পরিপুষ্ট ও পালিত হইতেছেন। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনই পৃথক্ শক্তিরূপে দেখা যায়। ভোক্তা থাকিতে পারে, ভোগ্যও থাকিতে পারে, কিন্তু ভোগ না হইলে কি পুষ্টি সাধন হয়? ভোগ না হইলে ভোগ্য কিছুই নহে। পীড়িতের কাছে ভোগ্য আছে, কিন্তু ভোগ নাই। ভোগই জগতের পালন হেতু। সেই জন্ম ভোগধারাই ছিন্নমস্তা নিজে পান করিতেছেন, অপর দুইধারা একাত্ম-সখীদ্বয় পান করিতেছেন। তাঁহারা ভোক্তৃ ও ভোগ্য শক্তিরূপা এবং সেই সেই রূপা বলিয়া স্বতন্ত্রদেহী। অতএব, ছিন্নমস্তায় আমরা অন্ন-

পূর্ণার জগৎ পালন রীতি অতি পরিষ্কৃতরূপে দেখিতে পাই। জগতের ভোগ পূর্ণ হইলে কি হয়? প্রলয় হয়। তাই আমরা ছিন্নমস্তার পর ভগবতীর প্রলয়রূপিণী ধূমাবতীকে দেখিতে পাই। ধূমাবতী ভগবতীর ঘোর প্রলয়-মূর্ত্তি। প্রলয়কালে জগতের ভোগ শেষ হইলে জরা জীর্ণা ভগবতী বৃদ্ধ বেশে কাকধ্বজ যমের প্রলয় রথে আরূঢ়া হইয়া ক্ষুধাতুরা, বিস্তারবদনা সর্ব্ববিশ্বকে কুলাহস্তে সংগ্রহ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করেন। ধূমাবতী এই প্রলয়রূপিণী ভৈরবীর ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি। তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি রক্তবর্ণা রজোরূপিণী বগলা। এই মূর্ত্তিতে ভগবতী ঘোর বেদবিরোধী অসুরের বিনাশ সাধন করেন। সেই অসুরনাশে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই নির্ম্মল জ্ঞানরূপিণী ভগবৎশক্তিই মাতঙ্গী। মাতঙ্গী মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপিণী ভগবতী অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা নাশিনী, কৃষ্ণাঙ্গী, তমোরূপিণী শক্তি। এই সমস্ত শক্তিধারিণী হইয়া ভগবতী অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী কমলা রূপে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি। যে ব্রহ্মাণ্ড-কমলব্রহ্মার আসন রূপে কারণবারি হইতে সঞ্জাত হইয়াছিল, সেই কমলে কমলার ব্রাহ্মীশক্তি এবং অপর বিদ্যারও আসন কল্পিত হইয়াছে। কেবল কালী ও তারা মূর্ত্তিতে ভগবতী মহাকাল ও মহাদেবরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের উপরে অবস্থিতা। এই কালী ও তারা-মূর্ত্তিই প্রধানতঃ মহাবিদ্যা। অন্য অষ্টমূর্ত্তি তদুৎপন্ন পর পর বিদ্যা এবং সিদ্ধ বিদ্যারূপে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং যে বিশ্ব-কমল ত্রিগুণময় হইয়া ত্রিভুবনে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই সেই অষ্টবিদ্যার আসন স্বরূপ হইয়াছে। এই দশমহাবিদ্যা ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গিনী সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী প্রকৃতি শক্তিরূপা হইয়া উজ্জ্বলবর্ণে একাসনেই বিরাজিতা আছেন। সেই ব্রহ্মাই এই দশবিধ প্রকৃতি-শক্তি-যোগে দশদিকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাই ভগবতী দশভুজা। *

* সৃষ্টিবিজ্ঞান।

তারপরে, ঈশ্বর-ভক্তিহীন কর্ম্মীর যে দশা হয়, তাহাই দক্ষের হইল। দক্ষযজ্ঞে সতী গমন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইল,—এবং দক্ষের ছাগমুণ্ড হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উমার জন্ম ও শিবসংযোগ।

শিষ্য। পরিণামিনী প্রকৃতির অবস্থাটি শুনিতে বাসনা হইতেছে।

গুরু। প্রাণশূন্য সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেব ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কালী সুপ্তা;—কাল, প্রসুপ্তা কালীর দেহ স্কন্ধে করিয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রজোগুণের ক্রিয়া বিলোপ হয়, জগতের কার্য্য ধ্বংস হয়। এদিকে কর্ম্মরূপী দক্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলেই ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া উঠিল, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সাত্ত্বিক তত্ত্বেই জগৎ পরিপূর্ণ হইল। তখন কর্ম্মাদৃষ্ট শক্তি দেবগণের স্তবে ভগবান বিষ্ণু স্বীয়-চক্রে সতীদেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কালের কোল শূন্য করিয়া দিলেন। কাল দেখিলেন, কালী বিহনে সকলই শূন্য,—বুঝিলেন, তিনি ধ্যানাধি-গম্যা। ধ্যানে সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এই স্থলে আমাদিগের একটু বুঝিবার প্রয়োজন আছে,— দেবদেবীর লীলা আদি যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা জাগতীক শিক্ষাপ্রদ। যিনি যে শক্তিধর, তিনি সেই শক্তির সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপ ধারণ করতঃ, তাহার শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন,—আর যে উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধে ইহা সঠিক কথা,—এমন কি ঈশ্বরও এই নিয়মের বশীভূত হইয়াছেন।

যোগিগণের মতে এই সমুদয় বহির্জগৎ সূক্ষ্ম জগতের স্থূল বিকাশ মাত্র। সর্ব্বস্থলেই সূক্ষ্মকে কারণ ও স্থূলকে কার্য্য বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। এই হিসাবেই স্থূলজগতে পরিদৃশ্যমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূলভাব মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরিক শক্তিকে চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন।

শঙ্কর সতীকে হারাইয়া যোগ সাধনে মনঃসংযোগ করিলেন। যোগী, সমুদয় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদয় প্রকৃতির উপরে ক্ষমতা বিস্তার করাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া জানেন।

শঙ্করও সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেননা. তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃতি তাঁহার সম্যক্ বশীভূতা নহেন। বশীভূতা হইলে তাঁহার নিষেধে কখনও প্রকৃতি যাইতে পারিতেন না। যোগসিদ্ধি করিলে, প্রকৃতি তাহার জন্য উদ্বোধিত হইলেন, প্রকৃতিও তাঁহাকে পাইবার জন্য সাকারা হইলেন,—হিমালয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এখন মিলনের উপায়। মিলনের একটি সত্ত্বা আছে। সেই সত্ত্বার নাম রাগ বা রজোগুণ,—পাশ্চাত্য ভাষায় তাহাকে Energy বলা যাইতে পারে ; কিন্তু Energy বলিলে, ঠিক রাগের অনুবাদ হয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। এই রাগেরও একটা সূক্ষ্মতম শক্তি আছে, সেই শক্তির নাম মার। তাহার অন্যান্য নাম মদন, মন্মথ, মনসিজ প্রভৃতি।

দেবগণ মদনের শরণাগত হইলেন। মদন রাগ জাগাইয়া শঙ্করকে ক্রিয়াশীল করিবার চেষ্টা করিলেন,—প্রকৃতিতে মজাইতে তাঁহার পঞ্চশর সংযোজনা করিলেন,—যোগী কামকে ভস্ম করিয়া শোধন করিয়া লইলেন।

এখন কথা হইতেছে যে, যে শক্তি অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, শঙ্কর তাঁহাকে আবার ব্যক্তভাবাবস্থায় আনয়ন করিবেন ;—তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিবেন।

ইহা করিতে যাহা আবশ্যক, তাহা যোগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই মহাদেব যোগাবলম্বন করিয়াছেন,—তাহাতে কি করিতে হইবে? না,—প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতে হইবে। প্রাণের কম্পনই শক্তি-সংগ্রহ। প্রাণের কম্পনে মদনের আবশ্যক,—কামবীজ, কামগায়ত্রীর সাধনা না করিলে, একাজ সহজে সম্পন্ন হয় না। তাই মদনের আবির্ভাব।

এখন, জীবের মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নামে যে তিনটি নাড়ী আছে, উহার আধারস্থলকে আধার-পদ্ম বলে, সাধারণ লোকের সেই আধার-পদ্মে কুণ্ডলিনী অবস্থিত। তিনি নিদ্রিতা অবস্থায় থাকেন, তাই সতী মহানিদ্রিতা।

যোগের দ্বারা শঙ্কর তাঁহাকে জাগাইয়া লইলেন,—কুণ্ডলিনী জাগিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে পদ্মে পরম শিবের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিহারে রত হইলেন। * এই জাগরণ সতীর পুনর্জ্জন্ম লাভ ; বিবাহ ষট্‌চক্রভেদ,—আর সহস্রারে শিবের সহিত সংমিলনই বিহার।

সেই বিবাহের ফলে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্ম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই সূক্ষ্ম পুরুষ প্রকৃতির সহযোগে যে শক্তির উদ্ভব, —তাহাই দেবশক্তি রক্ষার উপায় বা কারণ।

---

* ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী, ষট্‌চক্রের কথা, কুণ্ডলিনীর পরিচয়, জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ, প্রভৃতির বিশেষ কথা ও উহা করিবার সহজ ও সরল প্রণালী মৎ প্রণীত,—"দীক্ষা ও সাধনা" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অন্নপূর্ণা।

শিষ্য। প্রকৃতি অন্নদাত্রী,—অন্নপূর্ণা। শিব সেই অন্ন ভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন, ইহার ভাব আমি বুঝিতে পারি না।

গুরু। অন্নপূর্ণাদেবীর ধ্যানটি পাঠ কর।

শিষ্য। পাঠ করিতেছি,—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্ন প্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহত্তত্ত্বের পুরুষ মহাদেব। আর প্রকৃতি মহামায়া রজোগুণান্বিত-রক্তবর্ণা ভগবতী। অন্নপূর্ণা রক্তবর্ণা,—রজোগুণ রক্তবর্ণ। সেই রজোগুণান্বিত সৃষ্টিকারিণী ভগবৎশক্তি হইতেই ত্রিগুণান্বিতা অবিদ্যার প্রকাশ হইয়া থাকে। অবিদ্যার বিকাশ হইলে, আবার সেই ত্রিগুণময়ী সৃষ্টি সম্ভূত হয়। অবিদ্যার সত্ত্বগুণে সেই পুরুষই দেখা দিয়া স্বর্গলোকের বিকাশ করেন। মহত্তত্ত্বই স্বর্গলোক রূপে দেখা দেয়।

প্রকৃতি অন্নদাত্রী,—আমরা প্রকৃতি-সম্ভব জীব, পরস্পর পরস্পরকে খাইয়া ক্ষুন্নিবারণ করিতেছি। পিতার শুক্র, মাতার আর্ত্তব খাইয়া প্রথমেই জীবের পুষ্টি। তৎপরে মাতৃস্তন্যরূপ মাতৃরক্ত, মাংস মজ্জা খাইয়া

জীবের বর্দ্ধন। তারপরে মানুষ মৎস্যমাংস খাইতেছে,—বাঘে মানুষ খাইতেছে; বাঘের মাংস (মরা হউক) শৃগাল কুকুরে খাইতেছে; তারপর শস্যাদির ত কথাই নাই। দধি দুগ্ধ ঘৃত উহাও জান্তব পদার্থ। ফল কথা পরস্পর পরস্পরকে খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছি,—জঠরানলের তৃপ্তি সাধন করিতেছি।

অন্নপূর্ণারূপে প্রকৃতি অন্নদাত্রী,—অন্নপূর্ণা অন্নদান না করিলে, জীবেশ্বরের ক্ষুন্নিবারণের উপায় কি? অন্নপূর্ণাইত "অন্নদাননিরতাং" অন্ন কি? যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন। অদ ধাতুর অর্থই ভক্ষণ করা। বায়ু ভক্ষণ করিলে, বায়ুই অন্ন। আমরা প্রকৃতিকেই খাইয়া, প্রকৃতির কোলেই বর্দ্ধিত হই,—আবার প্রকৃতির দেহ প্রকৃতির কোলেই ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু তখন প্রকৃতির দেহ থাকে,—তবে কম আর বেশী। যখন একেবারে প্রকৃতির কাছ হইতে বিদায় লইয়া যাইব, যখন প্রকৃতির বিন্দুমাত্র দাগও গায়ে থাকিবে না,—তখন প্রকৃতির অন্ন খাইতে হইবে না।

আকাশে তারা ফুটে, চাঁদ উঠে, বায়ু বহে—তাহাও প্রকৃতির লীলা। আর নদীতে কুলু কুলু তানে বীচিবিক্ষেপ তরঙ্গে নীল জল গড়াইয়া গড়াইয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়া যায়, তাহাও প্রকৃতির খেলা। মানুষের দেহে, আকাশের গ্রহে, প্রণয়ের ফাঁদে, নীলগগনের সুবর্ণের চাঁদে,—সর্ব্বত্রই প্রকৃতির হাব-ভাব। প্রকৃতির লীলানিকেতন সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্রই প্রকৃতি। প্রকৃতি খাইতে না দিলে, আমরা খাইতে পাই না,—তাই মা আমাদের অন্নপূর্ণা। বিচিত্ররক্তাম্বরা নবচন্দ্রচূড়া মা আমাদের অন্নপূর্ণা।

প্রকৃতির অন্ন ভোজনে শঙ্কর সাকার,—নতুবা শঙ্কর নিরাকার নির্গুণ।

শিষ্য। দেব-দেবী যে সূক্ষ্মতাত্ত্বিকাংশ তাহা আপনার কৃপায় বুঝিতে

পারিলাম, জগতে যত প্রকারের কার্য্য কারণ ও শক্তির বিকাশ আছে, তৎসমস্তই দেব-দেবী, অর্থাৎ সকলই দেব-শক্তি। বিশ্লেষণ করিলে, চিন্তা করিলে, ধ্যান-ধারণা করিলে সে সমুদয়ই আমি এখন বুঝিতে পারিব। প্রত্যেক দেবতার রূপ বর্ণনার সহিত আর জগতের কার্য্য-কারণের সহিত মিলাইয়া আলোচনা করিলে, এখানে মূলতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইব। সমস্ত দেবতার আলোচনা করা কিছু অল্প সময় সাপেক্ষ নহে; দেবতাতত্ত্ব যতদূর যাহা বুঝিতে পারিলাম, ইহাই যথেষ্ট,—একণে আমি নিজে নিজে এই সূত্র ধরিয়া অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে আমার আরও কতকগুলি নূতন কথা জানিবার অভিলাষ আছে, এবং এ সম্বন্ধে অন্য প্রকারের বিষয়ও কিছু জানিবার আছে, অনুগ্রহ প্রকাশে সেই গুলি বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। তোমার যাহা জানিবার থাকে, বলিও।

শিষ্য। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যোপাসনার পরে কি আসিব?

গুরু। আজ আর আসিও না;—আজি পূর্ণিমা; ভাবের রাজ্য; আমার একটু কাজ আছে।

শিষ্য। কোথাও যাইবেন না কি?

গুরু। হাঁ,—যেখানে যাইব, একদিন তাহা তোমায় বুঝাইয়া দিব।

শিষ্য। তবে কা'ল সকালেই আসিব।

গুরু। সেই ভাল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

প্রতিমাপূজা।

শিষ্য। দেবতাতত্ত্ব যাহা বুঝিলাম, তাহাতে জগতের সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব যে আমাদের দেব-দেবী, তাহা অবগত হইতে পারিলাম,—তাহার আরাধনায় হিন্দু যে, পৌত্তলিক বা জড়োপাসক নহেন, তাহাও বুঝিলাম, আরও বুঝিলাম, জগতের—সমস্ত দেশের—সমস্ত মনীষিগণই এ দেবতা-দিগের আরাধনা করিয়া থাকেন। প্রকৃতির শক্তিতত্ত্বের, আরাধক নহেন কে? কিন্তু আমরা আরাধনা করি সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্বের, পূজা করি কেন, জড়ের প্রতিমার। শক্তির কি রূপ আছে? তবে আমরা খড় দড়ি দিয়া, গাছ পাথর দিয়া, রাং রাংতা দিয়া ছবি বানাইয়া তাহার আরাধনা করিয়া মরি কেন? তাহাতে কি আমাদের প্রত্যবায় হয় না? সাধক কবি রামপ্রসাদও বলিয়া গিয়াছেন,—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তা চেয়ে দেখলে না।

জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন-সোণা,
কোন্ লাজে সাজাতে চাও তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত খাদ্য নানা,
কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয়, আলোচা'ল আর বুটভিজান।*
ত্রিজগৎ মায়ের সন্তান, জেনেও কি মন তা, জান না,—
মায়ে তুষ্ট করবার জন্তে কেটে দাও মন ছাগল ছানা।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বিশ্বাস হয়, প্রতিমা পূজাটা উপধর্ম্ম।

গুরু। উপধর্ম্ম অর্থ কি?

শিষ্য। অবিধিপূর্ব্বক যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পূর্ব্বে বোধ হয়, উপশব্দ যোগ করা যাইতে পারে।

গুরু। যথা উপপতি,—কেমন? মূর্খ! ধর্ম্মের কি আবার অপ উপ আছে না কি? যাহা ধর্ম্ম,—তাহা ধর্ম্মই; যাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা পাপ বা অধর্ম্ম। অপ উপ প্রভৃতি অব্যয় ধর্ম্মে নাই। ধর্ম্ম নিজেই অব্যয় পদ প্রদ।

শিষ্য। তবে কি প্রতিমা পূজাও ধর্ম্ম?

গুরু। নতুবা কি অধর্ম্ম?

শিষ্য। জানি না,—বুঝিতে পারি না।

গুরু। তুমি বেদান্ত দর্শন পড়িয়া বুঝিতে পার?

শিষ্য। না।

গুরু। সাংখ্য পাতঞ্জল?

শিষ্য। ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনী দেখিয়া একরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি।

গুরু। মহাভারত?

শিষ্য। হাঁ, তাহা বুঝিতে পারি।

গুরু। মহাভারত বুঝিতে পার,—সাংখ্য-পাতঞ্জল ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে কিছু কিছু পার,—কিন্তু বেদান্ত দর্শন আদৌ বুঝিতে পার না কেন?

শিষ্য। ততদূর সামর্থ্য নাই।

গুরু। ইহাকে কি আখ্যা দিতে চাও?

শিষ্য। কথাটি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে পার, কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে পার না,—কেন? কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে শক্তি আছে, কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে শক্তি নাই কেন?

শিষ্য। যাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার অধিকার আছে। আর যাহা বুঝিতে পারি না, তাহাতে আমার অধিকার নাই।

গুরু। কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে অধিকার আছে, আর কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে অধিকার নাই, ইহার কারণ কি?

শিষ্য। বোধ হয়, বেদান্তদর্শন বুঝিতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তির যতদূর স্ফূর্ত্তির আবশ্যক, আমার তাহা নাই, আর মহাভারত পড়িতে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক, আমার তাহা আছে।

গুরু। এরূপ বৈষম্যের কারণ কি?

শিষ্য। তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। কিছুদিন যদি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে অভ্যাস কর, তখন বোধ হয় বেদান্তও বুঝিতে পার?

শিষ্য। বোধ হয়, তাহা পারি। মহাভারত বুঝিবার ক্ষমতাওত একদিনে লাভ হয় নাই। ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেকগুলি গ্রন্থ সমাধাপূর্ব্বক অনেক দিনের পরিশ্রমে ভাষা শিক্ষা করিয়া,

তারপরে সাহিত্যালোচনা করিয়া, তবে এই ক্ষমতা লাভ করিতে পারিয়াছি।

গুরু। জগতের সমস্ত কার্য্যেই অধিকার ভেদ আছে; ধর্ম্মেও আছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের অধিকার ভেদ কিরূপ?

গুরু। সূর্য্যের সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব কি সকলের ধারণার মধ্যে আইসে! দশবার সূর্য্যের অদৃষ্টশক্তি একজনকে বুঝাইয়া দিলে, সে হয়ত তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিবে না। আবার একজন হয়ত আপনিই সূর্য্যতত্ত্ব বুঝিয়া লইবে।

শিষ্য। সে কথা বিশ্বাস করিব কি প্রকারে?

গুরু। অবিশ্বাসের কারণ কি?

শিষ্য। বুঝা না বুঝা শিক্ষা-সাপেক্ষ। যে বুঝিতে পারিল না, সে শিক্ষা পায় নাই,—আর যে বুঝিল, সে শিক্ষা পাইয়াছে,—ইহা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু শিক্ষা পায় নাই—অথচ বুঝিতে পারিল, কথাটা কেমন হইল?

গুরু। শিক্ষা না পাইলে বুঝিতে পারে না ইহা ঠিক। কিন্তু শিক্ষা কি একই জন্মে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে? মানুষ ইহ জন্মে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু-অন্তে তাহার সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পাঁচ বৎসরের বণিক্ শিশু কলিকাতার মহারাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের ভবনস্থ সাহিত্য-সভায় বহু শিক্ষিত ও সভ্যমণ্ডলীর সমক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের অনর্গল আলোচনা করিয়াছিল। ডাক দেখি, তোমার পুত্রকে—সে সংস্কৃত শ্লোকের একটা চরণ আবৃত্তি করিয়া যাউক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক তান-লয় সংযোগে সুন্দর সুন্দর গান গাহিতে পারে,—তুমি আমি শত চেষ্টাতেও তাহার ভাব মুখে আনিতে পারি না। আমার জনৈক বন্ধুপত্নী গানের স্বর শুনিয়া উহা কোন রাগিণী, তাহা বলিয়া

দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার স্বামী বা পিতা কিম্বা ভ্রাতা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা সে সকলের কিছুই বলিতে পারেন না,—এ সকল পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের বলে, এ সকল অধীত বিদ্যা স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাহার সহিত প্রতিমা-তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

গুরু। আছে বৈ কি।

শিষ্য। কি সম্বন্ধ?

গুরু। যেমন আমরা সংস্কার-বলে শীঘ্র বা সহজাত-সংস্কার বলে আপনা-আপনিই সকল বিষয় জানিতে বা মনে করিতে পারি, তদ্রূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও জানিবে।

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তুমি বলিয়াছ, দেবতা সূক্ষ্মাদৃষ্টশক্তি,—মানুষ অন্ততঃ, হিন্দু-গণ তবে মৃণ্ময়ী, দারুময়ী, প্রস্তরময়ী বা ধাতুময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে কেন? সেই জড়শক্তিতে কি আছে?—এই ত তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু আপনি বুঝাইলেন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সহজাত-সংস্কার।

গুরু। সহজাত-সংস্কার বুঝাইবার কারণ এই যে, অধিকার ভেদের কথা বলিতেছিলাম। যে, শক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, তাহার পক্ষে জড় দেখিয়া শক্তির কল্পনা করিতে হয়, সে কথা এখন থাকুক,—তোমার প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, যাহারা সূক্ষ্ম শক্তির চিন্তা করিতে অধিকারী হয় নাই,—তাহারা খড় দড়ি রাং রাংতা বা কাঠ পাথর দিয়া সেই শক্তির মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা বা আরাধনা করিলে শক্তিতত্ত্ব আরাধনার ফল পাইতে পারে।

শিষ্য। কথাটা গোঁজা-মিলান গোছের হইল।

গুরু। কেন?

শিষ্য। শাস্ত্রে আছে,—

বিহায় নাম রূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদি কল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসো কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥
আহার সংযমাক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥
বায়ুপর্ণকণাতোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষীজলেচরাঃ॥
উত্তমোব্রহ্মসদ্ভাবে ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাঽধমাধমা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ১৪ উল্লাস।

যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। জপ, হোম ও বহুশত উপবাসেও মুক্ত হয় না। কিন্তু আমিই ব্রহ্ম সেই জ্ঞান হইলে দেহীর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; আত্মা সাক্ষী স্বরূপ,—

বিভু পূর্ণ সত্য অদ্বৈত ও পরাৎপর,—যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে। রূপ ও নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়; যিনি বাল্য-ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভে অধিকারী। যদি মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ-রাজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর জ্ঞানে যাহারা আরাধনা করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে; কারণ জ্ঞানোদয় না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। লোকে আহার সংযমে ক্লিষ্টদেহ বা আহার গ্রহণে পূর্ণোদর হউন, ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি হইতে পারে না। বায়ু, পর্ণ, কণা বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রতধারণে যদি মোক্ষ লাভ হয় তবে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জন্তু সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত। ব্রহ্ম সত্য, এই জ্ঞানই উত্তম কল্প, ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তব ও জপ অধম, বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম।

শাস্ত্র-বাক্য স্মরণ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, কেবল যে, বিধর্ম্মি-গণই আমাদিগকে পৌত্তলিক ও জড়োপাসক বলিয়া উপহাস করেন, তাহা নহে। আমাদের শাস্ত্রও এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। বোধ হয়, পৌরাণিক কালের গল্পের রাজত্বের সময় বৈদিক দেবশক্তিগুলি কাল্পনিকের কল্পনাবলে হস্ত পদ বিশিষ্ট ও জড়ে পরিণত হইয়া আমাদের পূজা ও আরাধনা লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য,—পৌত্তলি-কতা যে, মোক্ষের কারণ নহে, তাহা খাঁটি সত্য। আপনার কি মত?

গুরু। আমার মতে তোমার মতে, আর দুই একজন ব্যক্তির মতে কি ধর্ম্মমত গঠিত হইবে?

শিষ্য। না, আমি সে মতের কথা বলিতেছি না। আপনার এ সম্বন্ধে কিরূপ কি বিবেচনা হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

গুরু। তোমার যাহা মত, তাহা আগে বলিয়া যাও, তাহার পরে আমার মত বলিতেছি।

শিষ্য। আমার কথা ত আপনাকে বলিলাম।

গুরু। আমার কথাও বলিতেছি। তোমরা ইংরাজী শিক্ষিত যুবক,—তোমরা একটু চঞ্চলচিত্ত—একথা আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। তোমরা কোন কথাই ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া দেখ না, ঐ একটা বড় উপসর্গ। তোমরা প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা কর যে, "মনের কল্পিত মূর্ত্তি যদি জড়োপাসক হইত, তবে স্বপ্ন-প্রাপ্ত—রাজ্যেও লোকে রাজা হইত,—আর উপবাস-ব্রতাদি করিলে যদি লোকের মোক্ষ হইত, তবে সর্পাদির মোক্ষও করতলস্থ হইত।"—কিন্তু ভাবিয়া দেখ না, হিন্দু কিসের জন্য ঐ সকলের বিধি বিধান করিয়াছেন! উহার তলে কত কত মণি মুক্তা প্রথিত আছে। কালিদাসের সাহিত্য পুস্তকগুলি তুমি পাঠ করিয়াছ কি?

শিষ্য। হাঁ, পড়িয়াছি বৈ কি। সে রত্নদর্শনে কাহার না সাধ যায়?

গুরু। কালিদাসি-সাহিত্য তোমার নিকট কি খুব মধুর লাগে?

শিষ্য। আমার নিকট কি মহাশয়! জগতের এমন লোক নাই, যাহার নিকট সে ভাবের, সে রচনার, সে সৌন্দর্য্যের আদর না হইবে,—এমন লোক নাই যে, তাহার রসাস্বাদনে আপনাকে অমৃত ফলভোগী বলিয়া জ্ঞান না করিবে।

গুরু। তোমার ভৃত্য রামসদয়কে ডাক দাও—আর রঘুবংশ খানা বাহির কর।

শিষ্য। সে কি?

গুরু। আমি রঘুবংশ পড়িয়া যাই,—সে অমৃত-ফল-ভোগের সুখ উপভোগ করুক।

শিষ্য। (হাসিয়া) সে তাহা বুঝিতে পারিবে কেন?

গুরু। এই যে বলিলে সকল লোকেই—তাহার রসাস্বাদনে পুলকিত।

শিষ্য। ও যে মূর্খ!

গুরু। তবে কি ও মানুষ নহে?

শিষ্য। মানুষ, কিন্তু শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই।

গুরু। শিক্ষা হয় কিরূপে?

শিষ্য। অনুশীলন করিলে।

গুরু। তদর্থে উহার এখন কি করা কর্ত্তব্য?

শিষ্য। বর্ণ পরিচয় করা।

গুরু। তার পরে?

শিষ্য। ব্যাকরণ-সাহিত্য পাঠ করা।

গুরু। তাহা হইলেই কি কালিদাসের কবিতার রসাস্বাদনে সক্ষম হইবে? তোমার কি বিশ্বাস যে ব্যাকরণ-সাহিত্যে জ্ঞান থাকিলেই কাব্যের রস-আস্বাদনে মানুষ সক্ষম হয়?

শিষ্য। না, তাহাও হয় না। অনেকে পাঠ করিতে পারে, অর্থ বুঝিতে পারে—কিন্তু ভাব গ্রহণে অক্ষম।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ভাব বৃত্তির অনুশীলন অভাবে।

গুরু। ভাল কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, জগতের সমধিক জটিল ও দুঢ় ভাব কি? আত্ম পরিচয় নহে কি? আত্মজ্ঞান লাভই সমধিক কঠিন। সেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কি একেবারেই ব্রহ্মভাব ভাবিতে গেলে, তাহা সাধন হয়? যাহারা তোমার ভৃত্যের মত অধ্যাত্ম বিষয়ে মূর্খ, তাহারা কি প্রকারে সে ভাব, অনুভব করিতে পারিবে? তাই তোমার ভৃত্যের যেমন কালিদাসি-কবিতার ভাব গ্রহণ জন্য বর্ণ

পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া অত গুলি শিক্ষা করিতে হইবে,—আর যাহারা অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহাদিগকেও দেবতাপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া তবে ব্রহ্মোপাসনায় যাইতে হইবে। দেবতা সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তি—অদৃষ্ট-শক্তিকে জয় করিতে না পারিলে, তবে ঈশ্বরোপাসনা কি করিয়া করা যাইতে পারিবে? যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে তুমি সকল বচন উদ্ধৃত করিলে, সেই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেই দেবতা পূজার বিধিব্যবস্থা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে। কেন, তাহা বুঝিতেছ কি:? শক্তিমান্ না হইলে কোন কার্য্যেই অধিকারী হওয়া যায় না। দেবতা-আরাধনায় মুক্তি হয়। একথা হিন্দু শাস্ত্রের কোন স্থানেই নাই। তবে দেবতা-আরাধনায় মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসের যে শ্লোকগুলি তুমি বলিলে, তাহার পরের শ্লোকগুলি তোমার মুখস্থ আছে কি?

শিষ্য। না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ঐ গুলি মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম।

গুরু। ঐ আর একটি প্রধান উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছাপার কেতাব হইয়া, ঘরে ঘরে শাস্ত্রগ্রন্থ—আদ্যন্ত পাঠ করা নাই—গুরুর নিকট উপদেশ লওয়া নাই, শাস্ত্রের সামঞ্জস্য নাই, একস্থানে খুলিয়া মনের মত গোটা-দুই শ্লোক মুখস্থ করিয়া তাহা লইয়াই মারামারি। উহার পরের গুটিকয়েক শ্লোকের প্রতি মনঃসংযোগ ও তাহার তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে, আর এত গোলে পড়িতে না। সে শ্লোক কয়টি এই,—

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।

কিন্তস্ত জপযজ্ঞাদৌ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ॥
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যান-ধারণা ॥
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥
অয়মাত্মা সদামুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কর্ম্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্জ্জনাঃ ॥
স্বমায়া রচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি ॥
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ।
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্ ॥
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষীস্বরূপতঃ ॥
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জন্মঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ॥
জন্ম-যৌবন-বার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়া প্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যন্ত্যনেকধা।
তত্রৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মা সমীক্ষতে ॥
যথা সলিল চাঞ্চল্যং মন্যতে তদ্গতে বিধৌ।
তত্রৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাড়িজ্ঞকোবিদাঃ ॥
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোমো ঘটেভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টদেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥
প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽন্যপরং প্রিয়ম।
লোকেঽপ্রিয়াত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ১৪ শ উঃ।

“জীব ও আত্মার একীকরণের নাম যোগ, সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্য পূজা ;—কিন্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ বা পূজার প্রয়োজন নাই। যাঁহার অন্তরে প্রধান জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই। যিনি সর্ব্বস্থলে নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-পদার্থ দর্শন করিয়াছেন, স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া তাঁহার পূজা ও ধ্যান-ধারণার আবশ্যক নাই। সকলই ব্রহ্মময় এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জ্জন্ম, ধ্যেয় বস্তু ও ধ্যাতার প্রয়োজন করে না। এই আত্মা সতত বিমুক্ত এবং সকল বস্তুতে নির্লিপ্ত, এই জ্ঞান জন্মিলে তাঁহার বন্ধন বা মুক্তি কোথায়, এবং কি জন্যই বা দুর্ব্বোধ লোকে কামনা করে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। মায়া প্রভাবে এই জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা দেবগণেরও অসাধ্য। পরম ব্রহ্ম ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত আছেন। যেরূপ সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তরে আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষী স্বরূপ এই আত্মাই সর্ব্বত্র অবভাসিত রহিয়াছেন। আত্মার জন্ম, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই, তিনি সতত চিন্ময় ও বিকার শূন্য। দেহীর দেহেই জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু আত্মার ঐ সকল নাই। যাহাদিগের বুদ্ধি মায়াবিমুগ্ধ, তাহারা দেখিয়াও উঁহাদিগকে পায় না। যেরূপ বহু শরাবস্থ সলিলে বহুতর সূর্য্য

সংলক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মা, মায়া প্রভাবে বহু শরীরে বহির্ভাগে লক্ষিত হইয়া থাকেন। যেরূপ জল চঞ্চল বলিয়া প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও চঞ্চল বলিয়া অনুমিত হয়, তাহার ন্যায় অজ্ঞানী লোকে বুদ্ধির চাঞ্চল্যে আত্ম-দর্শন করিয়া থাকে। ঘট ভগ্ন হইলে তৎস্থিত আকাশ যেরূপ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকেন। হে দেবি! আত্মজ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে, জীব সত্য সত্যই মুক্ত হইয়া থাকে। লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান, পুত্রোৎপাদন এবং ধনব্যয়ে মুক্ত হয় না, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেই মুক্ত হইয়া থাকে। আত্মাই সকলের প্রেমাস্পদ, ইহা অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর নাই। হে শিবে! অপর লোকে আত্ম-সম্বন্ধানুসারেই প্রিয় হইয়া থাকে। মায়া প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি প্রতিভাত হইয়াছে, এই তিনটির বিষয় সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা যাঁহার ইহা বোধ হইয়াছে, তিনিই আত্মবিৎ।"

এক্ষণে তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, আত্মজ্ঞানই জীবের চরমোদ্দেশ্য; এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তবে পূজাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূজাদির প্রয়োজন। কোন পদার্থের অনুসন্ধানেই অন্ধকারে আলোকের আবশ্যক,—কিন্তু সেই পদার্থ কুড়াইয়া পাইলে, তখন আলোকের আর আবশ্যক নাই।

শিষ্য। আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইয়াছি কি?

গুরু। আমি তোমার প্রশ্নের ভাব যেরূপ বুঝিয়াছি,—তদ্রূপ উত্তরই দিয়াছি।

শিষ্য। হয়ত প্রশ্ন করিবার দোষে আমিই গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছি।

গুরু। না, গোল কিছুই পাকাও নাই;—পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহাতে এইরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে। ফল তোমার মনের ভাব এই যে, আমরা জড়ের আরাধনা করিব কেন? দেবশক্তির আরাধনা,—সে ত সূক্ষ্ম এবং চৈতন্য, তবে জড়ের আরাধনা করা কেন?

শিষ্য। হাঁ তাহাই।

গুরু। সে কথারও ত উত্তর পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। জড়াজড় যাহা কিছু আছে, সমস্তই ব্রহ্ম—সকলই সেই চিন্ময়-শক্তি। ইচ্ছা দ্বারা সে শক্তি যাহাতে কল্পিত হইবে, তাহাতেই তাঁহার বিকাশ পাইবে।

শিষ্য। কথাটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

গুরু। কি কঠিন হইল?

শিষ্য। যাহার যেরূপ কল্পনা, সেইরূপ ভাবে ভাবিলেই তাহাতে ব্রহ্ম শক্তির বিকাশ পাইবে?

গুরু। তাহা হইলে দোষ কি হইল?

শিষ্য। এইত পূর্ব্বোদ্ধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোকে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে, মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মোক্ষসাধনী হইত, তবে স্বপ্ন-লব্ধ-রাজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। আপনি বলিতেছেন, মানসিক ঘটনানুযায়ী কল্পিত মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের বিকাশ হয়। তাহা হইলে সেই কথা কি শাস্ত্রবিরোধী হইল না?

গুরু। না, শাস্ত্র বিরোধী হয় নাই। মানসিক ঘটনানুযায়ী কল্পিত মূর্ত্তি মোক্ষদাত্রী নহে, কিন্তু মোক্ষ-প্রাপ্তির-পথের প্রদর্শিকা। এটুকু প্রভেদ বুঝিলে, আর গোলযোগ ঠেকিবে না।

শিষ্য। আমি যদি আমার স্ত্রীর মূর্ত্তি কল্পনায় ভাবিতে ভালবাসি, তবে কি তাহাই আমার মোক্ষপথের পথ প্রদর্শিকা হইবে।

গুরু। দেখ, বাহ্য-জগতের রূপ হইতে বিভিন্ন একটি রূপের কল্পনা মানুষের হৃদয়ে আরোপিত হইয়া থাকে। মানুষ স্ত্রীর রূপে তাহাকে ভালবাসে না, সেই মনের অবস্থিতরূপ স্ত্রীর উপর আরোপিত করিয়াই তাহাকে ভালবাসে। নতুবা স্ত্রীকে লোকে আজীবন কাল ভালবাসিতে পারিত না। যখন বিহারের ফুলশয্যায় সেই লাজ মাখান আঁখি, সরমের সখারপানে দুরু দুরু মরমে চাহিতে গিয়া দশবার থামিয়া পড়িয়াছে, সেই ঝুম্‌রো ঝুম্‌রো কেশ গুচ্ছ, সেই ক্ষুদ্র হাত পা, সেই ক্ষুদ্র দেহ প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলে,—প্রভাতে শয্যাত্যাগের সময় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধ্বনি ছাড়িয়াছিলে,—"ওহি রূপ লাগরহি মেরি নয়ন মে।" কিন্তু তাহা থাকিল কৈ? পাঁচ বৎসর পরে, সকলই পরিবর্ত্তনের পথে আসিল,—সে ক্ষুদ্র গিয়া বৃহৎ হইল। সে লজ্জা গিয়া প্রগল্‌ভতা আসিল,—সব পরিবর্ত্তন; সব নূতন! এরূপেও তোমার মানস-মোহিত থাকিল,—যৌবন সুষমার পানে চাহিয়া চাহিয়া তোমার চিত্ত বলিল,—"সারাটি দিবস ধরি, দেখিনু ও রূপরাশি, না মিটিল হৃদয়-পিয়াসা।" তারপরে, প্রৌঢ়কালে যখন যৌবন বসন্ত জবাব দিয়া চলিয়া গেল, তখন আবার পরিবর্ত্তন—আবার নূতন। কিন্তু ভালবাসা গেল না। তোমার হৃদয় গাহিল—"না হইলে বয়োধিকে রসিকে প্রেম জানে না।" বার্দ্ধক্যেও এ প্রেম দূরীভূত হইল না। তবে প্রেম কোথায়? ভালবাসা কোথায়? বাঞ্ছিতের দেহে; না, তোমার মনে? প্রত্যেক মানুষের চিত্তে এক একটা সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আছে,—সেই সৌন্দর্য্য-স্পৃহার শক্তি-সামঞ্জস্য লইয়াই দেবতা। দেবতার আরাধনা করিয়া মানুষের একাগ্রতার পথে ধাবমান হওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবতত্ত্ব।

শিষ্য। তাহা হইলে যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ কল্পনা করিয়া আরাধনা করিতে পারে?

গুরু। কথাটা আর একবার বলি শুন। আরাধনা প্রভৃতি করিবার কি উদ্দেশ্য বুঝিতে পার?

শিষ্য। আত্মোন্নতি লাভ করা।

গুরু। আত্মোন্নতি কি প্রকারে হয়?

শিষ্য। সম্ভবতঃ চিত্তস্থিরের দ্বারা।

গুরু। চিত্তস্থির কি প্রকার?

শিষ্য। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থা।

গুরু। এই অবস্থাকে যোগ বলে।

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। এখন, ইহা হইবার উপায় কি?

শিষ্য। সেই ত কথা।

গুরু। হয়ত যিনি জন্ম জন্ম খাটিয়া আসিতেছেন, তাঁহার চিত্ত সহজেই স্থির আছে,—তিনি হয়ত ব্রহ্ম ভাবনা সহজেই করিতে পারেন। কিন্তু যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ নানক কয়টি জন্ম গ্রহণ করেন? অধিকাংশই তোমার আমার মত বদ্ধ জীব। বদ্ধ জীবের চিত্ত সর্ব্বদাই প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট—সর্ব্বদাই চারিদিকে দোদুল্যমান।

সর্ব্বদাই কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত। ইহাদিগের উপায়ের জন্যই প্রতিমা পূজা।

শিষ্য। প্রতিমা পূজায় ইহাদিগের কি উপকার হইবে?

গুরু। চিত্ত স্থির হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে হয়?

গুরু। কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছি। এক বস্তু বিষয়ক তীব্র ভাবনা বা উৎকট চিন্তা প্রয়োগের নাম যোগ ও সমাধি। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি। ইহা লাভ করিতে হইলে, কোন এক বিষয় বা পদার্থ ভাবনা করিতে হয়। সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্য পদার্থের জ্ঞান থাকে বটে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। চিত্ত তখন বৃত্তি শূন্য বা নিরালম্ব হইয়া কেবল অস্তিত্বমাত্রে অবস্থিত থাকে। সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া যোগিরা বলিয়াছেন যে, সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। (সম্—সম্যক্, প্র—প্রকৃষ্টরূপে, জ্ঞা—জানা)। ভাব্য পদার্থের বিস্পষ্ট জ্ঞান অলুপ্ত থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম "সম্প্রজ্ঞাত" আর "ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে" কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম "অসম্প্রজ্ঞাত।"

যাহারা তীর ছুড়িতে শিক্ষা করে, তাহারা প্রথমে কোন স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে আরম্ভ করে; তারপরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়ে, এবং তাহাতে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সুপারগ হইয়া উঠে। সেইরূপ সাধকগণও প্রথমে দেবতার যে সূক্ষ্মশক্তি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, কাজেই তদবস্থায় স্থূলরূপ বা জড়ে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়। প্রথম যোগি-

গণও স্থূলতর শালগ্রামশিলা, রাধাকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তদুপরি ভাবনা স্রোত প্রবাহিত করেন।

শিষ্য। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম যোগিগণের ধ্যেয় বা ভাব্য বস্তু দুই প্রকার। স্থূল ও সূক্ষ্ম।

গুরু। হাঁ; "স্থূল" ও "সূক্ষ্ম" এই দুই শব্দের দ্বারা যাহা বুঝা যাইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাদের ভাব্য বা ধ্যেয় বটে, কিন্তু তাহার ভিতরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহা এই যে,—বাহ্য স্থূল ও বাহ্য সূক্ষ্ম; এবং আধ্যাত্মিক স্থূল ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,—এই পাঁচ প্রকার ভূত, বাহ্য স্থূল নামে অভিহিত। আর ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক স্থূল নামে কথিত হইয়া থাকে। উহাদের কারণীভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রা বা পরমাণু সকল এবং অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব নামক অধ্যাত্ম বস্তুসকল যথাক্রমে বাহ্য সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন আত্মা ও ঈশ্বর, এই দুই পৃথক্ ভাব্য বস্তুও আছে। এই সকল ভাব্য অবলম্বন করিয়া চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে ভাব্য বস্তুর সামর্থ্যাদি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা আরাধনায় কি পৃথক্ পৃথক্ ফললাভ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। তা ঘটে না? তবে কি গণেশ, সূর্য্য, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, শালগ্রাম প্রভৃতি সকল দেবতার আরাধনাতেই এক প্রকার ফল হইয়া থাকে?

শিষ্য। কথাটা আর একবার বুঝিয়া লই। আমি কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিতেছি, হারাধন রামমূর্ত্তির পূজা করিতেছে, কৃষ্ণধন শ্যামা ঠাকুরাণীর পূজা করিতেছে—ফল কি পৃথক্ পৃথক্ হইবে?

গুরু। ।.তাহা হইবে বৈ কি।

শিষ্য। কেন, আপনিইত পুর্ব্বে বলিলেন, যে কোন পদার্থে মনঃ-সংযোগ করিয়া চিন্তাস্রোত প্রতিহত করা মাত্র।

গুরু। তাহাতে কি হইল? যে কোন পদার্থে মনঃসংযোগ করিলে, তাহার ফলে চিন্তাস্রোত একমুখী হয় বটে, কিন্তু চিন্ত্য পদার্থের শক্তিবলে ফল কি পৃথক্ হয় না? আমাদের আশে পাশের জিনিষগুলা লইয়াই দেখ না কেন। খুব অনেকক্ষণ একাগ্রচিত্তে যদি ফুলের বিষয় চিন্তা করিতে থাক, মনে কি আনন্দের উদয় হয় না? আর মৃতদেহের চিন্তায় কি ভয়ের উদয় হয় না? সেইরূপ চিন্ত্যবিষয়ের শক্তি ও সামর্থ্যবলে সাধকেরও ফললাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি দেবমূর্ত্তির শক্তির কথা বলিতেছেন কি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কোন বিগ্রহ মাটীর গঠিত, কোন বিগ্রহ পিতলের গঠিত, কোন বিগ্রহ কাষ্ঠের গঠিত, ঐ সকল পদার্থের কি পৃথক শক্তি?

গুরু। মূর্খ! তাহা নহে। সেই দেবতার শক্তি।

শিষ্য। ঐ জড় বা পুতুলের মধ্যে কি দেবতা আসিয়া থাকেন।

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কি প্রকারে আইসেন?

গুরু। কি প্রকারে আইসেন, তাহা পরে বলিতেছি। এখন ধরিয়া লও, আসুন আর নাই আসুন—না হয়, মনে কর, আসেন না—সে কাষ্ঠ, মাটী, না হয় পিত্তল কিম্বা পাষাণ। আমাদের মতই একটি মনুষ্য তাহাকে ঐরূপে বানাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই মূর্ত্তির গঠন-প্রণালী কি তাহার কল্পিত, না তোমার আমার কল্পিত?

শিষ্য। আপনার আমার না হউক, আমাদেরই মত অন্য কোন মনুষ্যের হইতে পারে।

গুরু। তোমার আমার মত মানুষের নহে। আমাদের চেয়ে উন্নত মানুষের।

শিষ্য। কি প্রকার উন্নত ?

গুরু। যাঁহাদের চিন্তাস্রোত একমুখী হইতে পারিয়াছে।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যাঁহারা যোগ ও সমাধিবলে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সংবাদ লইতে শিক্ষা করিয়াছেন।

শিষ্য। তাঁহারা কি প্রকারে ঐ ঐ শক্তির যে ঐ ঐ রূপ তাহা জানিতে পারিলেন ?

গুরু। কোন সূক্ষ্ম শক্তিতে বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিয়া সমাধি লাভ করিতে পারিলে তাহার পূর্ণ মূর্ত্তি হৃদয়ে উদ্ভূত হয়। যাহার ভালবাসা কোন মানুষে পায় নাই—কিন্তু ভালবাসার শক্তি লইয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহার ভালবাসা মূর্ত্তিমতী হইয়া একটি রূপ গঠিয়া লয়। আপনিই সে রূপ উদয় হয়। এইরূপ—যে, যে শক্তির আরাধনায় চিন্তাস্রোতকে একমুখী করিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট সেই শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া দর্শন দান করিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি ; শোন।

"এক ক্ষুদ্র পল্লীতে অনেকগুলি লোকের বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, মালী, মুদী, ময়রা, মুচি, মুসলমান—সর্ব্বশ্রেণীর জাতিই সে গ্রামে বসতি করিত।

একদা এক ব্রাহ্মণের গুরুদেব তাঁহার শিষ্যের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবের শাস্ত্রজ্ঞান, সৎনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্ত গুণই বিদ্যমান। গ্রামশুদ্ধ লোক ঠাকুরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

সেই পল্লীতে বৈকুণ্ঠ নামক এক মুচি বসতি করিত। বৈকুণ্ঠের

প্রাণে ধর্ম্মের একটা নেশা লাগিয়াছিল। কি প্রকারে সে আত্মোন্নতি করিতে পারে, কি প্রকারে সে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়া মানব জন্ম সফল করিতে পারে, সর্ব্বদাই সে সেই চিন্তা করিত।

ব্রাহ্মণের গুরুদেব শিরোমণি মহাশয় একদা সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ রাস্তায় বাহির হইয়াছেন, সেই সময়ে বৈকুণ্ঠ মুচি তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। শিরোমণি মহাশয় তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—আজ্ঞে আমার নাম বৈকুণ্ঠ মুচি। আপনার নাম শুনিয়া কয়দিন ধরিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইযাছি, অদ্য দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

শিরোমণি মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কেন আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন?"

বৈকুণ্ঠ। আপনার নিকটে ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

শিরোমণি। তুই মুচি—আমাদের শাস্ত্রানুসারে তোর সহিত আলাপ করিতেও নাই। তোকে কি ধর্ম্মকথা শুনাইব?

বৈকুণ্ঠ। তবে কি মুচির ধর্ম্ম করিতে নাই? তাহারা কি মুচি হইয়াছে বলিয়া চিরকালই অধার্ম্মিক থাকিয়া যাইবে?

শিরোমণি। কেন, তোদের গুরু, পুরোহিত আছে; তাদের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্।

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞে আমার গুরু নাই। আপনিই আমার গুরু হউন।

শিরোমণি। রাম! রাম! ওকথা মুখেও আনিস্ না। উহাতে আমার জাতি যাইবে?

বৈকুণ্ঠ। কেন মহাশয়! আমার গুরু হইলে আপনার জাতি যাইবে কিসে?

শিরোমণি। পাগল! মুচির গুরু কি ব্রাহ্মণে হয়?

বৈকুণ্ঠ। বামুনে হয় না, তবে কে হয়? আমার গুরু আপনাকে হইতেই হইবে।

একথা কেহ শুনিতে পাইল কি না, দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। বৈকুণ্ঠও নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে সে দিন ফিরিয়া গেল। কিন্তু মনে মনে কেমনই একটা ঐকান্তিকতা জন্মিল যে, ঐ ঠাকুরের নিকট হইতে সে দীক্ষা গ্রহণ করিবে; এবং সেই দীক্ষাবলেই সে উদ্ধার হইতে পারিবে।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের পাছে লাগিল। তিনি যেখানে যান, বৈকুণ্ঠও সেখানে যায়। এইরূপে কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই—বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন ঠাকুরের ভয় হইল, পাছে সে লোকের সাক্ষাতে বলে যে, ইনি আমার গুরুদেব; সেই জন্য সংসারের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া গুরু-সেবার্থ ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াই। তাহা হইলে "মুচির গুরু বলিয়া" লোকে আমার জাতি পাত করিবে।

শিরোমণি ঠাকুর সে কথা বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন। বৈকুণ্ঠ বলিল,—"আমাকে মন্ত্রদান না করিলে, আমি কখনই আপনার নিকট হইতে যাইব না।"

শিরোমণি ঠাকুর নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বেটা, তুই আমার জাতি নাশ না করিয়া আর ছাড়বি না।"

বৈকুণ্ঠ বিষণ্ণমুখে বলিল, "ঠাকুর আপনি গুরু, আমি শিষ্য। আপনার অনিষ্ট কি আমি করিতে পারি? তবে আমায় একটা মন্ত্র বলিয়া দিন, আমি ঘরে গিয়া তাহারই সাধনা করিব—আর কখনও আপনার নিকটে

আসিব না। কিন্তু যাবৎকাল আপনি আমায় মন্ত্রদান না করিতেছেন, তাবৎকাল আপনার চরণছাড়া হইব না।"

শিরোমণি ঠাকুর বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ক্রোধ-রক্ত মুখে বলিলেন,—"মন্ত্র ঢেঁকি যা বেটা সাধনা করগে।"

বৈকুণ্ঠ প্রসন্নমুখে "ঢেঁকি" মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। এবং পুরোহিত ডাকাইয়া মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়া সে "ঢেকি" মন্ত্রের সাধনা করিতে লাগিল।

সাধনায় তাহার চিত্ত একমুখী হইয়া আসিল। তাহার চিন্তাস্রোত ঢেঁকির উপরে' প্রাতগত হইয়া পড়িল,—সে ঢেঁকি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিল।

ঢেঁকি তাহাকে প্রচুর ধন-ধান্য প্রদান করিতে লাগিল,—মুচি মহা ঐশ্বর্য্যবান্ হইল।

কিয়দ্দিবস পরে, শিরোমণি ঠাকুর তাঁহার ঐ গ্রামস্থ শিষ্যালয়ে আগমন করিলে, বৈকুণ্ঠ একদা অতি নিভৃত স্থলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, শিরোমণি ঠাকুর বলিলেন,—"কিরে বৈকুণ্ঠ কেমন আছিস্?"

বৈকুণ্ঠ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে আপনার প্রসাদে আমি ভালই আছি। আমার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে। আমি ইষ্টদেবতার প্রসাদে অনেক ধন-ধান্য প্রাপ্ত হইয়া এখন অবস্থাপন্ন হইয়াছি। যদি দয়া করিয়া শিষ্যের প্রণামি কিছু গ্রহণ করেন,—আজ্ঞা করিলে, গোপনে আপনাকে হাজার দশেক টাকা আনিয়া দিতে পারি।"

দশ হাজার টাকা প্রণামি! শুনিয়া শিরোমণি ঠাকুরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল! আর "ঢেঁকি" মন্ত্র সিদ্ধ হইল কি? তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর দেবতা কি প্রকারে দর্শন দান করিয়া থাকেন?"

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞে প্রথম প্রথম আমরা যেরূপ ঢেঁকিতে ধান ইত্যাদি ভানিয়া থাকি,—সেইরূপ মূর্ত্তি আমার হৃদয়-মধ্যে উদিত হইত। তারপরে সে ঢেঁকি আর ধ্যানে দেখিতে পাইতাম না—তখন যেন সেই ঢেঁকির মধ্যস্থ এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতাম। সে মূর্ত্তি যে কেমন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না,—তবে সেও যেন ঢেঁকিরই অবয়ব—কিন্তু শক্তিশালী। তার পর সেই মূর্ত্তি আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, এবং আমাকে ধন-ধান্য প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেন।

শিরোমণি ঠাকুর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন। তারপর তাহার প্রদত্ত টাকাগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা আর জানা যায় নাই। সে সংবাদে আমাদের প্রয়োজনও কিছু নাই।

শিষ্য। গল্পটা আরব-দেশীয় বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। তাহা হইতে পারে,—কিন্তু উহার মধ্যে অনেকটা সার আছে।

শিষ্য। কি সারবস্তু আছে, বুঝিতে পারিলাম না। বৈকুণ্ঠের ইষ্ট দেবতা ঢেঁকির মতই অসার।

গুরু। তাহা নহে। চিত্তের একাগ্রতা ঘটিলে যে, বহিঃ প্রকৃতির শক্তি আয়ত্তীভূতা হয়,—তাহা ঐ গল্পটায় বুঝিতে পারা যায়।

শিষ্য। তাহা হইলেও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি অল্প।

গুরু। অল্প নহে; অতি অধিক! আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে কোন একটি ভাব্য অবলম্বন করিয়া ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে, ভাব্য-বস্তুর সামর্থ্যাদি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইতে পারে। সমাধির প্রারম্ভেই যদি বাহ্য-স্থূলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার-রূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে তাহাকে বিতর্ক বলা যায়। বাহ্য-

সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, তাহা "বিচার" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাত্মিক স্থূল যদি সমাধির আলম্বন হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ-প্রজ্ঞা জন্মে,—তাহা হইলে সে অবস্থার নাম "আনন্দ।" বুদ্ধি সম্বলিত অভিব্যঙ্গ্য চৈতন্যে অর্থাৎ জীবাত্মাতে যদি তাদৃশ আভোগ (সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা) জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাম "অস্মিতা।" এই বিভাগ অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকার বিভাগে বিভক্ত। ইহাদের ক্রমানুগত শাস্ত্রীয় নাম "সবিতর্ক" "সবিচার". "সানন্দ" ও "অস্মিতা।" এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সাধিত হয়,—তাহা স্বতন্ত্র; এবং তাহার ফলও স্বতন্ত্র। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ সাধিত হইলে, তৎকালে কোন প্রকার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। সে সাধক পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্প-কল্পান্ত অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত ভাব্যসমূহের যে কোন ভাব্যের উপর ধ্যান-প্রবাহ ছুটাইবে,—ধ্যান পরিপক্ক বা প্রসার হইলে চিত্ত অল্পে অল্পে সেই সেই ভাব্যের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। চিত্ত তখন তন্ময় হইয়া অবিচাল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান বা মনোবৃত্তি উদিত থাকিবে না। ভবিষ্যতে যদি কখনও উদয়োন্মুখ হয়, তথাপি তাহা সেই ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত স্থিরবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাদৃশ স্থির-বৃত্তি যখন কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না, তখন তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলিয়া উক্ত করা হইয়া থাকে। বল দেখি, যখন তুমি কোন ঘটের কি পটের ধ্যান কর,—তখন তোমার ঘটজ্ঞানের সঙ্গে অথবা পটজ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্ত্র খণ্ডের জ্ঞান থাকে কি না?

শিষ্য। অবশ্যই থাকে।

গুরু। "আমি" জ্ঞান থাকে?

শিষ্য। হাঁ, তাহাও থাকে।

গুরু। আবার কখন কখন বোধ হয় এমনও হইয়া থাকে যে, ঘটজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবল 'আমি' জ্ঞান ও মৃত্তিকা জ্ঞান একত্র জড়িত হইয়া এক বা অভিন্ন আকারে স্ফুরিত হইতে থাকে। আবার এরূপও হয়, উক্ত দুই জ্ঞান পরস্পরে পৃথক্ থাকে, অথচ তাহাদের পূর্ব্বাপরীভাব থাকে না। আবার কখন কখন এমনও হয়, অন্যান্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান, অথবা মৃত্তিকা-জ্ঞান, অথবা কেবলমাত্র "আমি" জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। এরূপ হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যদি কখনও ভাবিতে ভাবিতে হতজ্ঞান হইয়া থাক, যদি কখন ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত তন্মনা হইয়া থাক, তবে বুঝিতে পারিবে, ঐরূপ হয় কি না,—নতুবা হয়ত নাও বুঝিতে পার। যাহাই হউক, উক্ত দৃষ্টান্তে, ধ্যানের বা সমাধির পরিপাক দশায় যদি ধ্যেয়বস্তুর জ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্ঞান না থাকে, অর্থাৎ অহং-জ্ঞান, কি ধ্যেয়-বস্তুর উপাদান জ্ঞান, কিংবা তাহার নাম-জ্ঞান না থাকে, (প্রতিমাকার জ্ঞান ব্যতীত প্রতিমার নাম জ্ঞান কি তাহার উপাদান জ্ঞান অর্থাৎ প্রস্তরাদি জ্ঞান না থাকে;) অর্থাৎ চিত্ত যদি সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায়, তাহা হইলে সে প্রকার সমাধি সবিতর্ক না হইয়া নির্বিতর্ক সমাধি হইবে। সবিচার স্থলে উক্ত প্রকার তন্ময়তা ঘটিলে তাহাকে নির্বিচার বলা যাইবে। সানন্দ ও সস্মিতা নামক সমাধিতে উক্তবিধ তন্ময়ীভাব জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় বলা যাইবে। যদি আত্মা ও ঈশ্বর বিষয়ক-সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক দশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, তাহা হইলে যথাক্রমে নির্ব্বাণ ও ঈশ্বর-সাহায্য প্রাপ্ত বলা যাইবে।

আর যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি উক্তবিধ ভাবনাপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে তন্ময় করিয়া মৃত হন; আর

মরণের পরেও যদি তাঁহার সে তন্ময়তা নষ্ট না হইয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই যোগীকে বিলয় দেহী বলা হয়। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব অথবা কোন এক তন্মাত্রায় লীন হইলে তাঁহাদিগকে প্রকৃতি-লয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দৈব বল।

শিষ্য। দেবতাগণের পূজার বিষয় শুনিবার আগে, আর একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কি কথা বল?

শিষ্য। অনেকে বলেন, অমুক স্থানে দেবতার আবেশ হইয়াছে—যথা কোন স্থানের কোন বৃক্ষে, কোন নদীতে, কোন পাষাণ বা মৃন্ময় পদার্থে। আপনি আপনি কি প্রকারে দেবশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে?

গুরু। হাঁ, ঐ সকল স্থানে ঐ প্রকারে দেবতার আবেশ হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থান থাকিতে একটি স্থানে হঠাৎ দেবতার আবেশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিকাশ দৈবশক্তিদ্বারায় হয় না, মানুষের সাধন বলেই হয়।

শিষ্য। না, না। আপনি কি শুনেন নাই,—কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ গুজব উঠিল, অমুক গ্রামে অমুক গাছে পঞ্চানন্দঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে,—সেখানে ধন্না দিলে মানুষের রোগ সারিতেছে,—কামনা পূর্ণ হইতেছে। হয়ত শোনা গেল, অমুক গ্রামের ঘোষের

পুকুরে হরিরবার উঠিয়াছে—অমুক গ্রামের রাস্তায় পতিত পাষাণ-খণ্ডে কালীর আবির্ভাব হইয়াছে। সেখানে কোন মানুষ নাই, জন নাই—হঠাৎ এ দৈববল কোথা হইতে প্রকাশ পায়? আপনি কি ইহাতে বিশ্বাস করেন।

গুরু। সকল স্থানেই সেরূপ হয়, তাহা বিশ্বাস করি না। তবে অনেক স্থলে হইতেও পারে, এবং তাহা মনুষ্য-কর্ত্তৃকই হয়। কোন সময়ে কোন যুগে হয়ত কোন সাধু সেখানে বসিয়া ঐ তন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তারপরে কত যুগ-যুগান্তর কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সাধনের ইচ্ছা-শক্তি-কণা সেখানে অবস্থিত ছিল, এতদিন ঘুরিয়া হঠাৎ তাহা শক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরিমিত অগ্নি কোথাও পড়িয়া থাকিলে, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া পড়ে—উহাও তদ্রূপ হয়। আবার অনেক স্থলে প্রথমে হয়ত কিছু হয় না,—হুজুগে লোকে হুজুগ তুলিয়া দেয়; তারপর ক্রমে ক্রমে লোকসমাগমে লোকের ইচ্ছাশক্তির বলে ক্রমে ক্রমে আবেশ হইয়া সেই স্থান দৈববলে বলী হইয়া উঠে।

শিষ্য। আমরা যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি,—তাহাতে কি আমাদের পাতক হয় না?

গুরু। দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাতক হইবে? হিন্দুর মুখে একথা এই নূতন শুনিলাম।

শিষ্য। উহাত শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম নহে।

গুরু। তুমি আমি নিকৃষ্ট জীব, আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আচরণ করিব কি প্রকারে? শাস্ত্রে আছে,—

সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে॥

যো যাং দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ; ১৩শ উঃ

শিব, শঙ্করীকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে, ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপথের অধিকারী। কামীর যেরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা বলিতেছি। যে, যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে সেই দেবলোকে গমন-পূর্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকে।" ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে ?

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম, যে, যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করে এবং আরাধনা করে,—তাহার সেই শক্তি তদ্বাধিত হয়।

গুরু। হাঁ, তাহাই।

শিষ্য। ভাল পথ কোন্‌টি ?

গুরু। নিষ্কামতা।

শিষ্য। তবে কামনার পথ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই কেন সেই পথে যায় না ?

গুরু। ধর্ম্মপথ ভাল না, পাপের পথ ভাল ?

শিষ্য। ধর্ম্মের পথ।

গুরু। তবে জগতের লোক সকলেই কেন ধর্ম্মের পথে যায় না ? যাহার যেমন কর্ম্মসূত্র সে, সেই পথেই যাইতে চায়। তবে শাস্ত্র-উপদেশ, মানুষের উপদেশ ও আদর্শে মানুষ সে পথে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আসিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহার সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব অবগত হইবার অধিকার নাই, সে কেন কল্পিত মূর্ত্তি জড়ে সে শক্তির আরোপ করিয়া আরাধনা না করিবে ?

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, দেবপ্রতিমার যে মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা যোগ-বলশালী ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত মূর্ত্তি। একথার ভাব আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। শাস্ত্রে আছে,—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্যনিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

"চিন্ময়, অদ্বিতীয়, কলা রহিত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কেবল উপাসক-দিগের সুগম কার্য্যের জন্য।"

'ব্রহ্মের রূপকল্পনা' এইরূপ পদ থাকায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের শক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া মানব-কর্ত্তৃকই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। আপনি বলিলেন, যোগীর হৃদয়ে—সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্ম কল্পিতরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কথায় শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে অসম্মিলন হইবার কারণ কি ?

গুরু। অসম্মিলন হয় নাই। তুমি ঐ শ্লোকটির শব্দার্থ বুঝিতে পার নাই। ওখানে "ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" "ব্রহ্মণো" এই শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তির পদ নহে, কৃদন্ত কল্পনা শব্দের যোগে কর্ত্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তির যোগ হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখ, সাধকের হিতার্থে চিন্ময়, অদ্বিতীয় কলা রহিত ব্রহ্ম কল্পিতরূপে দেখা দিয়াছিলেন,—এই অর্থ হয় কি না। এইরূপ সর্ব্বদেবতা সম্বন্ধে। তবে ব্রহ্ম না হয়, নিষ্কল, অদ্বিতীয় ও চিন্ময়—আর অন্যান্য দেবতা না হয়, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের সেই শক্তি লইয়াই তাঁহারা সাধকের হিতার্থে কল্পিতরূপে আবির্ভূত হয়েন।

শিষ্য। ইহাতে সাধকের কি হিত হইয়া থাকে ?

গুরু। যে সূক্ষ্মভাব ভাবিতে পারে না, তাহার পক্ষে স্থূল হইলে ভাবিবার সুবিধা হয়। সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইবার পূর্ব্বে স্থূলতত্ত্বে মনোভি-নিবেশ করিবার প্রয়োজন। মহাজন বাক্য এই যে,—

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ ॥"

মানুষ, চেষ্টা না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। এক একটি বিষয় সুসিদ্ধ করিবার জন্য মানবের কত যত্ন, কত ক্লেশ, কত অনুষ্ঠান করিতে হয়, কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়,—তাহা কার্য্যকারক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

কোন কার্য্য করিতে হইলে, আগে সেই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। প্রস্তুত না হইয়া, আপনাতে কার্য্যশক্তির উদ্রেক না করিয়া, সহসা যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন,—তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি দূরে থাকুক,—হয়ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব প্রস্তুত না হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা শ্রেয়স্কর নহে।

পূর্ব্ব সাধন আয়ত্ত করা, আর প্রস্তুত হওয়া এক কথা। প্রস্তুত হওয়া, আর অধিকারী হওয়া সমানার্থক। অতএব যিনি যেরূপ পূর্ব্ব সাধন আয়ত্ত করেন, তিনি তদ্রূপ প্রস্তুত অথবা তদ্বিষয়ে অধিকারী হন। যিনি যে বিষয়ে প্রস্তুত ;—তিনি সেই বিষয়ের অধিকারী,—অন্যে অনধিকারী। যিনি প্রস্তুত হন নাই বা পূর্ব্ব সাধন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তিনি সে বিষয়ে অনধিকারী বা অযোগ্য পাত্র ;—একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। পণ্ডিত হইবার জন্য, শিল্পী হইবার জন্য প্রথমতঃ যেমন পাণ্ডিত্যের ও শিল্পীর পূর্ব্ব সাধন করিতে হয়, বিবিধ দেবতার শক্তিতত্ত্বের আলোচনা ও আরাধনা করিয়া তদ্রূপ ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তির উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। একটি প্রাসাদকে উত্তমরূপে জানিতে হইলে, তাহার ইট্ কাঠ চুণ বালি সমস্ত গুলিই জানিতে হয়। জানিবার অর্থ, তাহাদের উপাদান, শক্তি ও একত্রীভূত হইবার কৌশলাদি অবগত হওয়া। তুমি মনে করিতে পার, একেবারে প্রাসাদটি দেখিয়াই তাহা জানা যাইতে পারে,—

কিন্তু ইহা কি এক মহাভুলের কথা নহে? প্রাসাদের তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, আগে সে জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে,—অর্থাৎ অন্য চিন্তা বা কার্য্য জানিবার সময়ের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে; তারপরে তাহার উপাদান-ঘটিত প্রত্যেক শক্তির অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে—তবে তদ্ বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারিবে। সেইরূপ মহান্ শক্তিশালী ব্রহ্মের বা আত্মার বিষয় জানিতে হইলে প্রস্তুত হইতে হইবে,—তিনি জগদ্রূপ, অতএব জগতের দেবশক্তিগুলি জানিতে হইবে, তাহার স্ফুরণ করিতে হইবে; এবং তাহার পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত করিতে হইবে। এইজন্যই সাধকগণ দেবতা ও আরাধনার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অনুষ্ঠান, পদ্ধতি ও প্রণালী প্রচলন করিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনার পূর্ব্বসাধন আয়ত্ত না করিয়া, যিনি সহসা উচ্চতম ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্যে ধাবিত হন, তাঁহার সমাধিলাভ দূরে থাক, হয়ত একেবারে সে পন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয়।

আজি কালিকার দিনে সকলেই একমুহূর্ত্তে যোগী বা সাধক হইয়া উচ্চাঙ্গের গুরু হইয়া বসিতে চান। বলা বাহুল্য এরূপ অবস্থায় গুরু ও শিষ্য উভয়েরই পারমার্থিক মঙ্গল সুদূর পরাহত হয়। এ কালের সহিত সেকালের তুলনা করিয়া দেখ,—তখনকার মানুষ, আপনার অধিকারমতই চলিতে চেষ্টা করিতেন। দেবতাআরাধনা, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বটবিটপী উৎসর্গ এবং দান, ধ্যান, যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ আত্মোন্নতি করিতেন। এখনও তাহাদের সৎকীর্ত্তি দিকে দিকে ঘোষিত হইতেছে। আর বর্ত্তমান কালে, অধিকার ছাড়িয়া উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠানে রত হইয়া লোকে একেবারেই ধর্ম্মবিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন।

পূজা, আহ্নিক, জপ, তপ এ সকলের মহান্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে

না পারিয়া, উহা বালকের ক্রীড়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, কেহ ভগবদ্গীতার নিষ্কামধর্ম্মী, কেহ চৈতন্যের প্রকৃতি পুরুষ, কেহ বুদ্ধের মায়া-বাদ, কেহ কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস গাইয়া ব্যস্ত হইতে যাইতেছেন। জানি সে সকল কার্য্য উত্তম ও সাধনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তোমার তাহাতে কি? তুমি সূচ গঠনে অক্ষম, কামানের বায়না নাও কেন? একটি লোকের জঠরানল নিবৃত্তির শস্য তোমার সঞ্চয় নাই, তুমি বিশ্বের তৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি কর কেন?

তোমার যেমন আছে, যেমন সঞ্চয় করিয়াছ, যেমন অধিকারী হইয়াছ। তদ্রূপ কার্য্য কর। অধিকার অনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ না করিলে, অনধিকার চর্চ্চায় কোনই ফল নাই। অধিকন্তু দুই এক দিন বা দুই এক মাস সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই একেবারে পতন হইতে পারে। অতএব, অধিকার ভেদে শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজা-প্রণালী ও তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

শিষ্য। এক্ষণে দেবতাগণের পূজা-প্রণালী ও তাহার যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে বড়ই বাসনা হইতেছে, অতএব আমার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। তোমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষাদৃপ্ত যুবকগণ ভাবিয়া থাক যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাহার নাই, তাহার কোন মূলও নাই—তাই তোমরা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, হাসি, কান্না সকল কাজেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বা খুঁজিয়া বেড়াও। কিন্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের এক মাত্র উপায় হইলেও সকল বিষয়ের উপযোগী নহে, অথবা বুদ্ধি সকল লোকের ও সকল কালের উপযোগী নহে। প্রায় সকল লোককেই অধিকাংশ সময়ে আপ্তবাক্য অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়;—এবং কোন বিজ্ঞানই আপ্তবাক্যের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না। যদি আপ্তবাক্যে মানবের বিশ্বাস না থাকে, সকলকে সকল অবস্থাতেই যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-

অবলম্বনে চলিতে হয়, তাহা হইলে মানবের দুঃখের সীমা থাকে না। যে হেতু মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই পরের অধীন হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র পরের কথার অধীন হইয়া পড়ে, তাহা নহে,—সর্ব্বপ্রকারেই পরের অধীন হয়। পরে খাওয়াইলে খাইতে পায়, পরে রক্ষা করিলে রক্ষিত হয়। অন্যে যাহা শিখায়, শিশু তাহাই শিখে। শিশু বড় হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করে; তাহাও পরের অধীন হইয়া,—অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন,—গ্রন্থকর্ত্তা যাহা বলেন, বালক তাহাই শিক্ষা করে। পিতা, মাতা, গুরু ও অন্যান্য পদস্থ লোকে যে উপদেশ প্রদান করেন, যে নীতি শিক্ষা দেন, শিশু তাহাই শিখে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে, অন্য লোকের জ্ঞাত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করা হইয়াছে,—যাঁহাদের মতামত সত্য বলিয়া জানা আবশ্যক, তাহার অধিকাংশ জানা হইয়াছে, সেই মহাজন-পরিজ্ঞাত উপদেশগুলি স্মরণ করিয়া যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করতঃ কার্য্য করিতে পারিবে বলিয়া শিক্ষিতের এত মান;—তাই শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয়েন। নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন বলিয়া শিক্ষিতের মান নহে। নিজ বিবেচনায় কার্য্য করার জন্য মান হইলে মুর্খের মান হইত,—পশু পক্ষ্যাদির মান হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছেন, কিরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছে,—প্রাচীন ও বিজ্ঞগণ কিরূপ কার্য্য করিয়া সুফল পাইয়াছেন, কিরূপ কার্য্য করিয়া কুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথা প্রয়োগ করিতে পারেন, বলিয়াই শিক্ষিতের এত মান। মুর্খ তৎসমস্ত জানে না,—আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে যতদূর সম্ভব তাহাই করিয়া যায় মাত্র;—এইজন্য মুর্খের কার্য্যের এত দোষ ও এত নিন্দা।

আধুনিক শিক্ষিতদল বিবেচনা করেন যে, তাঁহারা আপন স্বাধীন বিবেচনায় কার্য্য করেন। কিন্তু তাহা কি ভুল নহে? ইহাও তাহাদের পাশ্চাত্যমতাদির অনুকরণ,—যখন অনুকরণ তখন কি বলিতে হইবে না যে, ইহাও তাঁহারা পাশ্চাত্যজগৎ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন? তবে শিক্ষা যেমন হইবে, কার্য্যও তদ্রূপ ভাবে চলিতে থাকিবে। যিনি টোলে পড়েন, তিনি শিখা রাখিতে, কোঁটা কাটিতে, উপবাস ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে শিক্ষা করেন, আর যিনি কলেজে পড়েন, তিনি চুল ফিরাইতে, এসেন্স মাখিতে ও পলাণ্ডু, মদ্য, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাও শিক্ষার গুণ,—ইহাও পরমুখাপেক্ষিতা, যেমন গুরু তেমনি শিক্ষা—কার্য্যও তদ্রূপ। কিন্তু বলা বাহুল্য, যিনি যাহা করেন, সমস্তই পরের বাক্যানুসারে করেন, নিজমতে কেহই কিছু করেন না। নিজমতে কার্য্য করি বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা আমি শিখিয়াছি, তাহার মধ্যে যদি আমার প্রকৃতি অনুসারে বা অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্যাস হওয়ায় অধিক ভাল লাগিয়াছে, তদনুরূপ করিতেছি,—নিজ উদ্ভাবিত মতানুসারে করিতেছি না।

নিজ স্বাধীনমতে কার্য্য করিব, ইহা ভুল। আর প্রত্যেক কার্য্যের বৈজ্ঞানিক সত্য জানিয়া তবে তাহার অনুষ্ঠান করিব, ইহা আর এক অতি মহাভুল! মানুষের অধিকার ও শক্তি কতটুকু? মানুষ কতদিন বাঁচে ও কতটুকু স্থান অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে? পরের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া কি প্রত্যেক মানব সকল কালের, সকল দেশের ও সকল বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারে? এই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অট্টালিকা ও মুদ্রাযন্ত্র;—এই জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও শরীর বিদ্যা;—এই সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি কি একজনের চেষ্টায় হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ বৎসরে লক্ষ লক্ষ

মানব যাহা শিখিয়াছে, তাহা যদি স্তূপাকারে সজ্জিত না হইত, তাহা হইলে কি মানব এ সকলের উপভোগ করিতে পারিত? অথবা রেলওয়ে সিগনলার কেবল "টরে টক্কা" শিখিয়াই তারে সংবাদ আদান প্রদান করিতেছে,—সে যদি উহা শিখিবার সময় বলিয়া বসিয়া থাকে যে, কোন্ শক্তির বলে এই সংবাদ দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান কি,—এ সমুদয় না বুঝিয়া আমি কখনই ফাঁক' সংবাদ দাতার কার্য্য করিব না, তাহা হইলে হয়ত কার্য্য করাই হয় না, কেননা, তাহার ক্ষুদ্র মস্তিস্কে সেই বিশালতত্ত্বের ধারণা সম্ভাবনা কোথায়? ফল কথা, পরে যাহা করিয়াছে—তাহা করা মানবের কর্ত্তব্য। এ জগতে পরস্পর পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। সকল মানবই পরস্পর পরস্পরের অধীন,—শিশু যুবার অধীন, যুবা বৃদ্ধের অধীন, প্রজা রাজার অধীন। এই অধীনতাই মানবত্ব এবং এই স্বাধীনতাই পশুত্ব। নচেৎ পশুতে ও মানবে প্রভেদ কি? পশুর আপনিই সর্ব্বস্ব, মানবের সকলই আপনার। পশু শিখিবে না—শিখাইবে না। মানব শিখিবে ও শিখাইবে,—যেরূপ পরের নিকটে শিখিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে,,—যেরূপ আপনি শিখিবে, সেইরূপ কার্য্য করিবে,—যেরূপ আপনি শিখিবে, সেইরূপ পরকে শিখাইবে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে "Do what I say not what I do," অর্থাৎ "আমি যাহা শিখিয়াছি ও জানিয়াছি,—তাহা স্বভাবদোষে নিজে করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহা পরকে শিখাইতে পারি।" অতএব, মানুষ নিজে সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য করিবে, ধর্ম্মের প্রত্যেক কার্য্যের বৈজ্ঞানিক শক্তি আবিষ্কার করিয়া তবে কার্য্য করিবে, ইহা নিতান্ত ভুল কথা! এইজন্য বকরূপী ধর্ম্ম, ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহাশয় পথ কি? অর্থাৎ

ধর্ম্মের পথ কোথায়?" মহাত্মা যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন, "মহাজন যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথ। অর্থাৎ ধর্ম্ম-সাধনোদ্দেশে, মহাজনগণ যে পথের আবিষ্কার ও যে সকল নিয়মাদির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন,— অধিকারিভেদে সেই সেই মতে চলাই কর্ত্তব্য।

সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সুস্থ শরীর, উপযুক্ত অবস্থা, অবিচলিত অধ্যবসায়, দৃঢ় ঐকান্তিকতা ও সত্যানুরাগ-সম্পন্ন উচ্চাশয় ব্যক্তিগণ উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া একাগ্রচিত্তে দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে পর্য্যবেক্ষণরূপ তপশ্চর্য্যায় জীবন যাপন করিয়া যে বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক বাক্যের নাম আপ্তবাক্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনকার দিনে হীনবুদ্ধি, অল্পায়ুঃ আমরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রত্যেক কার্য্যের বিজ্ঞান ও যুক্তি খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞান যে, প্রত্যেক কার্য্যে নাই, তাহা কে বলিল? তবে সেই যুগযুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপঃপ্রভাবে জানিত ও লোক-হিতার্থে প্রচলিত কার্য্যের সকলগুলির বিজ্ঞান ও যুক্তি স্থির করা যে, কতদূর কঠিন, তাহা বলাই বাহুল্য! তাই বলিতেছিলাম, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধিকার অনুসারে ধর্ম্মকার্য্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তবে তুমি নিতান্ত নাছোড় হইতেছ—ভাল, কি কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

প্রত্যূষে পাঠের মন্ত্র।

শিষ্য। দেব দেবীর আরাধনায় যে সকল মন্ত্র, যে সকল প্রথা, যে সকল কার্য্য প্রচলিত আছে, তাহাদের ব্যাখ্যা ও হেতু এবং বিজ্ঞান কি,—তাহাও শুনিতে চাহি।

গুরু। তেত্রিশকোটি দেবতা,—সেই সকল দেবতার পূজামন্ত্র, পূজাপদ্ধতি—সে ত এক সমুদ্র বিশেষ। তুমিও মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লইয়া জন্মগ্রহণ কর নাই,—আমিও ব্রহ্মার বিদ্যাশক্তি লইয়া আসি নাই; অতএব সে সমুদয়ের মীমাংসা ও অর্থ এবং যুক্তি বলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

শিষ্য। না না,—সে সকলই যে আমি শুনিতে চাহিতেছি, তাহা নহে।

গুরু। তবে কি শুনিতে চাহিতেছ?

শিষ্য। কতকগুলি মোটামুটি শুনিতে ও জানিতে পারিলে একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিতে পারে।

গুরু। যদি জ্ঞান জন্মে, এরূপ বুঝিতে পার—তবে তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা বল।

শিষ্য। প্রভাতকালে উঠিয়াই শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, সে গুলির অর্থ কি?

গুরু। সে মন্ত্রগুলি তুমি অবগত আছ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। সে গুলি বল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলিতেছি—নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিতে আছে, ব্রাহ্ম মুহুর্ত্তে * নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যার উপরে বসিয়াই পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া পাঠ করিবে,—

* রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহুর্ত্তো য স্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥

পিতামহঃ।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসূতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥
পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥

এ গুলির অর্থ অতি সহজ; কেননা অতি কোমল সংস্কৃত, এমন কি সংস্কৃত বিভক্তিগুলি উঠাইয়া দিলে সবই বাঙ্গলা কথা, সুতরাং ইহার অর্থ শ্রবণ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, এতগুলি লোকের নাম প্রত্যুষে উঠিয়া করিলে কি ফল লাভ হইয়া থাকে?

গুরু। তোমার ইংরাজী শাস্ত্রের অধ্যাপকগণও বলিয়া থাকেন, মানুষ যাহা প্রশান্ত হৃদয়ে অর্থাৎ চিন্তা শূন্য অবস্থায় যাহা গাঢ় রূপে চিন্তা করে, তাহা ঘটিয়া থাকে। ইহাকে মনস্তত্ত্ববাদ বলা হইয়া থাকে। রাত্রির নিদ্রায় মনের শ্রান্তি ও চিন্তা প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া প্রভাত কালে হৃদয় চিন্তাশূন্য ও সুস্থ থাকে,—একথা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না?

শিষ্য। না, তাহা বলিতে হইবে কেন? সে ত সকলেই জানে।

গুরু। সে বিশ্রান্ত হৃদয়ে হিন্দু শয্যায় বসিয়াই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কারী সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণে, দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের এবং দিনদেব সূর্য্য, নিশানাথ চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণকে আহ্বান করিয়া অর্থাৎ যাঁহাদের শক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে জগৎসমগ্র পরিচালিত হইতেছে,—তাঁহাদিগের শক্তিকে আহ্বান করিয়া নিজের সুপ্রভাতের কামনা করিতেছে। হিন্দু শক্তিকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তৎপরে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য করিয়া থাকে,—এইটুকুই ইহার অতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তারপরে প্রকৃতি,—দশমহাবিদ্যা প্রকৃতির দশবিধরূপ—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই প্রকৃতির ভাবনা অন্তে অপরা প্রকৃতি বা সমস্ত দেবতাগণের ইচ্ছাশক্তির একীকরণ শক্তি দুর্গাশক্তিকে স্মরণ করিয়া নিজে শক্তিমান হইয়া থাকে। এ শক্তি, মন্ত্র পাঠে কেমন করিয়া আসিতে পারে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিষ্য। এ গুলি বুঝিলাম,—কিন্তু তৎপরে কতকগুলি নর নারীর নাম করিয়া কি ফল হয়? বিশেষতঃ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী প্রভৃতি ইঁহারা কেহই একচারিণী বা যথার্থ সতী নহেন,—তাঁহাদের নাম করা কেন?

গুরু। এ স্থলে তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই। অনাসক্ত

রূপে কর্ম্মকরা যে, মুক্তির এক প্রধান ও পরিষ্কার পন্থা, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত হইয়াছ ?

শিষ্য। হাঁ,—তাহা আপনার নিকটেই বারম্বার শ্রুত হইয়াছি।

গুরু। এক্ষণে আরও একটি কথা বুঝাইতে চাহি।

শিষ্য। কি বলুন ?

গুরু। কথাটা তত শক্ত নহে,—কিন্তু বুঝিবার প্রয়োজন। শব্দে কি কোন অর্থ সংলগ্ন আছে ?

শিষ্য। শব্দের অর্থ আছে বলিয়াই ত আমরা জানি।

গুরু। শব্দে কিরূপ অর্থ আছে ? চন্দ্র এই শব্দের অর্থ কি ?

শিষ্য। চন্দ্র শব্দের অর্থ চাঁদ—যিনি রাত্রিকালে পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরিত করেন।

গুরু। ইহা কি শব্দার্থে-অঙ্কিত আছে, না তোমার মনে চন্দ্র এই শব্দটি উদিত হইলে বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে চন্দ্র শব্দ উপস্থিত হইলে, তোমার জ্ঞান হয় যে, জ্যোৎস্না বিভূষিত গোলাকার একটি পদার্থ ?

শিষ্য। হাঁ, তাহাই মনে হয়।

গুরু। শব্দের কোন অর্থ নাই—শব্দটি আমাদের মনে হইয়া তৎজ্ঞাপক পদার্থ মনে উদয় করিয়া দেয় মাত্র। এবং তাহা মনে হইলে, সেই পদার্থের সমস্ত স্বভাব ও ভাব মনে আইসে। এখন অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তীর নাম করিতেই তাঁহাদের চরিত্র মনে আইসে—মনে আসিলেই সে চরিত্রের কথা ভাবনায় পড়িয়া যায়। 'চৈতন্য' এই নামটি করিলেই যেন মনে হয়, সেই স্বর্ণ তনু হরিপ্রেমে ধুল্যবলুণ্ঠিত ; আর জাহ্নবী তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া হরি-ধ্বনির আওয়াজ। আবার ইন্দ্র এই কথাটি মনে আসিলেই যেন নন্দন কানন, কোকিলের

কুজন ও রম্ভাতিলোত্তমার নৃত্যকরী চরণের মধুর নিক্কণ। এক্ষণে ঐ নাম গুলি করাতে মনে আইসে তাঁহাদের চরিত্র। তাঁহাদের চরিত্রে যে যে দাগ, যে যে ভাব আছে—তাহা মনে পড়িয়া যায়। সে গুলি মনে পড়িলেই কি উপকার হয়,—তাহা কি বলিতে হইবে ?

শিষ্য। তাহা বলিতে হইবে না। সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। যে গুলির নাম করা হইল, তাহার সকলগুলি যে, নিষ্কামভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে একটি কথা,—

গুরু। কি বল ?

শিষ্য। উহাদের দ্বারায় যে কার্য্য হইয়াছিল, আমার বিবেচনায় তাহার সকলগুলি বুঝি নিষ্কাম ভাবে সমাধিত হইলেও পুণ্যকার্য্য নহে।

গুরু। তুমি বোধ হয়, অহল্যার পাতক, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, কুন্তীর দেবতাদ্বারা সন্তানোৎপাদন, তারা ও মন্দোদরীর দেবর স্বামী প্রভৃতির কথা বলিতেছ ?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ।

গুরু। কার্য্যের আসক্তি বা বন্ধনই দোষ,—উহাদের দ্বারা আসক্তির কাজ কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, ইহাই উহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সার মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে,—

ন মদ্যভক্ষণে দোষঃ নমাংসে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

"অর্থাৎ মদ্যপানে, মাংসভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই,—ভূতদিগের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মহাফল। অর্থাৎ আসক্তিশূন্য যে কার্য্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ।"

ঐ সকল চরিত্র-কথা স্মরণ করিয়া সেই অনাসক্তির ভাব মনে

জাগাইয়া লওয়াই উহার উদ্দেশ্য। ইহাতে মানুষ অনাশক্তির পথ পাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার অনেকে সে অর্থ বুঝিতে পারে না।

গুরু। যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। আবার অনেকে হয়ত, ঐ সকলের চরিত্র সকলও অবগত নহে।

গুরু। সেই ত দুঃখ। এখনকার লোকে পুত্র ও কলত্রাদিকে ইংলণ্ডের চতুর্থ হেনরির পিতামহের নাম ও চরিত্র-কথা শিক্ষা দিবে, কিন্তু আমাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র গুলি শিক্ষা দিবে না। ফলকথা, তাহা শিখান কর্ত্তব্য।

শিষ্য। এই সকল মন্ত্রগুলির অর্থ, এবং ঐ মন্ত্র সকলে যাঁহাদের নামের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের চরিত্র এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া আগে বুঝিয়া তারপরে ঐ মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য ?

গুরু। তাহা নহে ত কি ?

শিষ্য। তবে লোকে তাহা করে না কেন ?

গুরু। লোকে করে না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি দিব। হয়ত কেহ অগ্রাহ্য করিয়া করে না,—নয়ত কেহ বুঝিতে পারে না বলিয়া করে না। তুমি যোগ-সাধনা কর না কেন ?

শিষ্য। সময় ও সুবিধা পাই না। নয়ত ভালরূপ উপদেষ্টা পাই না।

গুরু। অন্য সকলের পক্ষেও সেইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে।

শিষ্য। ভাল, যাহারা নিজ চরিত্র গঠিত করিয়াছে,—অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মপথে গমন করিয়াছে, তাহাদেরও কি এই সকল মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য ?

গুরু। যথার্থ যাহারা উচ্চপথে গমন করিয়াছে, তাহাদের ইহা না পড়িলেও চলিতে পারে। কিন্তু বিষয়টা ত আর তত কঠোর বা কষ্টসাধ্য নহে। পথটা পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজনই বা কি? তবে সন্ন্যাসী মহান্ত বা যাঁহারা সংসারের প্রলোভন হইতে দূরে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

শিষ্য। পুত্র-কন্যাগণকে উহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এখন হইতে আমি সে বিষয়ে যত্নবান হইব।

গুরু। আশা করি, ভগবান তোমাদিগের সে মতি গতি দান করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গুরু ও স্ত্রী-গুরু পূজা।

শিষ্য। দেবতা পূজার কথা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে যে, মানুষ পূজার কথা প্রচলিত আছে,—তাহার কারণ ও হেতু কি, শ্রবণ করিতে চাহি।

গুরু। মানুষ পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে কেন,—সকল ধর্ম্মীদিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। পুত্র, পিতামাতাকে পূজা করে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পূজা করে, স্ত্রী, স্বামীকে পূজা করিয়া থাকে, ইহা ত সর্ব্বদেশেই আছে।

শিষ্য। সেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তিদ্বারা পূজা নহে।

গুরু। তবে কিরূপ পূজা?

শিষ্য। আরাধ্য দেবতার মত। পুষ্পচয়নাদি দ্বারা এবং নিত্য পূজা প্রদান করিয়া জল গ্রহণ করে।

গুরু। তুমি বোধ হয়, গুরু পূজার কথা বলিতেছ ?

শিষ্য। হাঁ। আরও আছে।

গুরু। কি ?

শিষ্য। কুমারী পূজা।

গুরু। আগে কোন্‌টি শুনিতে ইচ্ছা কর ?

শিষ্য। আগে গুরু পূজার কথাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ গুরু পূজা করিবার প্রথা হিন্দুদিগের অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত। বৈদিক হউন, তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য যাহাই হউন—হিন্দুমাত্রেই গুরু-পূজা করিয়া থাকেন, এবং গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতাঃ।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে।

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই, এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না।

এক মপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্ত্বা চানৃণীভবেৎ॥

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মাত্র প্রদান করেন, পৃথিবী মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিলে, তাঁহার নিকটে ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়াছি,—

গুরু তেজি গোবিন্দ ভজে।
সেই পাপী নরকে মজে॥

অতএব গুরুর এতাদৃশ পূজ্যভাব কেন হইল ?

গুরু। তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেই ত দিয়া আসিলে॥ যে গুরু কর্ত্তৃক পরম পদ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাঁহার চেয়ে জগতে আর কে গরীয়ান, মহীয়ান ও আত্মীয় আছেন, —তাঁহাকে মানুষ পূজা করিবে না,—তাঁহাকে মানুষ ভক্তি প্রীতি প্রদান করিবে না,—তবে কাহাকে করিবে ?

শিষ্য। তাহা বটে ; কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল গুরু আছেন, অর্থাৎ যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এক একটি মন্ত্রদান করিয়া এবং বার্ষিক আদায় করিয়া কৃত-কৃতার্থ করিয়া থাকেন,—হয়ত এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম্ম সম্পর্কে যাঁহার সহিত অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক নাই,—আহারে ব্যবহারে সাংসারিকতায় বা ক্রিয়া কর্ম্মে শিষ্য হইতে যে গুরুঠাকুর-দিগের কোন প্রভেদ নাই, সে প্রকার গুরুগণের প্রতি ভক্তি প্রীতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য কি না ?

গুরু। গুরু সর্ব্বত্রই পূজ্য এবং সম্মানার্হ। গুরু হিন্দুর নিত্য আরাধনীয়,—কারণ গুরু-পূজা ব্যতীত হিন্দু-ইষ্টদেবতার পূজা সুসিদ্ধ হয় না।

শিষ্য। তাহাতেই বলিতেছিলাম, মানুষ হইয়া সমধর্ম্মী মানুষের পূজা সঙ্গত নহে।

গুরু। হিন্দু সমধর্ম্মী মানুষের পূজা করে না।

শিষ্য। আপনি বলেন কি,—আমার নিজের কথাই বলিতেছি,—আমার যিনি কৌলিক গুরু আছেন, তিনি আমার চেয়ে কোন অংশেই সমুন্নত নহেন। জ্ঞান বলুন, বিদ্যাবুদ্ধি বলুন, আচার-ব্যবহার বলুন,—কিছুতেই তিনি আমা হইতে জ্ঞান-বৃদ্ধ নহেন, তবে তাঁহাকে আমি কিসের জন্য পূজা করিব?

গুরু। গুরু পূজার বিধান বা পদ্ধতি অবগত আছ?

শিষ্য। আজ্ঞা না।

গুরু। তবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই তোমার হয় নাই। আমি গুরু পূজা-পদ্ধতিটি তোমাকে শুনাইলেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর অবগত হইতে পারিবে।

গুরুর ধ্যান,—

শিরসি সহস্রদল-কমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং
বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং
স্ববামস্থিত সুরতশক্ত্যা স্বপ্রকাশ-স্বরূপয়া সহিতং
গুরুং।

"শিরস্থ সহস্রদল-পদ্ম-বিরাজিত গুরুদেব শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়-প্রদ, শুভ্রমাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত, স্বয়ং প্রকাশমান, এবং স্বপ্রকাশ-মানা বামভাগাবস্থিতা রক্ত-শক্তি-সমাশ্লিষ্ট ও অবস্থিত।"

স্ত্রী গুরু হইলে নিম্নপ্রকার ধ্যান পাঠ করিতে হয়।

স্ত্রীগুরুর ধ্যান,—

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্ল-পদ্ম-পত্রাক্ষীং ঘনপীন-পয়োধরাং॥

প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগ-সমাভাষাং রক্ত-বস্ত্র-সুশোভনাং ॥
রক্তকুঙ্কুম-পাণিঞ্চ রক্তনূপুর-শোভিতাং।
স্থলপদ্ম-প্রতীকাশ-পাদ-পদ্ম-বিশোভিতাং ॥
শরদিন্দু-প্রতিকাশাং রক্তোদ্‌ভাসিত কুণ্ডলাং।
স্বনাথ-বামভাগস্থাং বরাভয়-করাম্বুজাং ॥

"শিরস্থ,—কেশররাজি-বিরাজিত-সহস্রদলকমলমধ্যে স্ত্রীগুরু অবস্থিতি করেন। তিনি প্রফুল্ল-সরোজ-দল-লোচনী, ঘনপীনস্তনী, প্রসন্নমুখী, ক্ষীণমধ্যা এবং মঙ্গলময়ী;—তাঁহার কান্তি প্রবাল সদৃশ, বস্ত্র রক্তবর্ণ;—হস্ততল কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ,—তিনি রক্ত নূপুরের দ্বারা সুশোভিতা। তাঁহার পাদপদ্ম স্থল-পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং তিনি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুমনোহরা। তাঁহার কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে,—কর-পদ্মে সাধকের প্রতি বর ও অভয়দান করিতেছেন, তিনি নিজকান্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।"

শিষ্য। ধ্যান বলিতে বোধ হয়, কোন মন্ত্র বিশেষকে বুঝায় না? ধ্যান অর্থে ত চিন্তা?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তাহা হইলে, যে আকার চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যানে অর্থাৎ সংস্কৃত গদ্য-পদ্যময় বাক্যের রচনা দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে। তবেই ধ্যান অর্থে কেবল ঐ মন্ত্রটি মাত্র পাঠ করা নহে, ঐ সংস্কৃত বাক্যগুলির প্রতিপাদ্য আকৃতিটী মনে মনে চিন্তা করার নামই বোধ হয় ধ্যান?

গুরু। নিশ্চয়ই।

শিষ্য। তবেই ত গোলযোগ।

গুরু। কি গোলযোগ ?

শিষ্য। আপনি যে গুরু ও স্ত্রীগুরুর ধ্যান বলিলেন,—উহা সকলেরই গুরুর ধ্যান ; না প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ গুর-ধ্যান আছে ?

গুরু। তাও কি সম্ভব ? একথা জিজ্ঞাসা কেন ?

শিষ্য। একথা জিজ্ঞাসার কারণ এই যে, বহুলোকের বহু গুরু— সকলের গুরুর কি এক প্রকার রূপ। কাহারও গুরুর আকৃতি স্থূল, মস্তক মুণ্ডিত ও দীর্ঘ রেখা সমাযুক্ত এবং নস্য গ্রহণের প্রবলতায় নাসিকারন্ধ্র অস্বাভাবিক স্ফীত। পাদুকাবিহীন হইয়া চরণ চালিত করিয়া বৈশাখী কর্ষিত জমির ন্যায় ফাটল এবং শক্ত। কাহারও গুরু সর্ব্বাঙ্গে তিলক ম্রক্ষিত, সূক্ষ্ম দেহী ও দীর্ঘাকার। কাহার গুরু কাণা, কাহারও গুরু খোঁড়া, কেহ অন্ধ, কেহ বধির। আবার স্ত্রী গুরু ত ঝিয়ের মাঠাকুরুণ,—আপনি যেরূপ বর্ণনা করিলেন, সে ঘূর্ণীর পালেদের হস্ত-গঠিত মূর্ত্তি ভিন্ন অন্যত্র দুর্ল্লভ। যদি ঐরূপ গুরুরই ধ্যান হয়, তবে ঐরূপ গুরুরই পূজা করার বিধান শাস্ত্রে আছে,— বার্ষিক আদায়কারী ঠাকুরমহাশয়দিগের পূজার ব্যবস্থা বোধ হয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে ?

গুরু। আর একটী কথা ভুলিয়া গিয়াছ।

শিষ্য। কি ?

গুরু। গুরু ও স্ত্রী-গুরুর অবস্থিতির স্থান ধ্যানে কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ঐ ধ্যানে ব্যক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। হাঁ হাঁ। শিরঃস্থ-সহস্র-দল কমলে গুরু বা স্ত্রীগুরু অবস্থিতি করেন। তাহা হইলে স্পষ্টতই বলা হইল,—আমরা যে মানুষ গুরুর পূজা করিয়া থাকি, তাহা কিছুই নহে,—সে ঠাকুরমহাশয়দিগের ব্যবসায়-

বুদ্ধির প্রচলিত প্রথা। আসল কথা, আমাদের গুরুতত্ত্ব আপন আপন শিরোদেশে অবস্থিত।

গুরু। মিছে কথা, ভুল বুঝিতেছ।

শিষ্য। কি ভুল বুঝিলাম?

গুরু। গুরু—আমাদের মন্ত্রদাতা। উহা তাঁহাদেরই ধ্যান। কেবল ধ্যান শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। পূজার আর আর পদ্ধতি গুলি আগে অবগত হও।

ধ্যান পাঠান্তে গুরুদেবকে সদাশিব মূর্ত্তি ও স্ত্রীগুরু হইলে শক্তি-মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া পঞ্চোপচারে মানস পূজা করিবে।

মানস পূজার পঞ্চোপচার যথা,—

"ঐং শ্রীঅমুকানন্দ নাথ (মন্ত্রদাতা গুরুর যে নাম, তাহাই করিতে হয়) গুরবে লং ভূম্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি,"—এই বলিয়া নিজের দেহস্থ পার্থিবাংশ গন্ধরূপে কল্পনা করিয়া গন্ধমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দ নাথ গুরবে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি,"—বলিয়া নিজ দেহস্থ আকাশ পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া পুষ্পমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দ নাথ গুরবে যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি," —বলিয়া দেহস্থ বায়ু ধূমরূপে কল্পনা করিয়া ধূপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দ নাথ গুরবে রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি,"—বলিয়া দেহস্থ অগ্নি দীপরূপে কল্পনা করিয়া দীপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দ নাথ গুরবে বং জলাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি,"—বলিয়া দেহস্থ জলীয়াংশ নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিয়া নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি করিবে।

তৎপরে সাধারণ পূজার প্রণালী অনুসারে গুরুরও পূজা করিবে। তৎপরে গুরুর প্রণাম করিতে হয়।

গুরুর প্রণাম মন্ত্র,—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মাদিষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞিতং॥

গুরু-পূজা সম্বন্ধে যাহা শুনিলে, তাহাতে কি বুঝিতে পারিলে? নিজ সহস্রার স্থিত গুরুতত্ত্ব বুঝিলে, না মন্ত্রদাতা গুরুকে বুঝিলে?

শিষ্য। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বড় বিষমসমস্যা।

গুরু। বিষম সমস্যা কিসে?

শিষ্য। ধ্যানের অর্থে যেরূপ চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে—উহা যখন সকলের পক্ষেই এক, তখন গুরুতত্ত্বই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আবার যখন মানস পূজায় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভৌতিক গুণ গুলি লইয়া আত্মদেহকে বলি দিয়া মন্ত্রদাতা গুরুর নাম করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করা হইতেছে,—তখন মন্ত্রদাতা নিজ নিজ গুরুকেই বুঝা যাই-তেছে। আবার প্রণামের মন্ত্র—দুয়েরও অতীত।

গুরু। কি প্রকার?

শিষ্য। মন্ত্রের অর্থে জানা যাইতেছে,—অজ্ঞান তিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা যিনি উন্মীলন করিয়াছেন, অখণ্ড মণ্ডলাকার জগদ্ব্যাপ্ত ব্রহ্মপদ যাঁহা কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে—যাঁহার অমৃত বাক্যে সংসার-বিষ বিনাশ পাইয়াছে, সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ গুরুদেবকে প্রণাম। ইহাতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে,—যাঁহাকে পূর্ব্বে ধ্যান

করা হইয়াছিল, ইনি তিনিও নহেন, এবং মন্ত্রদাতা যে: গুরুর নাম করিয়া দেহস্থ পঞ্চতত্ত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল, তিনিও নহেন।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ধ্যানের গুরু সহস্রার পদ্মে অবস্থিত, সুতরাং ইনি তিনি নহেন; কেননা প্রণাম যাঁহাকে করিলাম, তিনি আমার নিকট সাকার এবং আমাকে ব্রহ্মপদ দেখাইয়াছেন, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন, এবং সংসারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন করিয়াছেন,—আবার আমাদের বার্ষিক আদায়-কারী অমুকানন্দ নামের নিজেরই ইহার এক ক্রান্তি শক্তি নাই। সুতরাং তিনই পৃথক্ পৃথক্ হইল বৈ কি—এবং বিষম গোলযোগ বা ধাঁধাঁ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল।

গুরু। এই গোলযোগই গুরু পূজা বুঝিবার সুন্দর উপায়। তোমাকে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি,—সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত ঈশ্বরের সত্ত্বা পৃথক স্বীকার করেন না। কিন্তু দর্শনের অত গোলযোগে প্রয়োজন কি,—ইতিপূর্ব্বে তোমাকে আমি বলিয়াছি,—ব্রহ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে গুণের দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃজিত হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক হইয়াও জগৎ কার্য্য চালাইতেছেন। ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ মানব দেহে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে,—সহস্রারে প্রকৃতি ও পুরুষ শিব শক্তিরূপে বা রাধাকৃষ্ণরূপে অবস্থিত আছেন * তাঁহারাই জীবের গুরুতত্ত্ব,—গুরুর ধ্যানে তাঁহাদেরই ধ্যান করা হয়।

শিষ্য। সে কথা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু অমুকানন্দ

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা" নামক গ্রন্থে এ সকল তত্ত্ব উৎকৃষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে।

নাথ অর্থাৎ মন্ত্রদাতা গুরুর সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কি,—তাহাই বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। এক্ষণে সেই প্রকৃতি ও পুরুষ বা গুরুতত্ত্বের অথবা ঐ শক্তির প্রয়োজন। জগতে দান করিতে কয় জন ইচ্ছুক? কৃপা করিয়া বার্ষিক দুই কি তিনটি টাকার পরিবর্ত্তে যিনি শক্তি দানে ইচ্ছুক,—তিনি অবশ্যই মহাদাতা। মন্ত্রদাতা গুরু যেমনই হউন, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি যেমনই হউক, তাঁহার আচার ব্যবহার যাহাই হউক,—কিন্তু শিষ্য করিয়া গুরু হইতে তাঁহার ইচ্ছা আছে। শিষ্যকে মন্ত্রদানে উদ্ধার করিব,—উহার মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, এমন ইচ্ছা অবশ্যই প্রত্যেক গুরুর থাকে বা অবশ্যম্ভাবী উহা হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই মন্ত্রদাতা গুরুর সেই গুরুতত্ত্বশক্তি ইচ্ছোন্মুখ হয়, অর্থাৎ নাটাই যেমন সুতা লইয়া দান করিতে দাঁড়ায়, আর যে টানিতে জানে সে সহজেই সুতা টানিয়া লইতে পারে। নাটাইয়ের কিছু কোন জ্ঞান নাই—সুতা দিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত জ্ঞান তাহার থাকে না বা নাই—কিন্তু সুতা টানিলেই যেমন তাহা খুলিয়া দেয়, আমাদের মন্ত্রদাতা গুরুগণের জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের ইচ্ছাশক্তির বলে ঐ শক্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে। ধ্যান করিয়া আমরা গুরু বলে বলীয়ান হই। যেমন প্রতিমা পুজার সময় খড় দড়ি রং রাংতার ভাবনা করি না,—সেই মূর্ত্তির প্রতিপাদ্য শক্তি-রূপের চিন্তা বা ধ্যান করি। তদ্রূপ মন্ত্রদাতা গুরুর ভৌতিক দেহ তাঁহার—অন্য কোন জিনিষের ভাবনা বা ধ্যান করি না,—ধ্যান করি, তাঁহার গুরুতত্ত্বের। চিন্তাশক্তির প্রবলাকর্ষণে তাঁহার সেই শক্তি আমাদিগকে দিতেই হয়।

তারপরে মানসপূজায় যে পঞ্চতত্ত্বের সমর্পণ করিতে হয়, তাহাও সেই গুরু শক্তির, তাঁহাকে তখন ঐ নামেই উল্লিখিত করিতে হয়।

খড় দড়ি রং রাংতার নাম যে দুর্গা কালী রমা রাধা রাম কৃষ্ণ শিব প্রভৃতি হইয়া থাকে,—বলা বাহুল্য নাম রূপ লিঙ্গ সমস্তই আরোপিত—তদ্রূপ গুরুর নামও আরোপিত। তৎপরে প্রণাম ও সেই গুরু শক্তি-তত্ত্বকে, কেননা—সেই গুরু শক্তির জাগরণে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে ঈশ্বরতত্ত্ব দর্শিত হইয়া থাকে।

এ সমুদয়ই যোগের কথা—হিন্দুর পূজা প্রভৃতি যাহা কিছুর অনুষ্ঠান দেখিবে, সমস্ত যোগের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতত্ত্ব—এ কঠিন রহস্য কোন দেশের কোন মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না। তবে গুরুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব হইয়া থাকে।

শিষ্য। আপনি তাহা হইলে বলিতে চাহেন, যিনি মন্ত্রদাতা গুরু, তাঁহার দেহে যে গুরু-শক্তি-তত্ত্ব নিহিত আছে, আমরা আমাদের সাধন ও ইচ্ছাশক্তির বলে, তাহা লাভ করি বলিয়া মন্ত্রদাতা গুরুকে অত খাতির যত্ন করিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাকে পূজা করি না। পূজা করি, তাঁহাতে যে গুরু-তত্ত্ব নিহিত আছে, তাঁহাকে।

গুরু। তা বৈ আর কি ?

শিষ্য। তবে তাঁহাকে আদর ও অত ভক্তি-সম্মান করা কেন ?

গুরু। যে পুত্র পিতাকে সম্মান করে না, ভক্তি করে না, পূজা করে না, সে পুত্র কি পিতৃ-স্নেহ আর্ষকণে সমর্থ হয় ?

শিষ্য। কিন্তু গুরু-বিনা কি ইষ্টদেবের আরাধনা হয় না ?

গুরু। হয় না কি, হয়। তবে এই পথ সহজ। অধিকন্তু সদ্‌গুরু লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার সাধ্য মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, জীবের সৌভাগ্যোদয় সত্বরেই হইতে পারে। সাধকের নিকট সাধনার পথ জানিতে পারিলে, সহজেই সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। প্রজ্বলন্ত প্রদীপ হইতে বর্ত্তি ধরান অতি সহজ।

শিষ্য। উদাসীন বা সন্ন্যাসীর নিকটে গৃহস্থের মন্ত্র লওয়া নিষেধ কেন? বোধ হয়, তাঁহাদিগের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সহজে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়।

গুরু। তার একটা কথা আছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে গৃহস্থকে গৃহস্থ রাখাই শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য, গৃহী যদি উদাসীন সন্ন্যাসীর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তবে তদ্ভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহারেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মন্ত্র যে লইতে নাই, তাহা নহে, গৃহী উদাসীন হইলেই উদাসীনের নিকটে মন্ত্র লইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম চারিদিক বজায় রাখিয়া বিধি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুলকুণ্ডলিনীর পূজা।

শিষ্য। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতির কথা আপনার নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু নিত্য পূজা বা আরাধনাতেও কুলকুণ্ডলিনীর পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়,—সম্ভবতঃ ইহাতে যোগের বিষয় কিছুই নাই, তবে এ বৃথা পূজায় প্রয়োজন কি আছে?

গুরু। যাঁহারা যোগবলে বলীয়ান্ হইয়া এই সকল প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বৃথা পণ্ডশ্রম করিবার জন্য মানুষকে একটা নিয়মসংযমের গণ্ডির মধ্যে রাখিয়া যান নাই। তবে স্মরণ রাখিও, নিত্য পূজা বা আরাধনা যোগের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষায়

অভ্যস্ত না হইয়া কেহ কি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে?

শিষ্য। কুলকুণ্ডলিনী-পূজায় যোগের কি প্রাথমিক শিক্ষার সুগম হইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। কুলকুণ্ডলিনী পূজায় ঐ শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিত হইতে থাকেন।

কুণ্ডলিনীর ধ্যান,—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মুলাধার-নিবাসিনীং।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাং।
কোটি সৌদামিনীভাষাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাং॥

"মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার (বীজকোষ) মধ্যস্থিত ত্রিকোণচক্র তন্মধ্যে অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন। সার্দ্ধ ত্রিবলয় বেষ্টিনী, প্রসুপ্ত সর্পাকৃতি অতি সূক্ষ্ম দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত শত কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী, নিজ ইষ্টদেবতারূপিনী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহাকে (স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে) বেষ্টন করিয়া বিরাজিত আছেন।"

এই ধ্যানের অর্থ যাহা,—প্রকৃত প্রস্তাবে কুণ্ডলিনী শক্তি সেইরূপেই আছেন। নিত্য এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিলে নিত্য চিন্তনের ফলস্বরূপে ঐ দেবী প্রবোধিতা হইয়া পড়েন, এবং পূজকেরও জ্ঞান জন্মিয়া পড়ে। নিত্য নিত্য যে বিষয় ভাবনা বা ধ্যান করা যায়, আপনা আপনিই তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইহা বিজ্ঞান-সম্মত বাক্য। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করেন,—তখন তাঁহার ঐকান্তিক ধ্যান ধারণার বলেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কেবল নিউটন বলিয়া নহে, যিনিই যখন কোন নূতন তত্ত্ব বা নূতন

শক্তির আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখনই তাঁহাকে অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় চিন্তা করিতে হইয়াছে,—এবং সেই চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা সেই তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের দেহ মধ্যে সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান আছে,—কেবল শক্তিকে বশ করিবার উপযুক্ত শক্তিতে আকর্ষণ উপস্থিত করিতে পারা যায় না বলিয়াই তাহা গুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকে। কুণ্ডলিনীর পূজান্তে স্তবপাঠ করিতে হয়। স্তবগুলি শ্রবণ করিলে, তুমি হিন্দুর পূজা জপ তপ ও স্তব পাঠের উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হইবে।

শিষ্য। ঐ স্তবাদি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কুণ্ডলিনীর স্তব,—

নমস্তে দেব-দেবেশি যোগীশ প্রাণবল্লভে।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতে॥
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারে সর্ব্বদা কারণ প্রিয়ে।
কামকলান্বিতে দেবি মহাভীষ্টং কুরুষ্ব চ॥
অসারে ঘোর সংসারে ভবরোগাৎ মহেশ্বরি।
সর্ব্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্ম সংসার রূপকাৎ॥
ইতি কুণ্ডলিনী স্তোত্রং ধ্যাত্বা যঃ প্রপঠেৎ সুধীঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো জন্মসংসার-সাগরাৎ॥

ইহার অর্থ প্রায়ই ধ্যানের মত, না হইলেও অতি কোমল; সুতরাং অনুবাদ করিবার প্রয়োজন জ্ঞান করিলাম না। এই স্তব নিত্য-পাঠে কুণ্ডলিনী শক্তি কি তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। বলা বাহুল্য;

ইহা যোগের প্রাথমিক শিক্ষা। এবং এই শিক্ষা না করিয়া যাঁহারা একেবারেই নিরাকার ব্রহ্মলাভে প্রধাবিত হয়েন, তাঁহারা সমধিক ভ্রান্ত সন্দেহ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ পূজা প্রণালীর বৈজ্ঞানিকত্ব।

শিষ্য। আমাদের শাস্ত্রে যে সকল পূজা-প্রণালী বা পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যাতত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।

গুরু। এ সকল অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি—আমাদের শাস্ত্র অনন্ত,—পদ্ধতি বিরাট; তাহা বুঝাইয়া উঠা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ,—এমন কি বহু জন্ম ধরিয়া তাহার আলোচনা করিলেও সমাধা হয় কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিকতত্ত্ব কেবল মাত্র বাহ্যজ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বুঝিবার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের প্রয়োজন।

শিষ্য। একটি সাধারণ পূজার সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে, একটা সাধারণ ধারণা হইতে পারিবে, ইহাই আশা করি।

গুরু। তাহা হইতে পারে না। পৃথক্ পৃথক্ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ শক্তি,—পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য—সুতরাং পদ্ধতি ও প্রণালী প্রভৃতিও পৃথক্ পৃথক্।

শিষ্য। তথাপি একটির বিষয় শুনিতে পাইলে, বুঝা যাইতে পারে যে, সকলগুলিতে কিছু না কিছু আছে। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, এখন

আমাদের ধারণা হয় যে, পার্থিব ফুল, জল, আতপ তণ্ডুল, পাকাকলা, ধূপ, দীপ ইহাতে দেবতার কি হয়? এগুলির লোভাকর্ষণে তাঁহারা স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য মর্ত্ত্যের মানুষের নিকটে আগমন করেন!

গুরু। আবার 'কেঁচেগণ্ডুষ কর' কেন? দেবতা সর্ব্বত্র বিরাজিত,—স্বর্গ সূক্ষ্মের রাজত্ব, তাই তাঁহারা সেখানে অবস্থিত। ডাকিলে, ধ্যান করিলে—সূক্ষ্মশক্তির পরিচালনা করিলে তাঁহারা নিকটে আসেন, সে কথা তোমাকে অনেকবার বুঝাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে যদি দেবতার সাধারণ পূজা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে যে কোন একটি দেবতার পূজাবিষয়ক প্রশ্ন করিতে পার। তোমার কিরূপ ভাবে কোন্ বিষয় জানিবার ইচ্ছা, প্রশ্ন না করিলে আমি বুঝিব কি প্রকারে?

শিষ্য। শিবপূজা করা আমাদের শাস্ত্রের অবশ্য বিধান। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী জাতি প্রভৃতি সকলের জন্যই শিবপূজার বিধান আছে। যথার্থই কি, সকলের পক্ষে শিবপূজা করিবার বিধি আছে?

গুরু। হাঁ, শাস্ত্রে আছে,—

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভু সেবনম্।
অগ্নিহোত্রাস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ॥

স্কন্দ পুরাণম্।

অসার সংসারে কাশীবাস, সৎসমাগম, গঙ্গাজল ও শিবার্চ্চন এই চার সার পদার্থ! অগ্নিহোত্র তিনবেদ ও বহু দক্ষিণ-যজ্ঞ এই সকল কার্য্য শিবপূজার কোটি অংশের একাংশের তুল্য নহে।"

শিষ্য। প্রথমে উহাই বুঝিতে চাহি। সংসারের সমস্ত কার্য্যের উপরে শিবার্চ্চনা এত ভাল কার্য্য হইল কেন?

গুরু। শিবতত্ত্ব জানিতে পারিলে, তুমি সহজেই উহা অবগত হইতে পারিবে। শিব এই শব্দটী মঙ্গলার্থ বাচক। শিব ত্রিগুণেরই অংশাংশে অবস্থিত। শিবতত্ত্ব আশু আকর্ষিত হইয়া থাকে, সেইজন্ত তাঁহার এক নাম আশুতোষ। পুরাণ প্রভৃতি পাঠে তুমি জানিতে পারিবে, যত দেবতা, যত দৈত্য, যত দানব প্রভৃত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে, তাহা শিব-শক্তি হইতেই লাভ করিয়াছে। ত্রিপুরাসুর, মহিষাসুর, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলেই শিব-শক্তির বলে ঐশ্বর্য্যবান্ ও অতুল বলশালী। শিবই পরা প্রকৃতির সাহায্যে আমাদের অতি নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিতেছেন। তাঁহার আরাধনায় তিনি সহজেই প্রীতিলাভ করিয়া আমাদিগকে অভীপ্সিত ফল দান করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে হইলে, শিবারাধনাই কর্ত্তব্য। তাহাতেই জড় সংসারে আবদ্ধ জীবের জন্ত শিবারাধনায় এত গুরুত্ব ও কর্ত্তব্যতা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয়। তাহার অর্থ কি?

গুরু। মূর্খ; লিঙ্গ অর্থে জননেন্দ্রিয় নহে। স্থূল সূক্ষ্ম ও লিঙ্গ এই দেহত্রয়ের কথা অনেকবার বলিয়াছি,—লিঙ্গ অর্থে তাহাই।

শিষ্য। আমরা শুনিয়াছি শিবলিঙ্গ এবং যোনি তাহার পীঠিকা। এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণও জানা আছে।

গুরু। প্রমাণটা কি?

শিষ্য। বলিতেছি,—

লিঙ্গস্ত দৈর্ঘ্যবিস্তারঃ পরিণাহোঽপি তাদৃশঃ।
লিঙ্গস্ত দ্বিগুণা বেদী যোনিস্তদর্দ্ধসম্মিতা॥

সর্ব্বতোঙ্গুষ্ঠতো হ্রস্বং ন কদাচিদপি কচিৎ।
রত্নাদিষু চ নির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ॥

লিঙ্গপুরাণম্।

"লিঙ্গের পরিমাণ অনুসারে তাহার বিস্তার করিবে। লিঙ্গ পরিমাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে। যোনির ঊর্দ্ধ পরিমাণে যোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের ন্যূন করিবে না। রত্নাদির দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ স্থলে কোন পরিমাণের নিয়ম নাই,—আপনার ইচ্ছানুসারে পরিমাণ স্থির করিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে।"

এই প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টতই জানা যায় যে শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহারই পূজা করিতে হয়।

গুরু। মূর্খ! তোমাদের শাস্ত্র-জ্ঞান ঐরূপই। যাহা কেবল শক্তি বা গুণ; যাঁহাদিগকে পুরাণকারেরাও অযোনিসম্ভব বলিয়াছেন,—তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা তোমারা কোথা হইতে পাইয়া থাক? শাস্ত্রে আছে,—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
প্রলয়ে সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

"আকাশ লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার আসন। মহাপ্রলয় সময়ে দেবগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্ত্তমান ছিলেন—অতএব লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।"

আকাশ তত্ত্ব ও পৃথ্বীতত্ত্বে শিব-শক্তি। শিব-লিঙ্গ পূজায় আকাশ-তত্ত্ব ও পৃথ্বীতত্ত্বের আরাধনা করা হয়। আকাশতত্ত্বকে লইয়াই তোমার পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত লীলা খেলা। পাশ্চাত্য জগতের যত আবিষ্কার সমস্তই এই আকাশতত্ত্ব বা ইথার লইয়া। হিন্দু সেই

আকাশতত্ত্বের সহিত পৃথ্বীতত্ত্ব সংযোজনা করিয়া তদীয় অর্চ্চনায় আমাদিগকে শক্তিশালী হইবার অধিকারী করিবার জন্য কৃপা করিয়া শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা ও আরাধনার পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

শিষ্য। অদ্ভুত রহস্য,—আমরা ইহার কিছুই অবগত নহি। এক্ষণে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূজাপ্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

গুরু। পূজাপ্রণালীর কিরূপ ব্যাখ্যা করিব, তাহা তুমি বলিয়া যাও।

শিষ্য। আমরা যে উপায়ে দেবতাদিগের পূজা করিয়া থাকি, তাহা বলুন,—এবং তাহার তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। যে কোন দেবতার পূজা করিতে বসিলে প্রথমে আসন শুদ্ধি করিতে হয়। আমি শিবপূজা লইয়াই তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শিবপূজা করিতে হইলে প্রথমে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আসন শুদ্ধি করিতে হয়। আসন শুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, মনের ভাব এরূপ করা কর্ত্তব্য যে, আমি যে আসনে উপবেশন করিয়াছি, তাহা পবিত্র হইয়াছে; অধিকন্তু মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক মন্ত্র-শক্তির বলে তাহাতে শক্তিতত্ত্ব আনাইয়া তাহাতে উপবেশন করিবে। মন্ত্রাদি ও পদ্ধতি মৎপ্রণীত "পুরোহিত-দর্পণ" নামক পুস্তকে পাঠ করিবে। আসনশুদ্ধির পরে সামান্যন্যাস, বিঘ্নাপসরণ, গণেশ পূজাদি করিয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসে দেহস্থ তাড়িৎময় পদার্থ উপাসনা কালে যে যে স্থানে থাকা কর্ত্তব্য, তাহাই প্রেরণ করা হয়।

শিষ্য। যদি তাহাই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন হয়, তবে বোধ হয় অঙ্গুলির চালনাদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তবে দেবতার বীজ মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন কি? অঙ্গন্যাস করন্যাস করিবার সময় 'বীজমন্ত্র' পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল অঙ্গুলি চালনা দ্বারাই ত সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত!

গুরু। টেলিগ্রামে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে, টেলিগ্রামের তারে নাড়া দিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যাইত। "টরে টক্কা টক্কা টরে" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক শব্দগুলি শিক্ষা করিয়া তাহার ধ্বনি করিবার আবশ্যক কি?

শিষ্য। তাহাতে ঐ শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া যে সাঙ্কেতিক শব্দ আপতিত হয়, তদ্দারা প্রেরিত হইলে সেই শব্দের অর্থ বুঝিয়া লয়।

গুরু। দেবতার আরাধনার সময়ে ও করাঙ্গুলীর পরিচালন ও পীড়নে তাড়িৎ পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু যে দেবতার জন্য তাহা যেমন ভাবে প্রস্তুত হইবে, তাহা সেই দেবতার বৈজিকমন্ত্রের ধ্বনিতে সেই সেই স্থলে চালিত হয়। উহা শব্দতত্ত্বের অধীন। তারপরে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য বোধ হয়, তোমাকে আর বলিতে হইবে না, আমি পুনঃ পুনঃ এই বিষয় উত্তমরূপেই তোমাকে অবগত করাইয়াছি।

শিষ্য। ভূতশুদ্ধির পরে কি করিতে হয়?

গুরু। ভূতশুদ্ধির পরে ন্যাসাদি করিয়া অপ্রতিষ্ঠিত দেবতা হইলে, দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

শিষ্য। ন্যাসাদিতে বোধ হয়, সাধকের দেহ স্থির ও কার্য্যক্ষম করে।

গুরু। কেবল দেহ স্থির নহে—দেহস্থ শক্তিপুঞ্জের সমীকরণ করিয়া তাহাদিগকে কার্য্যোন্মুখী করিয়া থাকে।

শিষ্য। কিন্তু আর একটি কঠিন কথা বা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। অপ্রতিষ্ঠিত দেবতা হইলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কিন্তু কে কাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে? দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানুষের করে? ইহা অতি অসম্ভাবিত কথা।

গুরু। তোমাদের নিকটে অসম্ভাবিত সকলই। আমার একটা কথার উত্তর দাও।

শিষ্য। বলুন?

গুরু। ইচ্ছাশক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতা ও কার্য্যকারী শক্তি তোমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও কথিত হইয়াছে। মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে জড়ের জিনিষ নূতন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় মানুষ নূতন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে,—তাহা তোমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত।

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। পার্থিব জড়ের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাও সেই ইচ্ছাশক্তির পরিচালন, আর যে মন্ত্র ও বীজ পাঠ করা হয়,—তাহাতে কোন্ শক্তি আবির্ভূত হইবে, তাহারই অধ্যাসন বিসর্জ্জনও ঐরূপ।

শিষ্য। বুঝিলাম। তারপরে, কি করিতে হয়?

গুরু। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে ধ্যান পাঠ করিতে হয়।

শিষ্য। ধ্যানের অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তা করা।

গুরু। হাঁ, তাহাই। ধ্যান তিন প্রকার, স্থূল ধ্যান, সূক্ষ্ম ধ্যান ও জ্যোতির্ধ্যান। যাহাতে মূর্ত্তিময় দেবতাকে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম স্থূল ধ্যান; যাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে ধ্যান করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান এবং যাহা দ্বারা বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্ম ধ্যান বলা যায়। নিত্য পূজায় যে ধ্যান করা যায়, তাহাকে স্থূল ধ্যানই বলা যায়।

শিষ্য। শিবের ধ্যানে কি বুঝিব, তাঁহার রূপেরই না হয়, ব্যাখ্যা

বুঝিলাম, কিন্তু সাধক বা পূজকের কি উপকার হইবে, তাহা আমি ভালরূপে বুঝিতে পারি না। মনে করুন, ধ্যান অর্থে ধ্যান-মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-রূপের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা করা। কিন্তু সে রূপের চিন্তা করিলে সাধকের বা পূজকের যে উপকার হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন!

গুরু। ধ্যানই মন স্থির করিবার একমাত্র উপায়। তোমাকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, সাধন-পূজন প্রভৃতি সকলের উদ্দেশ্যই মনের একাগ্রতা সাধন করা। মনোবৃত্তি একমুখী হইলে জগতের কোন ঐশ্বর্য্যই তাহার করতলগত হইতে বাকি থাকে না; সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে। আমাদের মুনি ঋষিরা যে সর্ব্বক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তাহা মনের একাগ্রতা হইতেই। ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা, ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া থাক, উহাও মনের একাগ্রতার ফল। মনের বৃত্তি সমুদয় একমুখী হইলে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না,—সে মানবদেহ পাষাণে পরিণত করিতে পারে, কাষ্ঠের তরণী স্বর্ণ করিয়া দিতে পারে। দেহের "অন্তর্বর্ত্তী অথবা বাহিরের কোন প্রদেশে যখন মন কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার শক্তিলাভ করে, তখন সে ক্রমশঃ একদিকেই অবিচ্ছেদ-প্রবাহে যাইবে। যখন ধ্যান এতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে যে, উহার বহির্ভাগটি পরিত্যক্ত হইয়া কেবল অন্তর্ভাগটির দিকেই অর্থাৎ ইহার মনের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার নামই সমাধি। যে অভ্যন্তরীণ কারণ হইতে বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পর মন সংলগ্ন রাখিতে পারিলে সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন মানুষের অসাধ্য আর কিছুই থাকে না। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহার বশীভূত হয়।

আমাদের দেশে দেবতার পূজা করিয়া মহামারী নিবারণ, মোক-

র্দমায় জয়লাভ করান, ব্যাধির আরোগ্য, বিপদের নিবারণ প্রভৃতি যাহা কিছু হইবার কথা শুনিয়া থাক, ধ্যানবলেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা না হইতে পারে, জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। শিব পূজা সেই ধ্যানশিক্ষার প্রথম সোপান।

শিষ্য। কেবল ধ্যান করিয়া গেলেই কি ধ্যান করিবার ফল পাওয়া যাইবে ?

গুরু। হাঁ, প্রথমে স্থূল ধ্যান করিতে করিতে আপনিই সূক্ষ্ম ধ্যানের ক্ষমতা আসিয়া পড়িবে। ধ্যানের যে মন্ত্র বা শব্দ, উক্ত শব্দ-দ্বারা প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিয়া থাকে—কম্পন আসিলেই, স্নায়বীয় গতির উৎপত্তি হয়। অতএব স্নায়বীয় গতিতে ঐ কম্পন মনে লইয়া গিয়া পঁহুছিয়া দেয়। মনে কম্পন উপস্থিত হইলে, আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদয় হয়। এই বাহ্য বস্তুটিই আকাশীয় কম্পন হইতে মানসিক প্রক্রিয়া পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন-গুলির কারণ। শাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয়ে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের বলে এমন শক্তি উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারায় সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ধ্যানের ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। তখন অবলম্বন ব্যতীতও ধ্যান করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। ধ্যানের পরে উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয় ?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। দেবতা সূক্ষ্ম শক্তি। আমাদের প্রদত্ত আতপ চাউল, পক্করম্ভা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য যাহা কিছু, তাহা কি তাঁহারা ভোগ করিতে পারেন ?

গুরু। হাঁ, পারেন।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। সমস্ত দ্রব্যেরই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অবস্থা বা ভাব আছে, তাহা অবগত আছ?

শিষ্য। হাঁ, তাহা জানি।

গুরু। যিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তিনি সেই প্রকার অবস্থাপন্ন দ্রব্য-ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাগণ যেমন সূক্ষ্মশক্তি,—আমাদের প্রদত্ত দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশও তেমনি তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না?

শিষ্য। দেবতারাও কি আমাদের মত আহার করিয়া থাকেন? তাঁহাদেরও কি আমাদের মত মুখ, রসনা, দন্ত, কণ্ঠনালী, উদর প্রভৃতি আছে?

গুরু। না।

শিষ্য। তবে আহার করেন কি প্রকারে?

গুরু। আহার করা অর্থ কি? আমরা স্থূল দেহী—স্থূল-দ্রব্য-গুলি দেহস্থ করিবার জন্য বা দেহরূপে পরিণত করিবার জন্য দেহ-গহ্বর দ্বারা প্রচালন পূর্ব্বক দেহস্থ করিয়া দেই,—এই না?

শিষ্য। হাঁ, তা বৈ কি।

গুরু। তাঁহারা সূক্ষ্মশক্তি—সূক্ষ্মভাগ দেহস্থ করিয়া লয়েন। গহ্বর দ্বারা প্রচালিত না করিলেই যে, দ্রব্যভাগ গৃহীত হয় না, তাহা কে বলিল? বাতাসের কি দেহ আছে?

শিষ্য। না।

গুরু। বাতাস, কুসুমের সূক্ষ্ম-ভাগ পরিমল গ্রহণ করে কেমন করিয়া? বাতাস যদি পরিমল গ্রহণ করিতে না পারিত, আমরা

কখনই ফুলের গন্ধ পাইতে পারিতাম না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ডাইলিউসনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হইবে। স্পিরিট কাঠের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাংশ কিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে? দেবতাগণও আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির বলে সমাগত হইয়া আমাদের প্রদত্ত নৈবেদ্যের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ তাঁহাদের মত সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। তবে উহা বৃথা প্রদত্ত হয় না?

গুরু। নিশ্চয়ই নহে।

শিষ্য। কিন্তু আর একটি কথা।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। দেবতাগণও কি আমাদের মত দ্রব্যলোভী? আমরা যেমন ভেটাদি পাইলে, দাতার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকি, দেবতাগণও কি আমাদের নিকটে তদ্রূপ নৈবেদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

গুরু। না, তবে আমরা যে শক্তিকে উদ্বোধিত করিব,—সে শক্তির দ্বারা কার্য্য করিয়া লইব, তাহাকে সবল, সুপুষ্ট এবং কার্য্য-ক্ষম করিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, দেবশক্তি আমাদেরই নিকট। ইহা অতীব গুহ্যতত্ত্ব।

শিষ্য। তারপরে বিসর্জ্জনের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। কিন্তু জপের বিষয় কিছুই শোনা হয় নাই। জপ করিলে কি হয়?

গুরু। পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

তজ্জপস্তদর্থ ভাবনং।

"মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্তুর যে ভাবনা, তাহার নাম জপ। জপ বলিতে কেবল মন্ত্র আবৃত্তি করা নহে। তবে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রও

আবৃত্তি করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা সেই ভাবের অভি-ব্যক্তি হইয়া থাকে।"

শিষ্য। পূজায় আর কি করিতে হয়?

গুরু। আত্মসমর্পণ।

শিষ্য। আত্মসমর্পণ কি প্রকার?

গুরু। মন্ত্রপাঠ করিয়া মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

শিষ্য। সে কি প্রকার?

গুরু। এই শিব পূজায় যাহা বলিতে হয়, শোন। পূজার সময়, যে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়, সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে হয়।

শিষ্য। সেই মন্ত্রটি আমার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। কারণ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

গুরু। মন্ত্রগুলি এবং পূজার পদ্ধতি আদি সমস্ত "পুরোহিত-দর্পণে" দেখিতে পাইবে। তবে যখন শুনিতে চাহিতেছ, তখন বলি শোন,—

প্রাণবুদ্ধি দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে॥

শিষ্য। বুঝিয়াছি, পূজ্য দেবতায় আত্ম-মিশ্রণই ইহার উদ্দেশ্য। সাধু-ব্যবস্থা। তারপরে বোধ হয় প্রণাম স্তব কবচ পাঠ ইত্যাদি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। স্তবাদি পাঠে কি হয়?

গুরু। তাঁহার গত লীলা দর্শন হয়।

শিষ্য। ভয়ানক কথা!

গুরু। কি ভয়ানক?

শিষ্য। গতলীলা শ্রবণ করা হয় বলিলেই সুষ্ঠু হইত; গতলীলা দর্শন হইবে, কি প্রকারে?

গুরু। তাহা হইতে পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে পারে, তাহা আমাকে বলুন। আপনার নিকটে এই সকল বিষয় যতই শুনিতেছি, ততই যেন এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি।

গুরু। আজি সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যোপাসনার সময় উপস্থিত, অন্য দিন ঐ সকল কথার আলোচনা করা যাইবে।

শিষ্য। তবে প্রণাম, অদ্য বিদায় হই।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তান্ত্রিকী-সাধনা।

শিষ্য। বৈদিক ও পৌরাণিক সাধনা ব্যতীত দেবতা আরাধনার জন্য তান্ত্রিক বিধান প্রচলিত আছে ?

গুরু। প্রচলিত কি অধিকাংশ স্থলেই তন্ত্রের মতে দেবতাগণের আরাধনা হইয়া থাকে ? এবং তান্ত্রিক মতেই দেবতা আরাধনায় অতি শীঘ্র ফল লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাহার কারণ কি ?

গুরু। তান্ত্রিকগণ এরূপ সহজ ও সরলপন্থা সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহাতে মানব যোগের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

শিষ্য। তন্ত্রের প্রচলিত মত কি ভাল ? অনেক স্থলে যেন তাহা পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যের কথা বলিয়া জ্ঞান হয়।

গুরু। তুমি বোধ হয় মদ্য মাংসাদি সেবন সম্বন্ধীয় কথাই বলিতে যাইতেছ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিলে তোমার বোধ হয় এ ভ্রম থাকিত না।

শিষ্য। আপনি বোধ হয় মদ্য মাংসাদির অন্য প্রকার অর্থ জানাইতে চাহেন?

গুরু। না, সে কথা পরে হইবে। আপাততঃ এই কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি যে, তন্ত্রশাস্ত্র শিবরচিত—যাহা যোগের অত্যুত্তম রত্নোজ্জ্বল পন্থা,—তাহা কেবল পার্থিব ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা চিন্তা করাও মহাপাতক। যে তন্ত্রশাস্ত্রে ঐরূপ বিষয়োপভোগের কথা লিখিত আছে, সেই তন্ত্রশাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে অদর্শী ছিলেন? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে তোমাকে এই বিষয়ে একটু শুনাইতেছি। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, তন্ত্রের বক্তা স্বয়ং পরম যোগী মহাদেব, আর শ্রোত্রী আদ্যাশক্তি ভগবতী।

"দেবী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবগণের গুরুরও গুরু, আপনি যে পরমেশ পরব্রহ্মের কথা বলিলেন, এবং যাঁহার উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, হে ভগবান্! কি উপায়ে সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন? হে দেব! তাঁহার সাধন বা মন্ত্র কিরূপ? সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানই বা কি? এবং বিধিই বা কিরূপ? হে প্রভো! আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

সদাশিব বলিলেন, হে প্রাণবল্লভে! তুমি আমার নিকটে গুহ্য

হইতে গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কর। আমি এই রহস্য কুত্রাপি প্রকাশ করি নাই। গুহ্য বিষয় আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি বলিতেছি। সেই সচ্চিৎ বিশ্বাত্মা পরমব্রহ্মকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? হে মহেশ্বরি! যিনি সত্যাসত্য নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে যথাযথ স্বরূপ বা লক্ষণ দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে? যিনি অনিত্য-জগন্মণ্ডলে সৎরূপে প্রতিভাত আছেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বত্র সমদৃষ্ট, সমাধি-সাহায্যে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি দ্বন্দ্বাতীত নির্ব্বিকল্প ও শরীর-আত্মজ্ঞান পরিশূন্য, যাঁহা হইতে বিশ্ব-সংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং যাঁহাতে সমুদ্ভূত হইয়া, নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাতে সকল বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সে কি প্রকার ব্যাপার, তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে। যথা,—

তৎসাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে।
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; ৩য় উঃ।

"হে প্রিয়ে! তটস্থ-লক্ষণের সাহায্যে যাঁহারা ব্রহ্মলাভে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পশ্চাল্লিখিত সাধনা আকাঙ্ক্ষা করে,—আমি সেই সাধনতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি,—শ্রবণ কর!"

ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে? যে তন্ত্র ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়াও তাহা সাধারণের অধিগম্য নহে, এবং তটস্থ লক্ষণে আরাধনা করিলে শীঘ্র তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় করিবার জন্যই তন্ত্রের সাধনা শিবকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে কি এখনও বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তন্ত্রোক্ত সাধনা, অতি পবিত্র; এবং তাহা মোক্ষপ্রাপ্তির সহজ উপায়।

শিষ্য। বর্ত্তমান কালের অনেকে বলিয়া থাকেন, তান্ত্রিক সাধন, আধুনিক ব্রাহ্মণদিগের কল্পিত-পন্থা। তন্ত্রের কাল, চৈতন্য দেবের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বলিয়াই তাঁহারা অনুমান করেন। তাঁহারা বলেন, —তন্ত্রোক্ত সাধনা-প্রণালীতে কোন সার পদার্থ নাই। প্রত্যুত, অনেক ব্যভিচারের কার্য্য আছে।

গুরু। বর্ত্তমান কালের অনেকে অনেক বিষয়ই অনুমান করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, বেদ কৃষকের গান,—রামায়ণ মহাভারত অসভ্য ব্রাহ্মণ-লিখিত অশ্লীল গাথা,—পিতা মাতামহ সভ্যতাহীন,—মাতা ভগিনী উলঙ্গিনী ও অশিক্ষিতা,—এবং পক্ষী বিশেষের ডিম্ব ও জন্তু বিশেষের মাংসাহার না করাতেই ভারতবাসী অধঃ-পাতের তমোময় গুহায় প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং ম্যালেরিয়া বল, কলেরা বল, দুর্ভিক্ষ বল, জল-কষ্ট বল এরূপ ঘটিবার কারণ বাল্যবিবাহ— এ সকল তাঁহারা অনুমান করিয়া থাকেন। বানরগুলা যে, তাঁহাদের আদিপুরুষ, তাহাও তাঁহারা অনুমান করেন; তাঁহাদের অনুমানের বালাই লইয়া মরি,—কিন্তু সে সকল অনুমানে তোমার আমার কি আসিয়া যায়? যাঁহারা ঐ সকল অনুমানের নিক্তি লইয়া তৌল করিয়া এই সকল দর্শন করিতেছেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা কোন পুরুষে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করা দূরে থাকুক, দর্শনও করেন নাই,—হয়ত "তন্ত্র" বানান করিতেই তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্র যে, কি বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি যোগ এবং কি ভাবসাগর, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার অধিকার কাহারও নাই। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিলে, মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে হয়, যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতদূর উন্নত সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি মানুষ না দেবতা ছিলেন! তন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া, তন্ত্রের বিজ্ঞান ও তন্ত্রের অভাবনীয়

অলৌকিক ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া, নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে, উহা মানুষ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় নাই,—বাস্তবিকই দেবদেব পরমযোগী শিব কর্ত্তৃক উহার প্রচার হইয়াছিল। তন্ত্রে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না,—তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালীতে শীঘ্রই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্ত্রের কথা এই যে, কলির মানুষ অল্পায়ুঃ ও অল্পবিত্ত হইবে, তাহাদের দ্বারা কঠোর সাধনা সম্ভব হইবে না,—তাই সেই অল্পায়ুঃ, অল্পবিত্ত, অল্প মেধাবী জীবের নিস্তারের জন্য মহাদেব এই পথের আবিষ্কার করিয়াছেন। সে কথা, তন্ত্রশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন।

আমি মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে একটু তোমাকে এ স্থলে শুনাইতেছি। কিন্তু মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ শুনাইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে বলিয়া কেবল বাঙ্গালাটুকু শুনাইব। মূলশ্লোক দেখিবার প্রয়োজন হইলে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দেখিবে। আজি কালি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অতি সুলভ হইয়াছে। যে টুকু তোমাকে শুনাইতেছি, উহা মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম উল্লাসের অষ্টাদশ শ্লোক হইতে তিপ্পান্ন শ্লোকের অনুবাদ বলিলাম, মূলের সহিত উহার প্রত্যেক বর্ণ মিলাইয়া দেখিতে পার।

আদ্যাশক্তি কহিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি সর্ব্ব ভূতের অধীশ্বর এবং সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; হে ভগবন্! আপনি অন্তর্য্যামিত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মাণ্ডের নিখিলতত্ত্ব অবগত আছেন। ১৮। আপনি কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বিত চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ বেদ সকলে সমুদয় বর্ণ ও আশ্রমের বিধি ব্যবস্থাপিত আছে। ১৯। আপনার কথামত যাগ-যজ্ঞাদি সাধন করিয়া সত্যযুগের পুণ্যবান মনুষ্যেরা দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। ২০। তৎকালীন লোকেরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাধ্যয়ন, পরমার্থ চিন্তা, তপস্যা, দয়া ও দানশীলতায়

দ্বারা মহাবলবান মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ২১। তাঁহারা দৃঢ়ব্রত, দেবকল্প ও মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও দেবলোকে গমন করিতেন; সে সময় সকলেই সত্যবাদী সাধু ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন। ২২। তৎকালে রাজারা সত্য-সঙ্কল্প ও প্রজাপালনপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় এবং পরের পুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় দর্শন করিতেন। ২৩। সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে লোষ্ট্রের ন্যায় দেখিতেন, এবং সকলেই স্বধর্ম্মনিরত ও সৎ পথাবলম্বী ছিলেন। ২৪। কেহই মিথ্যাবাদী, প্রমাদী, চোর, পরদ্রোহী ও দুরাশয় ছিল না। ২৫। তাহারা মাৎসর্য্য, রোষ, লোভ বা কামুকতার হস্তে নিপতিত হয় নাই, সকলেরই অন্তঃকরণ সৎ ও আনন্দময় ছিল। ২৬। তৎকালে বসুন্ধরা নানা শস্যশালিনী ছিলেন, জলদাবলী কালে জলবর্ষণ করিত, গাভীগণ দুগ্ধভারাবনত ও বৃক্ষ সকল ফলভরে পূর্ণ ছিল। ২৭। সে সময়ে অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ বা রোগ ভয় ছিল না; সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগ, তেজস্বী ও রূপ গুণ সমন্বিত ছিল। ২৮। স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী ছিল না। সকলেই স্বামিভক্তিপরায়ণা ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইতেন। ২৯। তাঁহারা আপনাপন জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া নিস্তারপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্যযুগাবসানে ত্রেতাসমাগমে আপনি ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অঙ্গহীনতা দেখিলেন। ৩০। কারণ সে সময়ে মনুষ্যগণ বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা আপনাদের ইষ্টসাধনে অসমর্থ হইলেন; তাঁহারা জানিলেন, বৈদিককার্য্য সমাধা করা নিতান্ত সাধনা-সাপেক্ষ, এবং বহুতর ক্লেশ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩১। মানবগণ যখন বৈদিককার্য্য সাধনে অপারগ হইলেন, তখন তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সমাধি চিন্তার উদয় হইল, তাঁহারা বেদোক্ত কার্য্য সাধন বা তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া

খিদ্যমান হইলেন। ৩২। আপনি তৎকালে বেদার্থময় স্মৃতি শাস্ত্র প্রকটন করিয়া তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে অক্ষম লোকদিগকে দুঃখ শোক ও পীড়াদায়ক পাতক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—আপনি ভিন্ন এই ঘোরতর সংসারসমুদ্র হইতে জীবগণকে কে আর রক্ষা করিতে পারে? ৩৩—৩৪। আপনি পিতার ন্যায় অধম জীবের পালন কর্ত্তা, ভরণ-পোষণকর্ত্তা ও উদ্ধার-কর্ত্তা, আপনি সকলের প্রভু ও কল্যাণ-বিধাতা। অনন্তর যখন দ্বাপর যুগের প্রবর্ত্তনা ঘটিল, তখনই স্মৃতি-সম্মত ক্রিয়াদি প্রাণ পাইতে লাগিল। ৩৫। তৎকালে ধর্ম্মের অর্দ্ধলোপ ঘটে,—সুতরাং মনুষ্যগণ নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি-পরিপূর্ণ হইল, এই সময়ে আপনি সংহিতা শাস্ত্রের উপদেশ প্রদানে মনুষ্যকে উদ্ধার করেন।৩৬। এক্ষণে সর্ব্ব ধর্ম্মলোপী, দুষ্টকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, দুরাচার দুষ্প্রপঞ্চ কলির অধিকার। ৩৭। এই কালে বেদ প্রভাব খর্ব্বীকৃত হইল, স্মৃতি ও বিস্মৃতি সাগরে মগ্নপ্রায়;—এ সময়ে নানা প্রকার ইতিহাসপূর্ণ নানাপথ প্রদর্শক পুরাণাদির নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকিবে না; সুতরাং সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠিবে। ৩৮—৩৯। কলির জীবগণ উচ্ছৃঙ্খল মদোন্মত্ত, সর্ব্বদা পাপলিপ্ত, কামুক, অর্থলোলুপ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, অপ্রিয়ভাষী ও শঠ হইয়া উঠিবে। ৪০। এই কালের লোকেরা অল্পায়ুঃ, মন্দমতি রোগ-শোক-সমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকার্য্যপরায়ণ হইবে। ৪১। এই কালে নীচ সংসর্গে রত, পরস্বাপহারী, পরনিন্দা পরদ্রোহ ও পরগ্লানিতৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে। ৪২। পরস্ত্রীহরণে ইহারা পাপশঙ্কা বা ভয় করিবে না;—ইহারা নির্ধন, মলিন, দীন ও চিররুগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিবে। ৪৩। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি বিরহিত হইয়া শূদ্রের ন্যায় আচারবান্ হইবে; তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অযাজ্য যাজন করিবে, এবং দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবে। ৪৪।

ইহারা মিথ্যাবাদী, মূর্খ দাম্ভিক ও ঘোর প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে; কন্যা বিক্রয় করিবে, পতিত ও তপোব্রত ভ্রষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিবে। ৪৫। কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা লোক-প্রতারণার উদ্দেশ্যে জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে ইহাদের শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই থাকিবে না। ইহারা ঘোর পাষণ্ড ও পতিতের কার্য্য করিয়া ও আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে। ৪৬। ইহাদের আহার, কার্য্য ও আচার জঘন্য হইবে,—ইহারা শূদ্রের পরিচারক হইয়া শূদ্রান্ন গ্রহণ করিবে এবং শূদ্রাণী গমনে লোলুপ হইয়া উঠিবে। ৪৭। কলির মানব অর্থলোভে নীচ জাতীয় ব্যক্তিকে আপনার পত্নীবিনিয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কিংবা পানাদির নিয়ম থাকিবে না; ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্লানি ও সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে থাকিবে। ৪৮-৪৯। ইহাদের নিকট সৎকথার আলাপ কখনই স্থান প্রাপ্ত হইবে না। যাহা হউক,—জীবগণের উদ্ধারের জন্য আপনি তন্ত্র শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ৫০। আপনি ভোগ ও অপবর্গ-বিষয়ক বহুবিধ আগম ও নিগম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেবীগণের মন্ত্র ও যন্ত্রাদির সাধনোপায় আছে। ৫১। আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির লক্ষণ ও নানাপ্রকার ন্যাসের কথা বলিয়াছেন; আপনি বদ্ধাসন ও মুক্ত-পদ্মাসন প্রভৃতি অশেষ প্রকার আসনের কথাও বলিয়াছেন। ৫২। যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্র সাধনা ঘটে, আপনি তাদৃশ পশু, বীর ও দিব্যভাবের সাধনা বলিয়াছেন,—তদ্ব্যতীত শবাসন, চিতারোহণ ও মুণ্ডসাধন প্রভৃতির কথাও বলিয়াছেন। ৫৩।"

তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে যাহা শ্রবণ করাইলাম, তাহাতে তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, তন্ত্র কেবল অজ্ঞানীর অন্ধকার হৃদয়ের কতকগুলি কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ নহে। ইহা ভোগাসক্ত জীবের

ভোগের পথ দিয়া নিবৃত্তির পথে সহজে যাইবার অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সকলে পরিপূর্ণ। তন্ত্রোক্ত বিধানে আরাধনা করিলে, দেবশক্তি অতি সহজে ও অল্প সময়ে লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য দেবশক্তি আরাধনা দ্বারা বশীভূত করিতে পারিলে, মানুষ দেবতার ন্যায় হইয়া বিভূতি প্রকাশে সক্ষম হয় এবং ক্রমে ঈশ্বর-প্রেমের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কলির লক্ষণ ও কর্ত্তব্যতা।

শিষ্য। আপনি কলিকালের জীবের জন্যই তান্ত্রিক সাধনের শ্রেষ্ঠতা এইরূপই বলিলেন, এবং কলিকালের মানবের স্বভাব যেরূপ হইবে, প্রধানতঃ তাহারও কীর্ত্তন করিলেন। আমি শুনিয়াছি, শাস্ত্রে কলির মানবগণের স্পষ্টলক্ষণও বর্ণিত হইয়াছে। সে কি গ্রন্থে?

গুরু। বহুল পুরাণে, বহুল তন্ত্রে কলির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণে কলির মানবগণ যেরূপ আচার ব্যবহার সম্পন্ন হইবে, দেশ ও দশের অবস্থা যেরূপ হইবে, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও সুস্পষ্টরূপে তাহা লিখিত হইয়াছে। আশা করি, ততটা বলিবার আমার সাবকাশ নাই বলিয়া বলিতে পারিলাম না, ইহাতে তুমি ক্ষুব্ধ হইবে না। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবে। হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে তথ্য অবগত হইতে হইলে, তাহা পাঠ ও তদ্বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের কলির মানবের কথা যাহা পূর্ব্বে আমাকে শ্রবণ করাইলেন, তদ্ভিন্ন আরও কিছু আছে নাকি?

গুরু। হাঁ, আছে। বর্ত্তমানে এখন যে অবস্থা ঘটিয়াছে—বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যোগ-চক্ষুতে দর্শন করিয়া তাহা মহর্ষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য। আমাকে সেইটুকু শুনাইয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। শুনাইতে হইলে, তাহার মূল সমেতই শুনাইতে হয়। নতুবা তুমি ভাবিতেও পার, বর্ত্তমানের অবস্থা জানিয়া আমি বুঝি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তোমাকে তাহা শুনাইতেছি। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;—

যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদাতু ম্লেচ্ছ জাতীয়া রাজানো। ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদাস্ত্রিয়োঽতি দুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোক বর্ষিণঃ।
অসম্যক্ ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদাধনকণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবল কলিঃ॥
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যথা মদ্যাদি সেবনম্।
কলাবপি তথা কুর্য্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র. ৪র্থ উঃ।

"যখন কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন বৈদিক বা পৌরাণিক দীক্ষা পৃথিবীতে স্থান পাইবে না। হে শিবে! যে সময় সংসারে পাপপুণ্যের বেদোক্ত পরীক্ষার শক্তি থাকিবে না, তখনই জানিবে যে, দুর্জ্জয় কলি সমুপস্থিত। কুলেশ্বরি! তুমি যখন দেখিবে যে, সুর-তরঙ্গিনী গঙ্গা স্থানে স্থানে ছিন্না-ভিন্না (পুল প্রভৃতির দ্বারা) হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, কলি প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হে মহাপ্রাজ্ঞে! যখন দেখিবে, অতিশয় অর্থলোলুপ ম্লেচ্ছজাতিগণ রাজা হইয়াছে, তখনই জানিতে পারিবে যে, কলি প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সময়ে স্ত্রীলোক অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কর্কশ, কলহপ্রিয় ও পতিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, তখনই জানিবে কলি প্রবল হইয়াছে। যে সময়ে লোকে কামকিঙ্কর ও স্ত্রৈণ হইয়া গুরুজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে থাকিবে, সেই সময়ই জানিবে, কলির ঘোর আধিপত্য দাঁড়াইয়াছে। যৎকালে ধনলোভান্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ, স্বজনগণ ও অমাত্যগণ পরস্পর কলহে ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত। যে সময়ে প্রকাশ্যভাবে মদ্য মাংস ভোজন করিলেও কেহ নিন্দা করিবে না, কেহ দণ্ড দিবে না,—প্রত্যুত সাধারণে গুপ্তভাবে সুরাপায়ী হইবে, তখনই বুঝিবে, কলির অতিশয় প্রাদুর্ভাব দাঁড়াইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে কুলধর্ম্মানুসারে যেরূপ সুরাপানের নিয়ম ছিল, কলিতেও তাহার অন্যথা হইবে না।"

শিষ্য। কি কঠোর সত্য। আচ্ছা, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের কথিতানুসারে বর্ত্তমান কালকেই প্রবল কলি-কাল বলা যাইতে পারে?

গুরু। হাঁ,—তা বলা যাইতে পারে বৈ কি।

শিষ্য। এই কলিকালের জন্যই কি তন্ত্রোক্ত সাধনা পদ্ধতি?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। কেন, অন্যান্য কালে তন্ত্রোক্ত সাধনা প্রচলিত ছিল না আর কলিকালেই বা তাহার প্রচলন হইল কেন?

গুরু। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি ব্রহ্মোপাসনায় সকলেই সক্ষম নহে। ক খ শিখিয়া তার পর দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়। আগে মনুষ্যত্বের অনুশীলন করিয়া মানুষ হইতে হয়, তৎপরে দেবতার আরাধনা করিয়া দেবতা হইতে হয়—তার পরে ব্রহ্মোপাসনা। অধিকার ভেদে উপাসনার প্রণালী ভেদ। কথাটা মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও অতি পরিষ্কাররূপে কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কি লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে। যথা,—

নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্।
বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্গুপ্তসাধনম্॥
যে তত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ।
ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানুষা গতকিল্বিষাঃ॥
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ।
কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ॥
যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা।
যোগেঽপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয় মশ্নুতে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উঃ।

সদাশিব কহিলেন,—"আমি দেশভেদে নানাপ্রকার আচার ও নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছি,—কোন কোন তন্ত্রে গুপ্ত সাধনার কথাও বলিয়াছি। যে মনুষ্য যেরূপ আচার, ভাব ও যে সাধনার অধিকারী, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফলভোগী হইয়া থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ হইয়া সংসার সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয়। জন্মজন্মা-

র্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে কুলাচারে যাঁহাদের বাসনা হয়, তাঁহারা কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া সাক্ষাৎ শিবময় হইয়া থাকেন। যেখানে ভোগ বাহুল্যের বিস্তৃতি, সেখানে যোগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ,—সেই খানেই ভোগের অভাব—কিন্তু কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগ উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়।"

শিষ্য। এই কুলাচারে বুঝি পঞ্চ-ম-কারের সাধনা?

গুরু। সে কথা কেন?

শিষ্য। সে সাধনা কি ভাল?

গুরু। কোন সাধনাপ্রণালীই দূষণীয় নহে।

শিষ্য। যাহাতে মদ্য-মাংসাদি সেবনের ব্যবস্থা, সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

গুরু। কেন?

শিষ্য। উহাতে মানবগণকে অধঃপতনের পথেই লইয়া গিয়া থাকে।

গুরু। কিন্তু যাহার ভোগ বাসনার বিলোপ হয় নাই?

শিষ্য। তাহাকে কি উহা সেবন করিতেই হইবে? আমি অনেক-স্থলে দেখিয়াছি, লোকে মদ্যাদি সেবন আরম্ভ করিয়া আর কিছুতেই নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না। মদ্যাদি সেবন করিয়া যে, ভোগের তৃপ্তি সাধন করিয়া পুনরায় ধর্ম্মপথে আসিতে সক্ষম হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমি কিছুতেই করিতে পারি না।

গুরু। নিশ্চয়ই নহে। যে মদ্যপানে আসক্ত,—ধর্ম্মপথ ত দূরের কথা, সে নৈতিক পথেও বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না। মদ্যপানে মানবের আসক্তি অসৎপথেই প্রধাবিত হয়। মদ্যপানে মানুষ সকল দোষের আকর হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পঞ্চ-ম-কার-তত্ত্ব।

শিষ্য। আপনি বোধ হয় তবে ঐ পঞ্চ-ম-কারের অন্য প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থ করিতে চাহেন ?

গুরু। পঞ্চ-ম-কারের আবার আধ্যাত্মিক অর্থ কি ?

শিষ্য। আমি অনেকের নিকটে শুনিয়াছি, পঞ্চ-ম-কার অর্থে মদ্য মাংসাদি নহে। উহার অর্থ অন্য প্রকার।

গুরু। অন্য প্রকার কিরূপ ?

শিষ্য। মদ্য মাংস প্রভৃতি বলিতে শুঁড়ির দোকানের মদ বা ছাগ মাংসাদি নহে।

গুরু। তবে কি ?

শিষ্য। কয়েকজন পণ্ডিতের পুস্তকে আমি উহার অন্যরূপ অর্থ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শন করিয়াছি। যদি আজ্ঞা করেন বলিতে পারি।

গুরু। তাহা বলিবার আগে পঞ্চ-ম-কার কি কি বল দেখি ?

শিষ্য। আমার এইরূপ জানা আছে,—

মদ্যমাংসং তথা মৎস্য-মুদ্রামৈথুনমেবচ।
ম-কার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

গুরু। এক্ষণে কোন্ পণ্ডিতের গ্রন্থে উহার কিরূপ অর্থ পাঠ করিয়াছ, তাহা বল ?

শিষ্য। আমি একখানি মহানির্ব্বাণতন্ত্র গ্রন্থেরই ভূমিকাস্থলে

লিখিত দেখিয়াছি—ঐ তন্ত্রের অনুবাদ "তান্ত্রিক উপাসনার মূল মর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব" নাম দিয়া একটি নাতিবিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন,—

"তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য, মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা এই পঞ্চ-ম-কারের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহার উদ্দেশ্য ও মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, এতৎ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত লোকে মদ্যপানের ব্যবস্থা, মাংস-ভোজন-প্রথা, মৈথুনের প্রবর্ত্তনা ও মুদ্রার ব্যবহার জানিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ইহা নহে, তান্ত্রিক লোকের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন। যাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তান্ত্রিক উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম ও পঞ্চ-ম-কারের মূল উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে যতদূর উদ্বোধন করা হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার প্রকৃততত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আগমসারে প্রকাশ,—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ সএব মদ্য-সাধকঃ॥

তাৎপর্য্য; হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে, ইহারই নাম মদ্য-সাধক। মদ্য সাধনার ন্যায় মাংস সাধনা সম্বন্ধেও ঐ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে;—

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস-সাধকঃ॥

তাৎপর্য্য,—হে রসনাপ্রিয়ে! মা রসনাশব্দের নামান্তর,—বাক্য

তদংশ-সম্ভূত ; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাঁহাকেই মাংস-সাধক বলা যায়। মাংস-সাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্য সংযমী মৌনাবলম্বী যোগী। এইরূপ মৎস্য সাধকের তাৎপর্য্য যে প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত আছে। যথা—

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ ॥

তাৎপর্য্য ;—গঙ্গা-যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সতত চরিতেছে, যে ব্যক্তি দুইটি মৎস্য ভোজন করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক, আধ্যাত্মিক মর্ম্মে গঙ্গা ও যমুনা অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা ; এই উভয়ের মধ্যে যে শ্বাস প্রশ্বাস, তাহারাই দুইটি মৎস্য, যে ব্যক্তি এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ যে প্রাণায়াম সাধক শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া কুম্ভকের পুষ্টি সাধন করেন, তাঁহাকেই মৎস্য-সাধক বলা যায়। এইরূপ মুদ্রা সম্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ ॥
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য,—হে দেবেশি! শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা-ভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও তাহার তেজঃ কোটি সূর্য্য-সদৃশ ; কিন্তু স্নিগ্ধতায় ইনি কোটি চন্দ্র তুল্য। এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর, এবং কুণ্ডলিনী শক্তি সমম্বিত—যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রা-সাধক হইতে পারেন।

মৈথুনতত্ত্ব অতিশয় দুর্ব্বোধ্য এবং এ সম্বন্ধে গুরু পরম্পরায় দুইটি

মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের মতে মৈথুন-সাধক পরমযোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা বায়ুরূপে লিঙ্গকে শূন্যরূপ যোনিতে প্রবেশ করাইয়া কুম্ভকরূপ রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মতান্তরে তন্ত্রে প্রকাশ আছে যে,—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং॥

তাৎপর্য্য;—মৈথুন-ব্যাপার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; ইহা পরম তত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুন ক্রিয়াতে সিদ্ধিলাভ ঘটে, এবং তাহা হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ম-কারের প্রতি ঘোর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বিশ্বাস যে, পঞ্চ-ম-কারের এইরূপ অর্থ কতকটা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু আপনি বলিলেন,—“পঞ্চ-ম-কারের আবার আধ্যাত্মিক অর্থ কি?” কেন, উক্ত পণ্ডিতমহাশয় যে আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়াছেন, তাহা কি অশাস্ত্রীয়, না অযৌক্তিক?

গুরু। তোমার নিকট পণ্ডিতমহাশয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল! শিষ্য বাড়ী গুরু আসিয়াছেন,—গুরু গোস্বামীঠাকুর। তিলক, মালা এবং গোপী চন্দন ও নামাবলীতে যথাবিধি তদীয় দেহ অলঙ্কৃত। মস্তক মুণ্ডিত এবং একটী সূক্ষ্ম শিখা সেই মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যস্থলে ধীর সমীরে ঈষদান্দোলিত হইয়া আপনার ক্ষীণতার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে। মুখে সর্ব্বদাই “রাধাবল্লভ—প্রাণবল্লভ হে’র ধ্বনি।”

গুরুর আগমনে গৃহস্থ যথাসাধ্য সেবার আয়োজন করতঃ গুরু সেবা

প্রদান করিল। তারপর সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের সন্ধ্যাহ্নিক ও জলযোগ সমাধা হইলে, শিষ্য গুরুদেবের নিকটে তত্ত্বকথা জানিতে অভিলাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো! মৎস্য এবং মাংস উভয়ই জীবদেহ। উভয়ই আমিষ; তবে মাংস খাইতে নাই কেন, আর মাছই বা খাইতে আছে কেন? আমরা নয় যা হয় তা করিতে পারি বা করিয়া থাকি;—কিন্তু মৎস্য যখন প্রভুর সেবাতেও লাগিয়া থাকে, তখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছি যে, মৎস্য ভক্ষণে দোষ নাই,—কিন্তু প্রভো! এই পার্থক্যের কারণ কি? মাংস বা খাইতে নাই কেন? আর মৎস্য বা খাইতে আছে কেন?

প্রশ্ন শুনিয়া গুরুদেব একবার জৃম্ভনত্যাগের পর দশবার প্রভুর নাম স্মরণ ও ছোটিকাপরিচালন পূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"বৎস! ও সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অতিশয় গুহ্য। গুহ্য কি গুহ্য হইতেও গুহ্য।"

শিষ্য, গুরুদেবের গৌরচন্দ্রিকা শ্রবণে কি একটা নূতনত্ব শ্রবণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে ভাবিয়া আরও বর্দ্ধিত-কৌতূহল হইয়া বলিল,—"প্রভো! আমি আপনার শিষ্য—আমাকে বলিতেই হইবে, মাংস খায় না কেন, আর মাছই বা খায় কেন?

গুরুদেব গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"ওর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হ'চ্চে যে,—ওটা মাংস কি না, তাই খায় না। আর ওটা মাছ কি না, তাই খায়—বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছ? ওটা—মাংস কি না, তাই খায় না, আর এটা মাছ কি না তাই খায়।"

গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শিষ্যের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু ঐ গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আর তোমার কথিত পণ্ডিতমহাশয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাহাদুরি

কোন অংশেই প্রভেদ নাই। হায়! এই সকল পণ্ডিতমহাশয়েরা যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুবাদ আদি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে আর শাস্ত্রার্থের এমন দুর্গতি শ্রবণে ব্যথিত ও বিধর্ম্মী বা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকটে নিন্দিত হইতে হয় না।

তুমি বলিয়াছ, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুবাদকালে ভূমিকা স্বরূপে পণ্ডিতমহাশয় উহা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকগণ যখন মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পঞ্চ-ম-কারের ব্যাখ্যা পাঠ করিবে, তখন তাঁহার বিস্তার ও আধ্যাত্মিক অর্থকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন নাই। কেবল তাঁহাকে কিছু ভাবিলে আমি দুঃখিত হইতাম না। কারণ আজি কালি অবাধ মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদে এমন বহুল পণ্ডিতের বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু তন্ত্রান্তর হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার যেরূপ তাৎপর্য্যার্থ দিয়াছেন, এবং স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—পঞ্চ-ম-কারের ইহাই হইল অর্থ, আর পার্থিব অন্যান্য জিনিষ বলিয়া যাহারা ভ্রম করে—নিশ্চয়ই তাহারা ভ্রান্ত, অধিকন্তু সেরূপ করিলে পতন নিশ্চয়! এ সকল কথায়—লোকে হাসিবে ভিন্ন আর কিছুই নহে—অধিকন্তু মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পঞ্চ-ম-কারের অর্থ দেখিয়া এক মহাভ্রমে পতিত হইবে। তখন শাস্ত্রের প্রতি পাঠকের অসামঞ্জস্যজনিত একটা দারুন সন্দেহের উদয় হইবে।

শিষ্য। আপনি কি বলিতে চাহেন, পঞ্চ-ম-কারের সাধারণ অর্থই শুদ্ধ।

গুরু। আমি বলিব কি,—শাস্ত্রেই তাহা আছে।

শিষ্য। তবে পণ্ডিতমহাশয় যে, শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?

গুরু। সকল পদার্থেরই একটা স্থূল ও সূক্ষ্মভাব আছে অর্থাৎ বাহির-অন্তর আছে। বলা বাহুল্য, আগে বাহির, তারপরে অন্তর। আগে স্থূল, তারপরে সূক্ষ্ম। আগে পদার্থের ব্যবহার—তারপরে ভাব। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের স্থূল পদার্থ ব্যবহার,—আর পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্ধৃত আগমসারের বচনার্থ তাহার ভাবতত্ত্ব ব্যবহার।

শিষ্য। কথাটা ভাল রকমে বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কেন বুঝিতে পারিলে না? -কথাটায় ত কোন গোলযোগ নাই।

শিষ্য। না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের লিখিত পঞ্চ-ম কার যথার্থ মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য, এবং তাহাকে স্থূল বা বহির্ভাগ বলিলেন, এবং আগমসারের ঐ বচন গুলিকে অন্তর্ভাগ বলিলেন, ইহার ভাবার্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই।

গুরু। মানুষ যখন যৌবন-সোপানে পদার্পণ করে, তখন তাহার হৃদয়ে একটা ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে,—ইহা মানব-হৃদয়ের সহজাত সংস্কার বা অবশ্যম্ভাবী আকাঙ্ক্ষা,—এ কথা তুমি স্বীকার কর?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, তাহা স্বীকার করি বৈ কি। শিক্ষা না দিলেও যখন মানুষ এ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তখন ইহা স্বভাবজ বলিতে হইবে বৈ কি! জীবজন্তুও যখন এ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, তখন ইহা যে স্বভাবের নিয়ম, তাহা কে না স্বীকার করিবে।

গুরু। কিন্তু সেই ভালবাসার পদার্থ কি?

শিষ্য। সম্ভবতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষ ও পুরুষ জাতি স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষা করে।

গুরু। কেন করে জান?

শিষ্য। ভালরূপ জানি না, আপনি বলুন।

গুরু। জীবমাত্রেই জড়াকর্ষিত;—জড়ের জন্য লালায়িত। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির ভিখারী, তাই জড়ের জন্য আকাঙ্ক্ষী।

শিষ্য। উহা যদি না পায়?

গুরু। লালসা যায় না,—আজীবন লালসার আগুনে দগ্ধ হয়।

শিষ্য। আপনি কি বলিতে চাহেন,—স্ত্রী ও পুরুষের মিলন ব্যতীত ভালবাসার আকুলতা নিবারণ হয় না?

গুরু। হইতে পারে,—জগতে দুইটি পথ আছে, এক নিবৃত্তির অপর প্রবৃত্তির। নিবৃত্তি যোগ,—প্রবৃত্তি ভোগ। ভালবাসার আশাও দুই প্রকারে নিবৃত্তি হয়,—এক বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া অপর বাঞ্ছিতকে চিন্তা করিয়া। বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া যে ভালবাসা, তাহা প্রবৃত্তির পথে, আর বাঞ্ছিতকে চিন্তা করিয়া যে ভালবাসা তাহা নিবৃত্তির পথে। মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতির বর্ণিত স্থূল পঞ্চ-ম-কার প্রবৃত্তির পথে, আর আগম সারোক্ত সূক্ষ্মভাবের পঞ্চ-ম-কার নিবৃত্তির পথে, সধবা নারীর স্বামি-প্রেম আর বিধবা নারীর স্বামি-প্রেমে যে পার্থক্য—এতদুভয়েও সেই পার্থক্য। ব্রজ-সুন্দরী রাধা যখন গোকুলচাঁদকে লইয়া ক্রীড়াশালিনী তখনকার ভাব মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদির পঞ্চ-ম-কার সাধনা; আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসী হইলে, যে ভাব, তাহাই আগম-সারাদির পঞ্চ-ম-কার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চ-ম-কার বিধি।

শিষ্য। তাহা হইলে মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদিতে যথার্থই মদ্য মাংসাদির দ্বারা পঞ্চ-ম-কার সাধনের ব্যবস্থা আছে?

গুরু। নাই তবে কি মিথ্যা কথার প্রচলন হইয়া আছে?

শিষ্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা শ্রবণ করান।

গুরু। কেন তুমি কি কখনও মহানির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ কর নাই?

শিষ্য। যদিও করিয়া থাকি, তথাপি তাহার বিশেষরূপ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নহে।

গুরু। হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে পুনঃপুনঃ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের আবশ্যক। যাহা হউক, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,—

শ্রীদেব্যুবাচ। ত্বয়া কথিতং পঞ্চ-তত্ত্বং পূজাদি কর্ম্মণি।
বিশিষ্য কথ্যতাং নাথ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি॥ ১

শ্রীসদাশিব উবাচ। গৌড়ী পৈষ্টি তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধ প্রোক্তা তাল-খর্জ্জুর সম্ভবা॥
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্য বিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥ ২
যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপিবা।
নাত্র জাতি বিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥ ৩
মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং স্থলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন কেন বিঘাতিতম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতা প্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥ ৪

সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে।
যদ্ যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পতে ॥ ৫
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্য স্তত্র শাম্ভব শাসনাৎ ॥ ৬
উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীন-রোহিতাঃ ॥ ৭
মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যাঃ যদি সুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ ॥ ৮
মুদ্রাদি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদি প্রভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্ব-নিভং শুভ্রং শালি-তণ্ডুল-সম্ভবং ॥ ৯
যব গোধুমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমং ;
মুদ্রেয় মুত্তমা মধ্যা ভ্রষ্টধান্যাদি সম্ভবা।
ভর্জ্জিতান্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০
মাংসংমীনশ্চ মুদ্রাচ ফল মূলানি যানি চ।
সুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষাং শুদ্ধিরীরিতা। ১১
বিনাশুদ্ধ্যা মদ্যপানং কেবলং বিষ-ভক্ষণম্।
চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ ॥ ১২
শেষতত্ত্ব মহেশানি নির্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতা ॥ ১৩

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৬ষ্ঠ উঃ।

"দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নাথ! পূজাদিস্থলে কিরূপে পঞ্চ-তত্ত্ব নিবেদন করিতে হয়, আপনি তাহা বলিয়াছেন ;—এক্ষণে প্রার্থনা, যদি আমার প্রতি কৃপা থাকে, তাহা হইলে উহা সবিস্তার বর্ণন করুন। ১।

সদাশিব কহিলেন,—গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই * ত্রিবিধ সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য ;—এই সকল সুরা তাল, খর্জ্জুর ও অন্যান্য দ্রব্যরসে

* গুড়ের দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে গৌড়ী, পিষ্টক দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয় তাহাকে পৈষ্টি, এবং মধু দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাধ্বী কহে।

সম্ভূত হইয়া থাকে। দেশ ও দ্রব্যভেদে নানাপ্রকার সুরার সৃষ্টি হইয়া থাকে,—দেবার্চ্চনার পক্ষে সকল সুরাই প্রশস্ত। ২। এই সকল সুরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে এবং যে কোন লোকদ্বারা আনীত হউক না কেন, শোধিত হইলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে,—ইহাতে জাতি বিচার নাই। ৩। মাংস ত্রিবিধ,—জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে কোন লোকদ্বারা ঘাতিত বা যে কোন স্থান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহেই তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। ৪। দেবতাকে কোন্ কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত;—যে মাংস যে বস্তু নিজের তৃপ্তিকর ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। ৫। দেবি! পুং-পশুই বলিদান-ক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে, স্ত্রীপশু বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ; সুতরাং তাহা দিতে নাই। ৬। মৎস্যের পক্ষে শাল, বোয়াল ও রুই এই তিন জাতি প্রশস্ত। ৭। কণ্টকহীন অন্যান্য মৎস্য মধ্যম এবং বহুকণ্টক-শালী মৎস্য অধম; যদি শেষোক্ত মৎস্য সুন্দররূপে ভর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে। ৮। মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম, অধম এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যাহা দেখিতে চন্দ্রবৎ শুভ্র,—শালিতণ্ডুল, অথবা যব ও গোধূমে প্রস্তুত, যাহা ঘৃত-পক্ক ও মনোহর, তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়া গণ্য। যাহা ভ্রষ্টধান্য,—অর্থাৎ খৈ মুড়ির দ্বারা প্রস্তুত, তাহা মধ্যম এবং যাহা অন্য শস্যে ভর্জ্জিত তাহাই অধম বলিয়া কীর্ত্তিত। ৯—১০। দেবীকে সুধাপ্রদানকালে যে মাংস, মীন, মুদ্রা ও ফল মূল প্রদান করিতে হয়; তাহাই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য। ১১। শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীকে কারণ প্রদানপূর্ব্বক পূজা বা তর্পণ করিলে তত্তাবৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে, এবং দেবতাও তাহাতে প্রীত হন না। শুদ্ধি ব্যতিরেকে মদ্য পান করিলে তাহা বিষ

ভোজন হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহাতে অল্পায়ুঃ হইয়া সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১২। মহেশ্বরি! কলি প্রবল হইলে শেষতত্ত্ব সর্ব্ব দোষ বর্জ্জিত আপনার স্ত্রীতেই সম্পন্ন হইবে। ১৩।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া যাহা তোমাকে শ্রবণ করাইলাম, তাহাতে কি কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার আছে? মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে বিধি ব্যবস্থা জানিতে পারিলে, তাহাতে কি তোমার পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত আধ্যাত্মিক অর্থ আসিতে পারে?

আর উহাদের যে সামঞ্জস্য অর্থ ও ভাব এবং হেতুবাদ পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি,—এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চ-ম-কার শোধন।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই অবগত হইলাম, কিন্তু এখনও আমার ভ্রম দূরীভূত হয় নাই।

গুরু। কি ভ্রম আছে বল?

শিষ্য। মদ্য-মাংসাদি ভোজনে মানুষ পশু-প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে,—আর সেই সকল যদি দেবারাধনার কারণ হয়, তবেত বড়ই সুখের কথা। কিন্তু দ্রব্য গুণ যাইবে কোথায়, আমার বিবেচনায় মানুষ উহাতে উপকৃত না হইয়া অপকারের হস্তেই নিপতিত হইয়া থাকে।

গুরু। তুমি নিশ্চয়ই ধারণা করিয়া রাখিও,—হিন্দু ঋষিগণ যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের আলোচনা করিয়া যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানুষের অনিষ্ট হইবার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই। তবে তামাকের কলিকার আগুন কেহ যদি গায়ের কাপড়ে ফেলিয়া দেয়, তবে কি অনিষ্ট হয় না?—তা হইতে পারে।

শিষ্য। আপনার কথা এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আপনি কি বলিতে চাহেন, মদ্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শোধন হইলে, তাহারা তাহাদের স্ব স্ব গুণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্যগুণ প্রাপ্ত হয়?

গুরু। তা হয় বৈ কি।

শিষ্য। এ ও কি সম্ভব? মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য-গুণ বিদুরিত হওয়া কি সহজ কথা?

গুরু। সহজ কথা না হইতে পারে,—কথাটা গুরুতর বটে। সাধন-প্রণালীর ব্যাপারে সে গুরুত্ব সহজ ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

শিষ্য। ভাল, আগে সেই শোধনপ্রণালী টুকুই শুনিয়া লই,—তারপরে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিব। অনুগ্রহ করিয়া মদ্যাদি-শোধনের নিয়মাদি যাহা আছে, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। তাহা বলিতে হইলে অনেক মন্ত্রাদির ও কার্য্যের উল্লেখ করিতে হইবে।

শিষ্য। আমি সে সকল শিখিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা শিক্ষা করিয়া তুমি কি করিবে?

শিষ্য। সে সব শিখিতে পারিলে আমি তৎসাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

গুরু। সাধনের জন্য একটি পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

হিন্দুর প্রকাশিত সমস্ত পথই সরল ও ফলপ্রদ, কিন্তু কথা এই যে, যেমন সামান্য বাহ্য-বিজ্ঞানের আলোচনা ও তাহার ফললাভ করিতে হইলে, ঐকান্তিকতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক পথেও তদ্রূপ সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিকতার প্রয়োজন।

শিষ্য। সে সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিকতা অবলম্বন করিব।

গুরু। আজ একটি মত শুনিলাম, তাহার দিকে ছুটিয়া চলিলাম—কা'ল আর একটি মত শুনিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইলাম, ইহা দ্বারা কার্য্য হয় না। সকল পথই সরল ও সহজসাধ্য—একটু চেষ্টা করিলেই হিন্দু তাহাদের আর্য্যঋষিগণের যে কোন একটি পথ দিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

শিষ্য। তথাপিও শিখিতে আপত্তি নাই।

গুরু। শোধন অর্থে কি জান?

শিষ্য। শুদ্ধি বা বিশুদ্ধতা লাভ করান।

গুরু। তাহাতে দ্রব্যগুণের তিরোধান হওয়া বুঝায় কি?

শিষ্য। না। কিন্তু শুদ্ধি শব্দের ভাব অর্থ, যাহাতে উপকার বা উন্নতি হয় এমন কার্য্য বুঝায়।

গুরু। তাহাই ঠিক। পঞ্চতত্ত্ব শোধিত হইলে, তদ্দ্বারা অনুপকার না হইয়া উন্নতির কারণ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কি করিয়া হয়?

গুরু। তুমি কখনও মদ খাইয়াছ?

শিষ্য। আপনার সহিত মিথ্যা কথা বলিতে নাই,—আগে খাইয়াছি।

গুরু। এখন?

শিষ্য। এখন আর খাই না।

গুরু। আর দুই দিন খাইতে হইবে।

শিষ্য। মদ খাইতে হইবে—ওমা, সে কি? যাহা অনেক দিন হইল, ছাড়িয়া দিয়াছি—তাহা আবার খাইব কেন?

গুরু। মদ খাওয়া কি পাপ বলিয়া বিবেচনা কর?

শিষ্য। নিশ্চয়! শাস্ত্রে আছে—"মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং।"

গুরু। কেন বল দেখি?

শিষ্য। তা জানি না।

গুরু। মদে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়, মদে মানুষকে চিররোগী করে, মদে মানুষকে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখে,—এবং মানুষকে পশু করিয়া ফেলে, মদে শরীরের তমোগুণের অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকে,—এক কথায় মদে মানুষের সর্ব্বনাশ করে, তাই মদ্য পানে ঐরূপ নিষেধ বিধি।

শিষ্য। তবে তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য পানের ব্যবস্থা কেন?

গুরু। ব্যবস্থা আছে, আর তুমি আমি যে ভয় করিতেছি,—তাহাও তন্ত্রকার না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার জ্ঞানচক্ষু জগজ্জয়ী—তিনি সকলই জানেন। তাই দেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ।
এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর॥
কলিজা মানবা লুব্ধাঃ শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।
লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি চ সাধনম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু।
ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিত-বিবর্জ্জিতাঃ॥
পরস্ত্রীধর্ষকাঃ কেচিদ্দস্যবোবহবো ভুবি।
ন করিষ্যন্তি তে মত্তাঃ পাপা যোনি-বিচারণম্॥
অতিপানাদি-দোষেন রোগিণো বহবঃ ক্ষিতৌ।
শক্তিহীনা বুদ্ধিহীনা ভুত্বা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥
হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি।
পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ॥
কেচিদ্বিবাদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ স্বজনৈরপি।
কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজল্পকাঃ॥

অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গ বিলোপকাঃ।
হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো॥
মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে।
কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপিবা॥
স্তোত্র-পাঠং যন্ত্রলিপ্তং পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে।
যুগ-ধর্ম্ম-প্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ॥
ভবিষ্যন্ত্যতি দুর্ব্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপ-কারিণঃ।
তেষামুপায়ং দীনেষু কৃপয়া কথয় প্রভো॥
আয়ুরারোগ্যবর্চ্চসং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
বিদ্যাবুদ্ধি-প্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্॥
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবল-পরাক্রমাঃ।
শুদ্ধ-চিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রেয়স্করাঃ॥
স্বদার-নিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতা গুরু-ভক্তাশ্চ পুত্র স্বজনপোষকাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তন-মানসাঃ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াং কথয়স্ব হিতায় যৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; ২য় উঃ।

পার্ব্বতী কহিলেন,—“আপনি মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্ব সবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু কলির জীবগণ লোভী ও শিশ্নোদর-পরায়ণ,—তাহারা সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোভের বাধ্য হইয়া ঐ পঞ্চতত্ত্বে নিপতিত হইবে। তাহারা মদোন্মত্ত হইয়া হিতাহিত-বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিবে, এবং ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অপরিমেয় মদ্যপান করিতে থাকিবে। তাহারা পরনারীর সতীত্ব বিনাশ ও দস্যুবৃত্তিতে দিনপাত করিবে; সেই সকল পাপাচার ব্যক্তিগণ মত্ত হইয়া যোনি-বিচার করিবে না। তাহারা অপরিমিত পান-দোষে এই পৃথিবীতে চিররুগ্ন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে। তাহারা

মত্ত হইয়া হ্রদে, গর্ত্তে, প্রান্তরে, এবং প্রাসাদ কিম্বা পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুলোকে প্রস্থিত হইবে। কোন কোন ব্যক্তি মত্ততাবস্থায় গুরুলোক ও স্বজনগণের সহিত বিবাদ করিতে থাকিবে; কেহ বা মৃতপ্রায় ও মৌনী হইয়া থাকিবে,—কেহ কেহ বিস্তর জল্পনায় প্রবৃত্ত হইবে। ইহারা দুষ্ক্রিয়ান্বিত ক্রুর ও ধর্ম্মপথবিলোপী হইয়া উঠিবে। হে প্রভো! আপনি জীবের মঙ্গলের জন্য যে সকল কার্য্যের উপদেশ দিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কলিতে মনুষ্যগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিবে,—কে যোগাভ্যাসে রত হইবে এবং কেই বা ন্যাসাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে? হে জগৎপতে! কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ এবং যন্ত্রলিপ্ত হইয়া পুরশ্চরণ করিবে? হে প্রভো! যুগধর্ম্মপ্রভাবে এবং স্বভাব-গতিতে কলিযুগের মনুষ্যেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও পাপকারী হইয়া উঠিবে। হে দীনেশ! তাহাদের উপায় কি হইবে?—কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন। কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকের আয়ুঃ, আরোগ্য, তেজ ও বল-বীর্য্য বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যা-বুদ্ধি প্রখর ও যত্ন ব্যতিরেকে মঙ্গললাভ ঘটে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রান্ত বিশুদ্ধচিত্ত, পরহিতরত ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হয়, যেরূপে লোকে স্বদারনিষ্ঠ, পরস্ত্রীবিমুখ, দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজন-বর্গের প্রতিপালক হইতে পারে, লোক কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মপরায়ণ হয়, আপনি তাহা লোকযাত্রার সিদ্ধি এবং সকলের হিতের জন্য বর্ণনা করুন।"

তন্ত্রোদ্ধৃত ঐ বাক্যগুলি দ্বারা কি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় না যে, মদ্য মাংসাদি সেবনে মানব যে অধঃপাতে যায়, তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন, এবং যাহাতে এই বিধি-বিধানের অপব্যবহারে মানব সেই অধঃপাত-পথের পথিক হইয়া না পড়ে, তজ্জন্যও তাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সে জন্য তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে প্রবলা বাসনা উদ্ভূত হইতেছে।

গুরু। তাই তোমাকে আমি পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কখনও মদ্যপান করিয়াছ?

শিষ্য। আমিও আপনার সহিত মিথ্যা কথা বলিতে না পারিয়া বলিয়াছি, হাঁ, পূর্ব্বে খাইতাম—এখন অনেক দিন হইল, পরিত্যাগ করিয়াছি।

গুরু। কিন্তু মদ্যের একটা গুপ্ত গুণ আছে যে, পরিমিত সেবনে মনের অত্যন্ত একাগ্রতা সাধন করিতে পারে। তাই বলিয়াছিলাম, আর দুই দিন তুমি মদ্য পান করিয়া একটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

শিষ্য। কি পরীক্ষা করিব?

গুরু। একদিন কিছু মনে না করিয়া, কোন কথা না ভাবিয়া মদ্য পান করিয়া দেখিবে, তোমার চিত্তের ভাব কিরূপ হয়, আর একদিন উহা সেবনের পূর্ব্বে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি সমন্বিত-মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে হৃদয়ে পূজা করিয়া তারপরে পান করিবে, এবং পানের সময়েও তাহার মূর্ত্তি ও মহত্ত্ব চিন্তা করিতে থাকিবে, ইহাতে বা চিত্তের কি প্রকার অবস্থা ও ভাব হয়, তাহা দেখিবে।

শিষ্য। হাঁ, আমি যখন মদ্য পান করিতাম, তখন তাহা অনুভব করিয়াছি।

গুরু। কি প্রকার?

শিষ্য। আমি কখনও নিয়মিত মদ্য পান করি নাই,—কালে ভদ্রে কখনও এক আধ দিন খাইতাম। অন্য সময় যখন খাইতাম, তখন চিত্ত নানা বিষয়ে প্রধাবিত হইত,—অর্থাৎ যে দিন যেমন মনের গতি

থাকিত, সেই দিন সেই ভাবে উত্তেজিত ও প্রধাবিত হইত। কিন্তু এক দিনের কথা আপনাকে বলিতে চাহি।

আমাদের গ্রামে সেবার ওলাউঠার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ঐ কালোপম ব্যাধিতে আমাদের গ্রাম হইতে নিত্য নিত্য দশ পনরটি করিয়া নরনারী কাল-কবলে পতিত হইতেছিল। গ্রামের লোকে ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া চিরাগত প্রথানুসারে রক্ষাকালী দেবীর পূজার উদ্যোগ করিল।

কয়েকটি যুবকই তাহার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারাই চাঁদা আদায় করিয়া, দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া, পূজারম্ভ করিয়া দিলেন,—বলা বাহুল্য, ঐ চাঁদার টাকা হইতে কয়েক বোতল মদও তাঁহারা আনাইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি পূজার দিন রাত্রে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। যাঁহারা পূজার উদ্যোগী তাঁহারা আমার বন্ধু বান্ধব,—তাঁহারা অনেকেই আমার বাড়ী উপস্থিত হওয়াতে আনন্দিত হইলেন এবং সমানিত মদ্যের অংশীদার করিয়া লইলেন, আমি উহার কিয়দংশ পান করিয়াছিলাম। কিন্তু কেমনই মনের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল,—যেন জগৎটা সেই কালীমূর্ত্তির প্রতিকৃতি দর্শন করিতে লাগিলাম। সেই বরাভয় খড়্গ-মুণ্ডধরা কালিকা কালের বক্ষে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন,—আমি জগৎ ভুলিয়াছিলাম, আত্মীয়-স্বজন সব ভুলিয়াছিলাম,—কেবল সেই একরূপ হৃদয়ে নাচিতেছিল। আমার জীবনে বুঝি তেমন দিন আর আসে নাই। চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা সাধন জন্যই তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পান?

গুরু। না না। এত ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য মদ্যাদিপানরূপ অত বড় একটা গর্হিত কার্য্যের আয়োজন বা প্রয়োজন হইতে পারে না।

শিষ্য। মদ্যাদি পান কি গর্হিত?

গুরু। গর্হিত বলিয়া গর্হিত। মদ্যাদি পান করিলে, ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

শিষ্য। যাহা প্রায়শ্চিত্তার্হ তাহা দ্বারা দেবতা বশীভূত হয়েন?

গুরু। অন্ন ভক্ষণে কি পাপ?

শিষ্য। অন্ন ভক্ষণে পাপ কেন? আমরা ত সকলেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকি।

গুরু। কিন্তু অন্ন ভক্ষণেও মহাপাতক আছে এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

শিষ্য। কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চণ্ডালাদির অন্ন ভক্ষণে পাপ হয় কি না?

শিষ্য। হাঁ, তা হয়।

গুরু। সেইরূপ মদ্যপানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,—এবং সাধনার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে পান করিলে তাহাতে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয় না;—প্রত্যুত তাহাতে প্রকৃতিরূপা মহাকালী বশীভূতা হইয়া থাকেন। কুণ্ডলীশক্তির জাগরণের ইহা একটি অতি সহজ ও সরল পন্থা। বলা বাহুল্য,—দেবতা-পূজা করিতে হইলে, কুণ্ডলীশক্তির জাগরণ ব্যতীত দেবতার আরাধনা হইতেই পারে না। যে কোন দেবতার আরাধনাই কর, কুণ্ডলীশক্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহা করিতেই হইবে। নতুবা কোন প্রকারেই ফললাভ হয় না। মদ্যাদি সাধন-দ্বারা তাহা অতি শীঘ্র—এবং সাধকের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর শাস্ত্রবিধি-বিহিত মন্ত্রাদি দ্বারা শোধিত হইলে, ঐ সকল দ্রব্যও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেমন করিয়া হয়, তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শিষ্য। শোধনের নিয়ম ও উপায়গুলি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কালী সাধনায় পঞ্চ-ম-কার-প্রকরণে সে সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চ-ম-কারে কালী সাধনা।

শিষ্য। পঞ্চ-ম-কারের সাধন-প্রণালী প্রভৃতি কালী-সাধনায় আছে, ইহা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সাধন-প্রণালী আমাকে বলুন।

গুরু। এস্থলে তোমায় একটি কথা বলিতে চাহি,—সাধন-প্রণালী অতিশয় গুহ্য। ইহা সর্ব্বত্র বলিতে নাই, তাহা তুমি বোধ হয়, অবগত আছ?

শিষ্য। হাঁ, তা বিশেষরূপে জানি; কিন্তু সাধন-প্রণালী গুহ্য কেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

গুরু। মন্ত্রাদি গোপনীয় এই জন্য যে, উহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে উহার শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। গানের সুর যেমন যত বাতাসের সঙ্গে মিশে ততই তাহার শক্তি কমিয়া যায়। বোধ হয়, মন্ত্রও তদ্রূপ হইতে পারে।

শিষ্য। আমার নিকটে তবে কি ঐ প্রণালী বলিতে আপনি অসম্মত?

গুরু। না, প্রণালী বলিতেছি—তবে প্রণালীর ভিতর এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা দেখাইয়া না দিলে কেহই বুঝিতে পারে না,—এবং কেহ কার্য্য বা সাধনাক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলে গুরু উহা

দেখাইয়া দিয়া থাকেন,—সেই গুলি বলিব না। যদি কখনও তুমি সাধন-পথে অগ্রসর হও, আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিখাইয়া দিব, তাহা হইলে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে যে, সে গুলির সামান্যমাত্র সাধনে যে সকল অলৌকিক কার্য্য সমাধা হইবে,—ইংরেজী বিজ্ঞানের বহু আয়াস-সাধ্য ব্যাপারেও তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। *

শিষ্য। তবে অনুগ্রহ করিয়া শাস্ত্র-বর্ণিত সাধন-প্রণালীই বলুন, এবং তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিন।

গুরু। তাহাও আমি তোমাকে সম্যক্ বলিতে পারিব না। তুমি কোনও তন্ত্রজ্ঞ-পুরোহিতের নিকটও সেই সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবে, অথবা মহানির্ব্বাণতন্ত্র একখানি পাঠ করিলেই পারিবে,—তবে এস্থলে ইহাও তোমাকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, সাধারণ পুরোহিতের নিকটে বা তন্ত্র-গ্রন্থাদিতে যাহা অবগত হইতে পারিবে, তদ্দ্বারা যেন কদাচ কার্য্যারম্ভ করিও না। যেমন পুস্তকে বাজনার বোল লেখা থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া বাজনা বাজাইতে শিক্ষা করা যায় না, তদ্রূপ পুস্তকে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিয়া সাধনা শিক্ষা হয় না। ক্রিয়ানভিজ্ঞ পুরোহিতগণও পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দান করিলে, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শিষ্য। কালী-সাধনা করিলে কি ফল হয়?

গুরু। কালকে জয় করেন, এইজন্য কালী, কালী। কালী অপরা প্রকৃতি,—অপরা প্রকৃতির রাজত্বে আমরা বিচরণ করিয়া থাকি। পরমাত্মা এই অপরা বা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়াই জীব। এই

* কেহ তান্ত্রিকী সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি ঐ সকল গুপ্ততত্ত্ব শিখিতে ইচ্ছা করেন, প্রকৃত সাধক হইলে, আমি শিখাইয়া দিতে, এবং প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়া দিতে পারি—গ্রন্থকার।

জড়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে মানুষ অষ্টৈশ্চর্য্য লাভ করিতে পারে, এবং মরজগতে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিতে পারে। তান্ত্রিকগণ এই জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই অবহেলায় সম্পন্ন করিতে পারেন। তান্ত্রিকগণ এইজন্য, মোকদ্দমায় জয় লাভ, শত্রু বশীভূত, নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ফল কথা, জড়া প্রকৃতি বশীভূত হইলে আর কোন্ কার্য্য বাকি থাকিতে পারে?

শাস্ত্রেও এ তত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদিত হইয়াছে। তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধন কারণম্।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে॥
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ স চরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা, ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ো তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্তাং বেদিতু মর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥

চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী॥
তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্র-যন্ত্রাদি সাধনম্।
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র; ৪র্থ উঃ।

সদাশিব কহিলেন,—"হে দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে. এজন্য আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি। তুমিই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি। হে শিবে! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। হে ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে,—এই নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি; তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত আছ,—কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা;—তুমিই অন্নপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী;—তুমি সর্ব্ব-দেবময়ী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী। তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-স্বরূপিণী; তুমি নিরাকার হইয়াও সাকার;—তোমার তত্ত্ব কেহই অবগত নহেন। তুমি উপাসকগণের কার্য্যার্থ, মঙ্গলার্থ এবং দানবগণের দলনার্থ নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। তুমি বিশ্ব রক্ষার জন্য কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও ষড়্ভুজা; কখনও অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। সকল তন্ত্রে তোমার নানাপ্রকার রূপভেদ, যন্ত্রভেদ ও মন্ত্রভেদের কথা উল্লেখ আছে এবং তোমার ত্রিবিধ ভাবময় উপাসনার কথাও প্রকাশ আছে।"

যাহা তোমাকে শ্রবণ করান হইল, তাহাতে তুমি কালীতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছ। এক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের শোধন ও সাধনার কথা বলিতেছি।

তান্ত্রিকমতে কালিকাদেবীর যথাবিধি পূজা* সমাপন করিবে। পঞ্চ-ম-কারের সাধনা করিতে হইলে, তদনন্তর গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপ-মুদ্রাতে ধারণ পূর্ব্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ,—তন্মধ্যে নিরাকার ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর। ইহা অব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী;—ইহা বাক্যের অগোচর এবং সাধারণের অগম্য,—কিন্তু যোগিগণ দীর্ঘকাল সমাধির আশ্রয়ে বহুকষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ধ্যানাবধারণের নিমিত্ত যে স্থূল ধ্যানের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বলিতেছি।

অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্ম্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র; ৫ম উঃ।

কালরূপিণী অরূপকালিকার গুণ-ক্রিয়ানুসারে যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহাই স্থূল ধ্যান।

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং,
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকপৌষ্পংমদং
মহাকালং বীক্ষ্য বিকসিতানন-বরামাদ্যাং ভজে
কালিকাম্॥

---

* পূজার বিধান মৎ প্রণীত "পুরোহিত-দর্পণ" নামক গ্রন্থে দেখ।

"যাঁহার বর্ণ মেঘতুল্য, ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্বল্যমান, যাঁহার তিন চক্ষু, পরিধান রক্তবস্ত্র, দুই হস্তে বর ও অভয়, যিনি ফুল্লারবিন্দে উপবিষ্ট, যাঁহার সম্মুখে মাধ্বীকপুষ্পজাত সুমধুর মদ্যপান করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেন,—যিনি মহাকালের এরূপ অবস্থা দর্শনে হাস্য করিতেছেন,—সেই আদ্যা কালীকে ভজনা করি।"

সাধক এই প্রকারে ধ্যান করিয়া আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় ভক্তির সহিত মানসোপচারে পূজা করিবে। মানসোপচারে পূজার প্রক্রম, শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপিকল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা॥
অমোহক মদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরং॥
ইতি পঞ্চদশ-পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা।

কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ।
কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৫ম উঃ।

মানসোপচারে পূজা করিবার প্রণালী এই যে, সাধক দেবীকে আপনার হৃদয়পদ্ম আসনরূপে প্রদান করিবে, সহস্রারচ্যুত অমৃতদ্বারা দেবীর পাদমূলে পাদ্য প্রদান করিবে। মন অর্ঘ্য-স্বরূপে নিবেদিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃতদ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় জল পরিকল্পিত হইবে, আকাশতত্ত্ব বসন, এবং গন্ধতত্ত্ব গন্ধস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। মনকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপ কল্পনা করিবে। হৃদয় মধ্যস্থ অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় এবং মনের চপলতাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে। আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকার পুষ্প প্রদান করিবে; অমায়িকতা, নিরহঙ্কার, রোষশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভরহিততা, মৎসরহীনতা, মানসপূজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই প্রশস্ত। অনন্তর অহিংসা-স্বরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চ পুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার ভাব-পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পরিশেষে মানসে সুধাসমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জ্জিত-মৎস্য-পর্ব্বত, মুদ্রারাশি, সুন্দর ঘৃতাক্ত পায়স, কুলামৃত, কুলপুষ্প, পীঠক্ষালন বারি এই সকল ভাব দেবীকে প্রদান করিবে।

শিষ্য। আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

গুরু। কি?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, সাধক দেবীকে ঐ সকল তত্ত্ব কল্পনায় প্রদান করিবে। কল্পনা করিলে কি দেবী তাহা প্রাপ্ত হয়েন?

গুরু। দেবী কি, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই ?

শিষ্য। তাহা বুঝিয়াছি,—কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য কল্পনায় দান করিলে কি হইতে পারে ?

গুরু। কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানুষ সামান্যীকরণের সাহায্য লইয়া থাকে ;—ইহার জন্য আবার ঘটনাসমূহ পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যক। আমরা প্রথমে ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করি, পরে সেই গুলিকে সামান্যীকৃত এবং তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মতামত সমূহ উদ্ভাবন করি। বাহ্যজগতে এমন করা অতি সহজ, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে বড়ই কঠিন। এখন তোমার কথা হইতেছে যে, কল্পনায় সমর্পণ করিলে কি হইয়া থাকে,—তাহাতে ত দেবতা প্রাপ্ত হয়েন না ? কিন্তু দেবশক্তি যাহা, তাহা তোমাকে আগেই বলিয়াছি।

এখন আরাধনার উদ্দেশ্য এই যে, মনোবৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা ;—যাহাতে উহার নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, তজ্জন্য উহার সমুদয় শক্তিগুলিকে, কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করা, ধ্যানের উদ্দেশ্য। ইহা করিতে হইলে কল্পনার আবশ্যক।

কল্পনায় কি হয়,—ইহাই তোমার জানিবার উদ্দেশ্য ?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। কল্পনাটা আর কিছুই নহে—চিন্তা ! চিন্তা করিবে, আমার হৃদয়পদ্ম দেবীর আসন হইয়াছে। এই চিন্তায় দেবীও হৃদয়পদ্মের সন্নিকর্ষ হইবেন। চিন্তা বাস্তবে পরিণত হয়। চিন্তায় মানুষ সব করিতে পারে, এ কথা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে না।

শিষ্য। এক্ষণে আর একটি কথা।

গুরু। কি ?

শিষ্য। ঈশ্বর সমস্ত জগতের মূল,—সর্ব্বজীবের হৃদয়াধিষ্ঠিত সর্ব্ব কর্ম্মের মূলতম। কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সাধনে চিন্তাশক্তির প্রয়োগে প্রয়োজন কি?

গুরু। সে কথা আগেও বলিয়াছি। আর একবারও বলিতেছি। কালের শক্তি কালী। কালী সাধনা না করিলে হয় ত জীব শক্তিশালীই হইতে পারে না। কালী সাধনা না করিলে হয় ত ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী হইতে পারে না।

শিষ্য। বুঝিলাম না। ঈশ্বরোপাসনার পূর্ব্বে কি সকলকেই কালী সাধনা করিতে হয়?

গুরু। হাঁ, তা হয় বৈ কি! কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে কালী সাধনা করিয়া থাকে।

শিষ্য। আমাকে উহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গুরু। উহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই পঞ্চ-ম-কার সাধনেরও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয়-শক্তি-প্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্যনালী আছে। এই শূন্যনালীর নিম্নদেশে কুণ্ডলিনীর আধার-ভূত পদ্ম অবস্থিত। যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগীদিগের রূপক-ভাষায় ঐ স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলীকৃত হইয়া বিরাজমানা। যখন এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্যনালীর মধ্যে বেগে উঠিবার চেষ্টা করেন, আর যতই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মন যেন স্তরে স্তরে বিকশিত হয়; সেই সময়ে নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায় ও সেই যোগীর নানারূপ অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ হয়। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তকে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক্ হইয়া

যান। এবং তাঁহার আত্মা আপন মুক্তভাব উপলব্ধি করেন। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইলে, সুষুম্নামার্গ পরিষ্কার হয় এবং মানুষ দেবতা হইতে পারে।

সাধারণ লোকের ভিতরে সুষুম্না নিম্নদিকে বদ্ধ; উহার দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না। যোগীরা যোগসাধনাদ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া থাকেন,—তান্ত্রিকগণ আরও সহজে কুণ্ডলিনীকে জাগাইবার জন্য পঞ্চ-ম-কার সাধনার প্রণালী আবিষ্কার করেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পঞ্চ-ম-কার সাধনা-প্রণালীতে মদ্যপানের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। যথা,—পূজা, হোম ও জপ-কার্য্যাদি সমাপনান্তে পঞ্চপাত্র স্থাপনানন্তর সুধা (সুরা) পান করিবে। তাহার বিধান এই,—

স্বং স্বং পাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্।
মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্॥
বিভাব্যতন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে॥
অতিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্।
সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥
অতিপানং কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে॥
যাবন্ন চালয়েদ্ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরং॥
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণা চ শক্তিসাধকে।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াদাদ্যাকালীং ভজাম্যহম্॥
যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে।
তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৭ম উঃ॥

অনন্তর কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া

মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখ-কমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞা গ্রহণান্তে কুণ্ডলী-মুখে হোম করিবে অর্থাৎ ঐ সুরা ঢালিয়া দিবে। কুলস্ত্রীগণ কেবল সুরার আঘ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না। পঞ্চপাত্রে পান কেবল গৃহস্থগণের জন্য ব্যবস্থেয় হইয়াছে। যদি অতিরিক্ত মদ্য পান ঘটে, তাহা হইলে কুলধর্ম্মাবলম্বিগণের সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তাবৎ সুরাপানের নিয়ম, ইহার অধিক পান পশুপানের সদৃশ। সুরাপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং শক্তিসাধককে যে ঘৃণা করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি 'আমি আদ্যা কালীর উপাসক' এ কথা কিরূপে মুখ দিয়া বলিবে? যেরূপ ব্রহ্ম নিবেদিত অন্নাদিতে স্পর্শদোষ নাই, সেইরূপ তোমার (কালীর) প্রসাদেও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিবে।

যাহা তোমাকে শুনাইলাম, তাহাতে তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ,—মদ খাইয়া মত্ততা এবং তজ্জনিত পাশব-আনন্দ অনুভব করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কুণ্ডলী-শক্তি আমাদের দেহস্থ শক্তি সমূহের শক্তি-কেন্দ্র। সেই শক্তি-কেন্দ্রকে উদ্বোধিত করিবার জন্যেই তন্মুখে মদ্য প্রদান করা। ইহার উদ্দেশ্য অতি শুভকর। তোমাদের পাশ্চাত্য মতে আজি কালি যে মেস্‌মেরিজম্‌ ও হিপনটিক বিদ্যার প্রচলন হইয়াছে, তাঁহারাও স্বীকার করেন, কোন কোন ঔষধের দ্বারা এই অবস্থা আসিতে পারে, কিন্তু কেন পারে, কি প্রকারে পারে,—তাহা তাঁহারা অজ্ঞাত। তাই সে সকল তথ্য জানেন না। তান্ত্রিক সাধক তাহা জানিয়াছিলেন, তাই মহাশক্তির আরাধনায় শক্তি-কেন্দ্র জাগাইবার জন্য পঞ্চ-ম-কারের আয়োজন হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

--:*:--

গুহ্য সাধনা।

শিষ্য। আরাধনার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম লাভ,—ধর্ম্ম সুখের উপায়। কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে কি সুখলাভ হইতে পারে?

গুরু। সে প্রশ্ন কেন?

শিষ্য। কালী দেবী কালের শক্তি—অন্যান্য দেবতাও সূক্ষ্মাদৃষ্ট শক্তি, শক্তি সাধনায় কি ধর্ম্ম লাভ হয়? কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আপনি বলিয়াছেন,—আরাধনার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম; ধর্ম্ম আবার সুখের উপায়।

গুরু। শক্তি সাধনাতেও আনন্দ বা সুখ আছে। ন্যায়দর্শন কেবল শক্তিতত্ত্বের আরাধনা দ্বারা মুক্তি পথে যাওয়া যায়, এইরূপ কথা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, হয়ত তন্ত্রও সেই মত অবলম্বন করিয়া শক্তি সাধনার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; ন্যায়দর্শনের মত সংসার দুঃখময়। সুখ ও দুঃখানুরক্ত, অতএব গৌণরূপে সুখ ও দুঃখ বলিয়া পরিগণিত। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখ নাশ করিতে হয়, তবে জন্ম নিবারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি,—প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই জন্মনাশের হেতু। কেন.না, জীব প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করে; তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির হেতু কি? দোষ। আসক্তি, বিদ্বেষ অথবা প্রমাদ দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই রাগ দ্বেষ ও মোহ মিথ্যা জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অতএব এই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধন করিতে না পারিলে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হইবে না।

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্।
উত্তরোত্তরাঽপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্ অপবর্গঃ॥ *

১।২ ন্যায়;

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করে। ন্যায় দর্শনের উদ্দেশ্য—এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান করা। কিসের তত্ত্বজ্ঞান? ন্যায় দর্শনের উত্তর এই যে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ এবং প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান পরতঃ অপবর্গের হেতু। অপবর্গ অর্থে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ। (১ম অধ্যায় ১ সূঃ)।

ন্যায় দর্শনের অভিমত এই ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি? (১) প্রমাণ — প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (Means of knowledge) প্রমাণ চারিপ্রকার;—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference) উপমান (Analogy) ও শব্দ (আপ্তবাক্য)। (২) প্রমেয়— প্রমাণের বিষয় (Objects of knowledge) প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার; —আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, (চক্ষু কর্ণ, প্রভৃতি) অর্থ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ) বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (Activity) দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জ্জন্ম), ফল (কর্ম্মফলভোগ) দুঃখ ও অপবর্গ। (৩)

* 'যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যা জ্ঞানম্ অপযাতি' তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযান্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপযাতি প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্ম অপযাতি, জন্মাপায়ে দুঃখম্ অপযাতি। দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি। বাৎস্যায়ন-ভাষ্যং।

সংশয় (Doubt)। (৪) প্রয়োজন (Purpose)—যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। (৫) দৃষ্টান্ত (Instance। (৬) সিদ্ধান্ত—বিষয়ের নিশ্চয় (৭) অবয়ব=ন্যায়ের একদেশ (Premiss)। (৮) তর্ক (Reasoning)। (৯) নির্ণয়=পরপক্ষ-দূষণ ও স্ব-লক্ষ স্থাপন দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (Conclusion)। (১০) বাদ (Argumentation)। (১১) জল্প (Sophistry)। (১২) বিতণ্ডা (Wrangling) (১৩) হেত্বাভাস (Fallacies) (১৪) ছল (Quibble)। (১৫) জাতি (False analogy)। (১৬) নিগ্রহ স্থান—যদ্দ্বারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (Mistake) বা অপ্রতিপত্তি (Ignorance) প্রকাশ পায়।

এই যে ষোড়শ পদার্থ যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপবর্গ লাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের বিচারেই সমগ্র ন্যায়দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম ন্যায়াংশ (Logic) ২য় তর্কাংশ (Dialectic), এবং ৩য় দর্শনাংশ (Metaphysic)। ন্যায়াংশে প্রমাণের বিচার সহ পঞ্চাবয়ব ন্যায়ের (Syllogism) গবেষণা পূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারেই সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে ঐ (Syllogism) ভুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ।

ন্যায়।

ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা কুম্ভকার আছে, জগতেরও সেইরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তা আছেন—ঈশ্বর। এরূপ ন্যায়ের তর্কে যদি কাহারও ঈশ্বরে

বিশ্বাস হয়, তবে উত্তম; কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করিলেই ভাল হয়।

ন্যায়-দর্শনের তর্কাংশ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিয়োজিত। ইহার সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ নহে। ন্যায়ের দর্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূত ও রূপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ আছে। আত্মা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, ভোক্তা ও জ্ঞাতা এবং নিত্য, ন্যায়দর্শন যুক্তিদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ন্যায়-দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিরাস-প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কর্ম্মফল দাতা তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মফল-দর্শনাৎ। ন্যায়; ৪।১৯।

ইহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

পরাধীনং পুরুষ-কর্ম্মফলারাধনম্ ইতি যদধীনম্ স ঈশ্বরঃ। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি।

অর্থাৎ—"মানুষের কর্ম্মফলভোগ যাঁহার অধীন তিনিই ঈশ্বর" ইহা ভিন্ন ন্যায়-দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

* আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতেশ্বরঃ ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্মলিঙ্গৈঃ নিরুপাখ্যম্ ঈশ্বরম্ প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুম্। ন্যায় ৪।২১ সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য। অতএব দেখা যায়, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয় করা বাৎস্যায়নেরও অনুমত নহে।

অতএব দেখা গেল যে, ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। ন্যায়-দর্শনকার দুঃখ নাশ বা অপবর্গ লাভের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ন্যায়-দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, ন্যায়-দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভূত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গ লাভ করিবে।

তন্ত্রও কতকটা এই ন্যায়দর্শনের মতাবলম্বন করিয়াছেন, বলিয়া বোধ হয়। তবে পার্থক্য এই যে, ন্যায়-দর্শনকার পৃথক্ পৃথক্ যে ষোড়শতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তান্ত্রিক সেই সকল তত্ত্বশক্তির মূলা শক্তি মহাশক্তি কালীকে আরাধনা বা আয়ত্ত করিলে সকল দুঃখ দূর হইবে, বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সাগরে আসিলে আর নদীতে নদীতে ভ্রমণ করিতে হইবে না। নতুবা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার মতও ঐ প্রকার। তান্ত্রিকের ঈশ্বর মহাশক্তির পদতলে,—

শবরূপ মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাং।

শবরূপে মহাদেব বা ঈশ্বর মহাকালীর পদতলে—আর কালী তাঁহার বক্ষের উপর আসীনা। ইহাতে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর আছেন—তিনি মহাশক্তির নিম্নে আছেন, না থাকিলেও চলিত—তিনি আর ততটা কিই বা করিতেছেন? করিতেছেন,—মহাকালী। অতএব, মহাকালীর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে আরাধনায় তুষ্ট করিতে পারিলেই জীব ভব-দুঃখ নাশে সমর্থ হয়।

শিষ্য। তবে কি ঈশ্বর উপাসনায় প্রয়োজন নাই?

গুরু। এ প্রশ্ন আবার কেন? পুনঃ পুনঃ তোমাকে এ সকল

কথা বলিয়া আসিয়াছি। কথা এই যে, যেমন অধিকারী—তেমনি অবলম্বন। যাহার প্রকৃত জয় হয় নাই, সে পরম পুরুষাভিমুখী হইবে কি প্রকারে? এবং আর এক কথা আছে।

শিষ্য। সে কথা কি?

গুরু। সে কথাও তোমাকে ইহার পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি।

শিষ্য। আর একবার স্মরণ করাইয়া দিন।

গুরু। যে বিভূতি লাভের অভিলাষী, তাহাকে প্রকৃতির শরণাপন্ন হইতে হইবে বৈ কি। অতএব, উপাসনা বা আরাধনার উহাই প্রকার ভেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

রাধা-কৃষ্ণ।

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি শুনিতে চাহ?

শিষ্য। কি শুনিতে চাহি, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন আছে।

গুরু। রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা, অতীব কঠিন ব্যাপার! বুঝানও বড় দুষ্কর।

শিষ্য। কেন?

গুরু। রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বটা বুঝান ও বুঝা অতিশয় কঠিন। ভাব কৃষ্ণ, প্রাণ রাধা;—একথা বলিলে তুমি কিছু বুঝিতে পার কি?

শিষ্য। কিছু না।

গুরু। তবে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি বুঝিবে বল ?

শিষ্য। কেন ?

গুরু। ভাব কৃষ্ণ, প্রাণ রাধা।

শিষ্য। ভাব কাহাকে বলে, প্রাণ কাহাকে বলে,—তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। অসম্ভব—বর্ত্তমান আয়োজনে তাহা পারা যাইবে না। সে অতিশয় কঠিন ব্যাপার। জগতে যাহা যত কঠিন আছে, ঐ দুইটি তত্ত্বের মত মধুর এবং অতিশয় কঠিন আর কিছুই নাই। আর ঐ ব্যাপার "দেবতা ও আরাধনা" বুঝাইবার ব্যাপারের মধ্যেও আনিবে না। অতএব, উহা তোমাকে স্বতন্ত্রস্থলে, স্বতন্ত্র সময়ে বুঝাইব।

শিষ্য। মোটামুটি ঐ সম্বন্ধে একটা জ্ঞান লাভ করা শ্রেয়ঃজ্ঞান করিতেছিলাম ; কেন না, রাধা-কৃষ্ণেরও আরাধনা বা পূজা আছে।

গুরু। মোটের উপর জানিয়া রাখ, উহারাও দেবতা।

শিষ্য। তাহাতে এক অন্তরায় আছে।

গুরু। কি ?

শিষ্য। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত প্রতিভাশালী লেখক বুঝাইয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, রাধা প্রক্ষিপ্তা।

গুরু। তা হইতে পারে। তিনি হয়ত শ্রীকৃষ্ণের যে ভাগ দেখিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে ভাগে রাধার প্রয়োজন হয় নাই। তাই তিনি রাধার তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই।

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। এখন বুঝিয়াও কাজ নাই।

শিষ্য। কেন ?

গুরু। তাহা বুঝা অনেক সময়ের প্রয়োজন। আগে "দেবতা

ও আরাধনা" বুঝিয়া লও,—তার পরে ঐ বিষয় বুঝাইব। এখন মোটের উপরে জান, রাধা-কৃষ্ণ জীবের অবশ্য উপাস্য দেবতা।

শিষ্য। আপনি যখন পুনঃ পুনঃ ঐ সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে এখন নিবৃত্তি করিতেছেন, তখন নিরস্ত হইলাম,—কিন্তু বড়ই সন্দেহ থাকিয়া গেল।

গুরু। রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সন্দেহ জীব মাত্রেরই থাকে।

শিষ্য। সে কি কথা? তবে কি নিঃসন্দেহ দেবতা বলিয়া কেহই রাধা-কৃষ্ণকে পূজা করে না?

গুরু। হাঁ, জীব যতদিন সাধারণ থাকে, ততদিন রাধা-কৃষ্ণকে ভালরূপে বুঝিতে পারে না, যখন অনন্য-সাধারণ হয়, তখন বুঝিতে পারে। তবে কৃষ্ণের অপর পীঠ কেহ কেহ বুঝে।

শিষ্য। যাক্,—কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাই।

গুরু। যাঁহাকে বুঝিলে না, তাঁহার লীলা বুঝিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণ দেবতা, মোটের উপর এখন ইহাই বুঝিয়া লইলাম,—কিন্তু মানুষের যাহা করিতে নাই, দেবতার যাহা করিতে নাই, তাহা তাহাদের করণীয় হইয়াছে কেন?

গুরু। সে কি?

শিষ্য। বৃন্দাবন লীলা।

গুরু। বৃন্দাবন লীলাই কৃষ্ণ অবতারের সার-তত্ত্ব।

শিষ্য। আর রাধা?

গুরু। রাধা সেই লীলার মহাপ্রাণ।

শিষ্য। না বুঝাইয়া দিলে জানিব কি প্রকারে?

গুরু। দেবতা-তত্ত্ব ও আরাধনা-তত্ত্ব আগে বুঝিয়া লও, তারপর উহা বুঝাইব।

শিষ্য। রাসের কথাটা শুনিয়াছি।

গুরু। অধিকার ব্যতিরেকে বুঝাইলেও কেহ বুঝিতে পারে না। আমি অবগত আছি, অনেকে রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বকে অনেকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তুমিও তাহা বোধ হয়, পাঠ করিয়াছ, কিন্তু সমুদয় বাহিরের কথা, এস্থলে তোমাকে ঐরূপ একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি,—আত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ যোগদ্বারা ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া, আত্মার সহিত পরমাত্মার একেবারে সম্মিলন ঘটিয়া আত্মার মুক্তি-সাধন হয়, সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে কেবল স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজন্য যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দু ঋষি রাধা-কৃষ্ণ লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি) বলিয়াছেন, রাধিকা প্রকৃতির পরমতত্ত্ব, কৃষ্ণ পুরুষের রূপ; তাঁহাদের আসক্তিই কৃষ্ণরাধার প্রেম। আত্মা যখন সংসারে কুটিলতা ও মায়া হইতে পরিব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন আনন্দধাম বৃন্দাবনে। যত দিন না জীবের সংসার-বীজ সমুদয় নষ্ট হয়, তত দিন তাহার মুক্তি নাই। এই সংসার-বীজ ও সাংসারিকতা নির্ব্বাণ করিবার জন্য কৃষ্ণ-বিরহ। প্রকৃতি পুরুষের ঘনিষ্ঠতাই জগৎ-সংসার। জগতেই পুরুষ-প্রকৃতি ঘোর আসক্ত; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত বৎসর বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শতবৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তি লাভ। শত বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষপদ। যোগের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব এক একটি করিয়া হিন্দু, অবয়বী কল্পনায় মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। যোগে জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সহিত যত ভাবে রমণ করেন, তাহার অনুভব ও মিলনের যত প্রকার স্তব আছে, তৎ সমুদয় কৃষ্ণ লীলায়

প্রকটিত। কৃষ্ণ যখন মথুরায়,—তখন তিনি প্রকৃতিতে অনাসক্ত হইয়া—বিষ্ণু-শক্তিতে পৃথিবী উদ্ধার সাধন করিতেছেন,—মহাযোগী জগতের হিতব্রতে ব্রতী। দ্বারকা-লীলাও সেই ব্রত। রুক্মিণীর উদ্বাহে ভক্তের উদ্ধার সাধন। যোগী ভিন্ন কে এ ভাব বুঝিবে? এ ভাব পিতা-পুত্রের, বা প্রভু ভৃত্যের, বা রাজা-প্রজার দূর সম্পর্ক নহে। প্রজাপালনরূপ গো পালনে (গো অর্থে প্রজা) কৃষ্ণ, সংসার-ধামরূপ গোষ্ঠে ক্রীড়া করেন। আনন্দধাম নন্দালয়ে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মে যেরূপ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, এ সেরূপ সম্বন্ধ নহে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ এত প্রগাঢ় নহে, যত সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুরাগ-বাৎসল্য বোধ হয়, ভক্তি অপেক্ষা প্রগাঢ়তর। হিন্দু ঈশ্বরানুরাগ, বাৎসল্য অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক। যশোদা ও নন্দের বাৎসল্য একদা হিন্দুর দেবানুরাগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেইরূপ অনুরাগে হিন্দুরা দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন। হিন্দুরা দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার (ভক্তি) পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বিতরণ করেন। এ ভাবকে শ্রদ্ধা বলিলে যেন কিছু দূর দূর বুঝায়। তবে বল বাৎসল্য; শুধু বাৎসল্য নহে,—যশোদা ও নন্দের স্নেহানুরাগ—যে স্নেহ শত রজ্জুতে কৃষ্ণকে বাঁধিতে চাহে। কিন্তু সে স্নেহ অপেক্ষা বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে, যদি আর কিছু উৎকৃষ্ট জিনিষ থাকে, সে দ্রব্য রাধিকার কৃষ্ণানুরাগ। হিন্দুর দেবানুরাগ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া বাৎসল্য ভাব অপেক্ষাও প্রগাঢ়তর হইয়াছে, প্রগাঢ়তর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত হইয়াছে। কৃষ্ণ আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিয়াছেন। আসিয়া পতি-পত্নীর সম্বন্ধে মিলিত। কিন্তু ঠিক পতি-পত্নীর সম্বন্ধেও একটু যেন দূর-ভাব আছে। পত্নী, পতিকে খুব নিকটে

দেখেন বটে, অথচ যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভু ভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া পতি অনুরাগিণী হন, তাঁহার প্রেমে সে প্রভুতার দূরভাব নাই। রুক্মিণীর প্রেম সেইরূপ প্রেম, আর রাধার প্রেম সেই-রূপ প্রেম। সেই গোপনীয় প্রেমে রাধা, কৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন; তাঁহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্য লালায়িত হইতেন। মিলন হইলে আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। যেমন বিষয়ী অর্থের জন্য লালায়িত; যেমন যোগী ঈশ্বরের জন্য লালায়িত; সেইরূপ লালায়িত রাধিকা। ক্ষণিক মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক। রাধিকা এইরূপ অনুরাগে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এ যোগ, পতি পত্নীর যোগ অপেক্ষাও গাঢ়তর। এ প্রেম, স্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগ। এ অনুরাগ হিন্দু যোগীর ঈশ্বরানুরাগ। সেই অনুরাগের ক্রমস্ফূর্ত্তি যোগতন্ত্রে অনুভবনীয়। সেই ক্রমস্ফূর্ত্তির বাহ্য বিকাশই কৃষ্ণ-লীলা। হিন্দু এই জন্য রাধিকা ও কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত হন—নন্দবিদায় ও রাধার প্রেম দেখিয়া (?) অশ্রু বিসর্জ্জন করেন,—দেবদোল ও রাসে মাতিয়া যান।" *

এই যে কথা উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে শুনাইলাম, ইহা অত্যন্ত মোটা কথা। রাধা কৃষ্ণ-তত্ত্ব এমন স্থূলকথা যে, বুঝাও যাহা, না বুঝাও তাহাই। তবে দেবতাতত্ত্ব বুঝিবার সময় এইরূপ ভাবে বুঝিয়া রাখা নিতান্ত মন্দ নহে।

---

* বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত "দেব-সুন্দরী।"

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গতলীলা দর্শন।

গুরু। দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে এযাবৎ তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি তদ্দ্বারা বোধ হয়, অনেকটা এরূপ মতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছ যে, হিন্দুর দেবতা কেবল সাধারণ মনঃকল্পিত পুঁতুল নহে—উহা বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব। ঐ তত্ত্বালোচনা বা দেবতার আরাধনা হইতে মানুষ নিজ প্রাণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভক্তি-পথের পথিক হইতে পারে, এবং দেব-চরিত্রাদির আলোচনা বশতঃ মানুষ, দেবতা-দিগের গতলীলা আদি দর্শন করিতে সক্ষম হয়।

শিষ্য। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, "দেবতা ও আরাধনা" হিন্দুর খেলা নহে, বা ভ্রম বিজৃম্ভিত জল্পনা-কল্পনা নহে। কিন্তু এই মাত্র একটি কথা, যাহা আপনি বলিলেন, তাহা ভাল রূপে হৃদ্‌বোধ করিতে পারিলাম না।

গুরু। কি?

শিষ্য। আপনি বলিলেন, ঐ তত্ত্বালোচনা বা দেবতার আরাধনা হইতে মানুষ নিজ প্রাণে শক্তিসঞ্চয় করিয়া ভক্তিপথের পথিক হইতে পারে, এবং দেবচরিত্রাদির আলোচনা বশতঃ মানুষ, দেবতাদিগের গতলীলা আদি দর্শন করিতে পারে;—দেবতাদিগের গতলীলা আদি দর্শন করিতে পারে, এ কথার অর্থ কি? লীলা-কথা এখন শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ, অথবা গুরু-পুরোহিত বা সাধু মহান্ত অথবা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কণ্ঠে অবস্থিত,—এতদবস্থায় তাহা দর্শন করা যাইতে পারে, কি প্রকারে?

গুরু। তাহা দর্শন করা যায়।

শিষ্য। কি প্রকারে?

গুরু। যাহা একবার হইয়াছে, তাহা কখনও লুপ্ত হয় না;—তাহার সংস্কার বা দাগ্ জগৎ আপন বক্ষে যুগ-যুগান্তর ধারণ করিয়া রাখে। তবে যে কার্য্য যত শক্তিশালী, তাহার দাগ্ বা সংস্কার তত প্রস্ফুট অবস্থায় থাকিয়া যায়। আরাধনার বলে, সেই সংস্কারকে জাগাইয়া দিলে, আবার সেই সকল কার্য্য লোকের চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া থাকে।

শিষ্য। তথাপি কথাটা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চিত্তকে একমুখী করিতে পারিলে, হৃদয়ে যে কম্পন উৎপাদিত হয়, সেই কম্পন ভাবের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়,—ভাব প্রস্ফুট হইয়া তাহার ক্রিয়াকে মূর্ত্তিমতী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করে। সেই জন্যই দেবতার ধ্যান ও মানস পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

সেই জন্যই দেব-দেবীর লীলাকথা অমৃতবোধে হিন্দুগণ পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করিতে করিতে মানবের চিত্তে তাহার সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার ফল অনুযায়ী দেবমূর্ত্তির রূপ নিবদ্ধ হইয়া

যায়, তার পরে সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি তন্ময় ভাবে শ্রবণ করে। শ্রবণ করিতে করিতে শেষে, সে স্বপ্নে সেই সকল বিষয় দেখিতে থাকে। তার পরে, জাগ্রত অবস্থাতেও সে লীলা তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে।

এই জন্যই বোধ হয় পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসকদিগের মধ্যে আগে দলাদলি ছিল। যে শৈব, সে বিষ্ণু বা গাণপত্যের ইষ্টদেবতার লীলার কাহিনী শুনিত না, যে বৈষ্ণব, সে কালী দুর্গা শিব প্রভৃতির লীলা কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিত। আমার বোধ হয় একাগ্রতালাভ করাই এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল। বহু মানবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যেমন সর্ব্বত্রই ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা অনুভব করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহু দেবতার লীলাকাহিনী শুনিয়া বেড়াইলেও বোধ হয় তদ্রূপ ফল হইবার সম্ভব। কিন্তু ইহা অতি ক্ষুদ্র অধিকারীর কথা। যে ব্যক্তি, মানুষের রূপ দেখিয়া অজ্ঞান হইবে, আত্মহারা হইয়া এই পাপ-পথে পড়িবে, বাঞ্ছিতকে ভুলিয়া যাইবে, বলিয়া গৃহের অর্গল আবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, সে যে অতি দুর্ব্বলচিত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, হৃদয় যদি এমন দুর্ব্বল হয়, তবে কিছুদিনের জন্য সে পথ অবলম্বন করা নিতান্ত অযুক্তি নাও হইতে পারে।

কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, সূর্য্যলোক, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মধাম যেখানকার যে লীলাই, যেখানকার যে কথাই বল, তৎপ্রতি মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহা দর্শন করা যায়। তুমি যদি একদলা কাদার উপরে মনঃসংযোগ করিতে শিক্ষা কর, তবে শীঘ্রই ঐ লীলা দর্শন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। কি প্রকারে পারিব, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। প্রথমে একদলা কাদা সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিবে। প্রথমেই কিছু আর অধিক সময় তাহা করিতে পারিবে না। দুমিনিট, চারিমিনিট করিয়া আরম্ভ করিয়া ক্রমে সময়ের দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে। কিন্তু ঐ কাদাদলা তোমার চিন্তানুযায়ী দর্শনীয় স্থান ভাবিবে। ক্রমে দেখিবে, তোমার চিত্তের একাগ্রতার দীর্ঘ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের সর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত ও মহিমান্বিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যুগলরূপ দর্শন।

শিষ্য। কোন কোন সাধু মহান্তের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা নাকি স্বকীয় ইষ্ট-দেবতাকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন; ইহা কি সত্য?

গুরু। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

শিষ্য। দেবতা যখন সূক্ষ্ম-অদৃষ্ট শক্তি, তখন তাহা দেখিবে কি প্রকারে?

গুরু। মানুষ কি? মানুষও ত সূক্ষ্ম আত্মা;—যখন স্থূলে অধ্যাসিত হয়, তখনই তাহাকে দেখা যায়। আগুন কি,—তাহাও ত সূক্ষ্ম শক্তি, যখন স্থূলে অধ্যাসিত হয়, তখনই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ দেবশক্তিও যখন আমাদের ভৌতিকতত্ত্বে সমাগত হন, তখনই সাধক তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়।

শিষ্য। কেমন করিয়া দেখিতে পায়?

গুরু। সাধনার বলে।

শিষ্য। সে সাধনা কি প্রকার?

গুরু। সে সাধনার কথা বলিবার আগে, তোমাকে আর একটি কথা বলিতে চাই।

শিষ্য। কি?

গুরু। অন্যান্য দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়োজন, তাহা হইতে অনেক কম চেষ্টাতেই রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপের দর্শনলাভ ঘটিয়া থাকে। আবার কালীসাধনায় আরও অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য-লাভ ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। তাহার কারণ?

গুরু। রাধা-কৃষ্ণ আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত, আবার কালী-দেবীও সর্ব্বাঙ্গে জড়িত।

শিষ্য। রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ কি প্রকারে দর্শন করিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধা;—ইহারা সর্ব্বদাই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অবস্থিত। সাধন-প্রণালী অন্য কিছুই নহে, সেই চিত্তের একাগ্রতা। চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে, ভাব ও প্রাণ যুগলরূপে হৃদয়ে উদিত হয়েন।

শিষ্য। কি প্রকারে কি করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। শাস্ত্র বলেন,—

যথাঽর্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিঃ করোতি ভূলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ॥

সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সূর্য্যকান্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্য শিক্ষা করিয়াছেন।

প্রাগুক্তশিক্ষাদ্বারা সমস্ত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে।

শিষ্য। আমিত উহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। ঘুড়ীর লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ তাড়িত-বিজ্ঞানের (Telegraph এর) আবিষ্কার করেন, রন্ধনস্থালীর মুখের শরাব বাষ্পবলে উৎপতিত হইতে দেখিয়া, ষ্টীমওয়ার্কের সৃষ্টি করেন, পক্বফলের পতনদর্শনে পার্থিব আকর্ষণ (Gravitation) অবগত হইয়াছেন,—কিন্তু আতস্ পাথরের দ্বারা সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী চিত্তবৃত্তিকে একেকেন্দ্রক করিয়া, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মবিজ্ঞান, ব্যবহিত-বিজ্ঞান ও অতীতানুগত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া আর্য্যগণ আরও প্রকৃষ্ট-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ, যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্য্যালোক-সমূহের পুঞ্জন স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলয়াগ্নির ন্যায় দাহিকা শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আতস পাথরের নীচে তুলা অথবা শুষ্কতৃণ রাখিলে ঐ তুলা বা তৃণে আগুন ধরিয়া যায়,—সময় সময় আগুন ধরিতে বিলম্ব হয়, তাহা বোধ হয় তুমি জান। কেন হয়, তাহাও বোধ হয়, জান। উহার ফোকাস্ (Focus) ঠিক হয় না বলিয়া আগুন ধরে না। ঐরূপ হইলে পাথর খানিকে অল্পে অল্পে হয় উপরে আর না হয় নিম্নের দিকে লইবে, তার পরে যেস্থলে আসিলে ঐ পাথরের ফোকাস্ ঠিক হইবে, তখনই নিম্নের তুলা বা তৃণ ধরিয়া যাইবে। পাথরের কোন্ শক্তিতে বা সূর্য্যকিরণের

কোন্ ক্ষমতায় সহসা আগুন ধরে না, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান। ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সহস্রমুখ বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণ আতস্ পাথরের শক্তিতে এককেন্দ্রক হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটি অগ্নিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং কেন্দ্র-স্থানস্থিত দাহ্য-বস্তুমাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি ইন্দ্রিয়-পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা, একত্রিত করা যায়, ক্রম-সঙ্কোচ প্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়; তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত চিত্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্তু—সমস্তই তাহার বিষয় বা প্রকাশ্য হইবে।

রাধা-কৃষ্ণের যুগল-রূপ মানুষের চিত্তবৃত্তির বড় নিকটে অবস্থিত। কেন না, ভাব আর প্রাণ লইয়া মানুষের যথাসর্ব্বস্ব। প্রাণের কাঙ্গাল মানুষ সর্ব্বদা,—তাই বুঝি রসিকের সাধনার সৃষ্টি। যাহা হউক, ভাব আর প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলেই রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ হৃদয়ে উদিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ।

শিষ্য। ধ্যানানুযায়ী মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের কথা বলিলেন, এবং তাহা বুঝিয়াও কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু আর একটি সন্দেহ মনে জাগরূক থাকিল।

গুরু। সে সন্দেহ কি?

শিষ্য। শালগ্রামশিলায় নারায়ণের পূজা করা হয়। এবং শিবলিঙ্গে শিব পূজা করা হয়, কিন্তু নারায়ণ ও শিবের যে ধ্যান, ঐ দুইটি

জিনিষে সে মূর্ত্তি নহে, তবে তাহা সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হয় কেন?

গুরু। স্বর্ণ-রৌপ্য রেখাদিসমন্বিত শালগ্রাম-শিলা, বাণলিঙ্গ বা অন্যপ্রকারের শিবলিঙ্গ, অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, স্ফটিক ও স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত ত্রিকোণ যন্ত্র, চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া যে দেবতার আরাধনা করা হয়, তাহার কারণ তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহা মনস্থৈর্য্যের হেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকন্তু উহাতে ত্রাটকযোগ অভ্যাস হয়। ঐ সকলের সহিত ঐ সমুদয় দেবতার শক্তির একটা সম্বন্ধ-সামর্থ্য আছে। উহা অতি পরম পবিত্র ক্রিয়া। নারায়ণশিলায় যে শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে, নিত্য নিত্য একদৃষ্টে উহার দিকে চাহিতে চাহিতে একাগ্রতা লাভ হয়। পরন্তু, ত্রাটকযোগ অভ্যাসের সুবিধা ও সুযোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কথাটা আরও একটু পরিষ্কারভাবে বলিলে বুঝিবার সুবিধা হইত।

গুরু। আমি তোমাকে এযাবৎকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সাধনকরাই জীবের উদ্দেশ্য। স্বর্ণ-রৌপ্য-রেখাদিসমন্বিত শালগ্রাম শিলা, বাণলিঙ্গ শিব, অষ্টধাতু-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত ত্রিকোণ যন্ত্র, চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি চিত্তের লক্ষ্য রাখিয়া দেবতার আরাধনা করিলে, সহজে এবং সত্বরেই চিত্তশক্তির একাগ্রতা লাভ হইয়া থাকে। আরও, যোগশাস্ত্রে যে "ত্রাটক" নামক যোগের উল্লেখ আছে, দৃক্‌শক্তি বাড়াইবার জন্য, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু দেখিবার জন্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি অমানবপ্রাণ সন্দ-র্শনের জন্য, চাক্ষুষ জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জন্য, নিদ্রাতন্দ্রাদি

অশেষবিধ চাক্ষুষ দোষ বিনাশের জন্য, ঐ বিদ্যার শিক্ষা ও সাধনা করিয়া থাকেন। শালগ্রামশিলা প্রভৃতি সজ্যোতিঃ বস্তু একটি সম্মুখে রাখিবে। অনন্তর আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তন্মনা হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে। যতক্ষণ চক্ষে জল না আইসে,—ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না নড়ে, পলক না পড়ে, মন বিচলিত না হয়,—এরূপ নিয়মে, চক্ষে জল আসা পর্য্যন্ত সেই দৃশ্যের প্রতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। চক্ষে জল আসিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ করিলেই দৃক্-শক্তি বাড়িয়া যাইবে। চক্ষুর সকল দোষ নষ্ট হইবে। নিদ্রা তন্দ্রাদি স্বাধীন হইবে এবং চক্ষুর রশ্মি-নির্গম-প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে।

তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, শালগ্রামশিলাদিতে কি জন্য নারায়ণের আরাধনা করা হইয়া থাকে। হিন্দুগণ যে সকল নিয়ম, প্রথা ও ব্যাপার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্ত ব্যাপার ও কার্য্যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিহিত আছে। যাহার আবরণে মানুষ বহির্ অন্তর্ ও আত্ম-প্রকৃতির জয় করিতে সক্ষম হয়।

আরও এস্থলে আমাদিগের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া জ্ঞানের বিমল আলোক ধরিয়া হিন্দু ঋষিগণ যে সকল নিয়ম-প্রণালী ও সাধনবিধির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কুত্রাপি ভুল ভ্রান্তি নাই। তবে আমরা অত্যন্ত বদ্ধজীব, সে সকল বিধি-ব্যবস্থার বিষয় সমুদয় ভাল করিয়া যদি নাই বুঝিতে পারি, তবে সে দোষ আমাদেরই বুদ্ধির, তাঁহাদের নহে। ফলকথা, তাঁহাদের কার্য্যের কোন ভুল নাই। বিশ্বাস সহকারে, অধিকারি পদে কার্য্য করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

দশম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পশু পূজা।

শিষ্য। বিধর্ম্মিগণ আরও এক বিষয়ের জন্য হিন্দুগণকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

গুরু। সে বিষয় কি?

শিষ্য। হিন্দুগণ পশুপূজা করিয়া থাকে। গরু হিন্দুর নিত্যপূজ্য, নবান্নে কাকপূজা, দেবতার বাহনে প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর পূজা হয়। তৎপরে অন্যান্য পশুকেও হিন্দু পূজা করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

গুরু। তাহারও উদ্দেশ্য অতি মহান্। পাশ্চাত্যগণ বহু যত্নে যে সকল গুরু-ক্রিয়া শিক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন, হিন্দুঋষিগণ ঐ নির্ব্বোধের হাস্যকরকার্য্যে তাহাই শিক্ষালাভ করিতেন।

শিষ্য। হিন্দুগণ ঐ সকল পশুপক্ষীর ধ্যান করিয়া, যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া ফললাভ করিতেন?

গুরু। যে ফললাভ করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাৎ পশু পূজাদ্বারা তাঁহারা পশুপক্ষীর ভাষা, পশু-পক্ষীর ভাব অবগত হইতে পারিতেন।

শিষ্য। কেমন করিয়া পারিতেন?

গুরু। ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা চিত্ত-সংযম হয়, সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং পূজায় যে ধ্যান, ধারণা ও সমাধিই সর্ব্বস্ব, তাহা তোমাকে নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য এক্ষণে পূজা দ্বারাতে কি প্রকারে ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে তাহা বলিতেছি।

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপজন্য একরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয়ভূতের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। হিন্দুগণ পশুপূজা করিয়া এই শক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। কথাটা আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলুন।

গুরু। শব্দ বলিলে বাহ্য-বিষয়—যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। অর্থ বলিলে, যে শরীরাভ্যন্তরীণ বৃত্তি-প্রবাহ ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বিষয় লইয়া গিয়া মস্তিষ্কে পঁহুছাইয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে। আর জ্ঞান বলিলে মনের যে প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ানুভূতি হয়, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দ্দেশে এক কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনে একটি বোধ-প্রবাহ গেল, তৎপরে মন প্রতিঘাত করিল, আমি শব্দটিকে জানিতে পারিলাম। আমি ঐ যে শব্দটিকে জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ—প্রথম কম্পন; দ্বিতীয় অনুভূতিপ্রবাহ; এবং তৃতীয় প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ এই তিনটি ব্যাপারের পৃথক্ করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারেন। যখন মানুষ এই কয়েকটিকে পৃথক্ করিবার শক্তি-লাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর সংযম-প্রয়োগ করে। অমনিই যে অর্থপ্রকাশের জন্য ঐ শব্দ উচ্চারিত,

তাহা মনুষ্যকৃতই হউক, বা কোন-পশু-পক্ষি-কৃতই হউক, তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে।

হিন্দুগণ এই মহদুদ্দেশ্যেই পশু-পূজা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অগ্নি আরাধনা।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, অগ্নির আরাধনায় অগ্নি বশীভূত হয়। মানুষ অগ্নি-যজ্ঞ করিয়া অগ্নিকে বশীভূত করিয়া থাকে,—এবং প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করে,—ইহা কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আমাকে বলুন? বিজ্ঞানে ইহার কোন তত্ত্বই বুঝিতে পারা যায় না।

গুরু। অগ্নির আরাধনায় অগ্নি বশীভূত হয়, এবং সেই প্রজ্বলিত অগ্নির উপর দিয়া, মানুষ গতায়াত করিতে পারে, এ কাজ তোমরা যে বিশ্বাস কর, ইহাই যথেষ্ট।

শিষ্য। বিশ্বাস না করিয়া আর কি করিতেছি,—জাপানে ঐরূপ অগ্নি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছি। তার পরে, গত কয়েক বৎসর কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনঠাকুর মহাশয়ের কাশীস্থ বাড়ীতে তাঁহার ও বহু ভদ্রলোক ও কয়েকজন ইংরেজের সম্মুখে অগ্নি আরাধনার এই অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শন করা হয়। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া অনেকেই গমনাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার গাত্রে একটু আঁচপর্য্যন্ত লাগে নাই। * এরূপ গল্প অনেক

---

* সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কবিভূষণ বি এ, একদিন নিজে মহারাজের কাশীস্থ বাটিকাতে ঐ ঘটনা দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাদের সাক্ষাতে গল্প করিয়াছিলেন—লেখক।

স্থলে শ্রুত হওয়া গিয়াছে। তখন আর অবিশ্বাস করা যায় কি প্রকারে? কিন্তু কোন্ শক্তিবলে, কি প্রকার সাধনার দ্বারা যে ইহা সংঘটন হয়, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে বলিয়া অনুগৃহীত করুন।

গুরু। অগ্নির আরাধনা-পদ্ধতি যজ্ঞাদিকার্য্য লিখিতপুস্তকাদিতে প্রকাশ আছে। সাধারণভাবে হোমাদি করিলেও অগ্নি বশীভূত হইয়া থাকে। তবে কার্য্য যেরূপভাবে হইবে, বশীভূতও সেই প্রকারের হইবে। মন্ত্রাদির প্রয়োগ ও আত্ম-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াদ্বারাতেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। আমি আবার সেই কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে চাহিতেছি না,—এখনও সে উদ্দেশ্যও নহে। তবে কোন্ কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ কোন্ কার্য্যের কোন্ শক্তি বলে যে, উহা ঘটিতে পারে, তাহাই শুনিতে বাসনা করিতেছি।

গুরু। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, বাহিরের প্রকৃতিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের শরীরাভ্যন্তরেও তাহা আছে। আরাধনা, সেই সূক্ষ্মশক্তির বিকাশমাত্র। আরাধনা দ্বারা সূক্ষ্মশক্তিকে স্ববশে আনিয়া স্থূলতরকার্য্য করিয়া লওয়া। শাস্ত্র বলেন এবং পরীক্ষাদ্বারাও অবগত হওয়া গিয়াছে,—উদান-নামক স্নায়ু প্রবাহ জয়ের দ্বারা যোগী জলে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন, এবং অগ্নির মধ্যে দণ্ডায়মান ও অগ্নির শক্তি-বিলোপে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ যে স্নানবীয় শক্তি-প্রবাহ ফুস্‌ফুস্ ও শরীরের উপরিস্থিত সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, তখন তাহাকে জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না। কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারেন ও অন্যান্য

নানাপ্রকার শক্তিলাভের সহিত তিনি অগ্নির দাহিকাশক্তি অশক্তিতে সংযোজিত করিয়া রাখিতে পারেন। ইহা যে প্রকারে সাধিত হয়, তাহা যোগী যোগ-সাধনা দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারেন। আর সাধক অগ্নির পূজা, অগ্নির বীজ-জপাদিদ্বারাও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জলের আরাধনা।

শিষ্য। জলের আরাধনা দ্বারা জল হয়, ইহাও কি সম্ভবপর?

গুরু। হাঁ, তাহা হয়।

শিষ্য। কি প্রকারে হয়? আকাশে মেঘ হইবে, তাহাও কি ইচ্ছাশক্তির বলে হয়, এই কথা বলিবেন?

গুরু। হাঁ, তাহা বলিব বৈ কি। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সহিত ধূম-জ্যোতিঃ প্রভৃতি পরিচালন করিলে আরও শীঘ্র সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য হোমাদিকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বীজমন্ত্রও সেই ইচ্ছাশক্তির সহায় হইয়া থাকে। তুমি জল হওয়ানর জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অদ্ভুত ঘটনার কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার?

শিষ্য। সে পরীক্ষা কি কি?

গুরু। যখন জলাভাবে কৃষককুলের সর্ব্বনাশ সাধনের উপক্রম হয়, দেশ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে বসে, তখন কৃষকেরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে বৃষ্টি করিয়া থাকে।

শিষ্য। কৃষকেরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রেরণে মেঘের সৃষ্টি করিয়া বৃষ্টি করায়? নিরক্ষর কৃষকেরা ইচ্ছাশক্তি প্রেরণের কি জানে?

গুরু। তোমরা পণ্ডিত, তোমরা বৈজ্ঞানিক,—তোমরা ইচ্ছাশক্তির তথ্য অবগত আছ, তাহারা ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কোন পদার্থ আছে, তাহা

অবগত নহে,—কিন্তু ইচ্ছাশক্তি তোমাদেরও আছে, তাহাদেরও আছে। তোমরা না হয়, ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা বলিয়াই পরিচালনা কর। আর তাহারা তাহা না জানিয়া অন্যভাবে পরিচালনা করিয়া থাকে।

শিষ্য। তাহারা কি করে?

গুরু। জল না হইলে, অর্থাৎ অনাবৃষ্টির বৎসরে তাহারা "শতেক হাল" যোড়ে। তাহার ব্যবস্থা এইরূপ যে, একশত একখানি লাঙ্গল একখানি ভূমিতে গিয়া যুড়িয়া সেই ভূমি কর্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই একশত একখানি লাঙ্গলের সর্ব্বপ্রথমের লাঙ্গলখানি ধরিবে, সে এক মায়ের এক সন্তান হওয়া চাই,—তারপরে সকলে লাঙ্গল চষিতে থাকে। আমি তিন চারি স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, প্রচণ্ড রৌদ্রে লাঙ্গল যুড়িয়া ভিজিতে ভিজিতে কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া গৃহে ফিরিয়াছে।

শিষ্য। লাঙ্গল চষিয়া কিরূপে ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা করিয়া থাকে?

গুরু। হাতে লাঙ্গল চষিতে থাকে, কিন্তু সেই একশত এক জন লোকের প্রাণের ইচ্ছা জল হউক,—সে ইচ্ছা একমুখী ও ঐকান্তিকী।

শিষ্য। আর কি বলিতেছিলেন?

গুরু। ঐরূপ অনাবৃষ্টি হইলে লক্ষ দুর্গানাম লিখিয়া মেঘ ও বৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি। আমার বয়স তখন দশ কি এগার বৎসর,—একবার সকলের সঙ্গে মিশিয়া দুর্গানাম লিখিয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিয়া ছিলাম।

শিষ্য। তাহার প্রক্রিয়া কি?

গুরু। বালক বৃদ্ধ যুবক নির্ব্বিশেষে এবং যে কোন জাতিই হউক, একত্রে কোন নদীর ধারে, বা তেপান্তর মাঠে বসিয়া, বটপত্রে দুর্গানাম লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য, তাহারও উদ্দেশ্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ।

একাদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরশ্চরণ।

শিষ্য। পুরশ্চরণ করিলে কি হয়?

গুরু। পুরশ্চরণ না করিলে মন্ত্র চৈতন্য হয় না, মন্ত্র চৈতন্য না হইলে সে মন্ত্র প্রয়োগে কোন ফললাভ করা যাইতে পারে না। অতএব যে কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। চলিত ভাষায় পুরশ্চরণক্রিয়াকে "মন্ত্র জাগান" বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। পুরশ্চরণ করিলে কোন্ শক্তি মন্ত্রে অধ্যাসিত হয়?

গুরু। অস্বাভাবিক প্রশ্ন।

শিষ্য। কেন?

গুরু। কোন্ শক্তি মন্ত্রে অধ্যাসিত হয়, এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?

শিষ্য। উদ্দেশ্য এই যে, কোন্ শক্তি আবিষ্ট হইয়া মন্ত্রকে বিশিষ্টরূপে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে?

গুরু। যে মন্ত্রের যে শক্তি পুরশ্চরণ করিলে, সেই মন্ত্রের সেই শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। আমার প্রশ্নটা ঠিক হয় নাই। কোন্ শক্তির বলে মন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়, ইহাই প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

গুরু। বেহাগ রাগিণী গাহিতে জান ?

শিষ্য। না।

গুরু। খাম্বাজ ?

শিষ্য। জানি।

গুরু। কি প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলে ?

শিষ্য। গলা সাধিয়া।

গুরু। গলাসাধা কাহাকে বলে ?

শিষ্য। ঐ স্বর বাহির করিবার অভ্যাস করা।

গুরু। অভ্যাস না করিলে কি হইত ?

শিষ্য। পারিতাম না।

গুরু। কি প্রকারে অভ্যাস করিয়াছ ?

শিষ্য। স্বর-কম্পন যেরূপভাবে বাহির করিলে খাম্বাজ রাগিণী হয়, সেইরূপ করিয়া।

গুরু। পুরশ্চরণও তাহাই। মন্ত্র যে ভাবে উচ্চারণ করিলে স্বর-কম্পন হয়, তাহাই। আরও আছে।

শিষ্য। কি ?

গুরু। রাগিণী অভ্যাস করিতে যেমন স্থান-বিশেষ দিয়া ঐ স্বর বাহির করিতে হয়, অর্থাৎ গলাসাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চারণ করিতেও তদ্রূপ নাড়ী সাধিতে হয়। পুরশ্চরণ, সেই নাড়ী সাধা।

শিষ্য। পুরশ্চরণ ত কেবল মন্ত্রজপ। নাড়ী সাধার তাহাতে কি আছে ?

গুরু। গানের জন্য গলাসাধাও ত কেবল চীৎকার করা। গলায়

যাহা করিতে হয়, তাহা সাধকই অবগত হয়, পুরশ্চরণেও যাহা নাড়ীতে করিতে হয়, তাহা সাধক জানেন।

শিষ্য। নাড়ীতে কিছু হয় নাকি?

গুরু। হয় না!

শিষ্য। আমি একবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলাম, কৈ নাড়ীতে ত কিছু করি নাই।

গুরু। তবে পুরশ্চরণও হয় নাই।

শিষ্য। আমার গুরু উপস্থিত থাকিয়া পুরশ্চরণ করাইয়াছিলেন।

গুরু। গুরু উপস্থিত থাকিলেই যে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে, একথা কে বলিল? তিনি যদি তাহা না জানেন?

শিষ্য। শাস্ত্রে কি ঐরূপ কোন কথা আছে নাকি? আমি ত আমার গুরূপদেশে মন্ত্রই জপ করিয়াছিলাম।

গুরু। শাস্ত্রে নাই, তবে কি আমি রচাইয়া বলিতেছি। শাস্ত্রের কথা শোন,—

মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে।
মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ॥

গৌতমীয়ে।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র-চৈতন্য পরিজ্ঞানপূর্ব্বক জপ করিবে।

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিদ্ধ্যতি বরারোহে কল্পকোটি-শতৈরপি॥

কুলার্ণবে।

কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে,—"বরারোহে! জপকালে মন, পরম শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্রে সংযোগ না হইলে শতকোটিকল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।

চৈতন্য-রহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিশতৈরপি॥

তন্ত্রসারে।

চৈতন্য মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, অচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণ মাত্র। অচৈতন্য মন্ত্র লক্ষকোটিজপেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না।

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি॥
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে।
দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্যং তদুচ্যতে॥

তন্ত্রসারে।

জপকালে হৃদয়-গ্রন্থিভেদ, সর্ব্ব অবয়বে বর্দ্ধিষ্ণুতা, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ, এবং গদ্গদভাষণ প্রভৃতি ভক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায়, ইহাতে সংশয় নাই। মন্ত্র চৈতন্যসংযুক্ত করিয়া সেই মন্ত্র একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেই পূর্ব্বোক্তভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। মন্ত্র-চৈতন্য কাহাকে বলে?

গুরু। মন্ত্র ও মন্ত্র-চৈতন্য কি, তাহা তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছি, * বোধ হয় তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।

শিষ্য। হাঁ, তাহা স্মরণ আছে। তবে মন্ত্র-চৈতন্য কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাই বলুন।

গুরু। সে কথাও তখন পরিষ্কাররূপে বলিয়া দিয়াছি, বর্ত্তমানে সংক্ষেপতঃ পুনরায় বলিতেছি,—তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখ আছে,—

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।
সৌষুম্ন-ধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে॥

* মৎপ্রণীত "দীক্ষা ও সাধনা" নামক পুস্তকে মন্ত্রচৈতন্য নামক প্রবন্ধ দেখ।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোক্তানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দ-বৃংহিতে ॥
দর্শয়াত্যাত্ম-সদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্ব্বিনা।
গৌতমীয় তন্ত্রে।

পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, অর্থাৎ যাহা অচৈতন্য; তাহা কেবল বর্ণমাত্র। অতএব, ঐ সকল মন্ত্র সুষুম্নাধ্বনিতে উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে প্রভুত্ব প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ মন্ত্রের কার্য্যকরী ক্ষমতা আয়ত্ত হয়। মূলাধার-পদ্মের অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী এবং ব্রহ্মনাড়ীর অন্তর্গত যে সয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন, সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই স্বয়ম্ভু-লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সাধক জপকালে মন্ত্রাক্ষরসমুদয় এই কুণ্ডলিনী-শক্তিতে গ্রথিত ভাবনা করিয়া এই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে উত্থাপিত করতঃ সহস্রার-কমল কর্ণিকার মধ্যবর্ত্তী পরমানন্দময় পরম-শিবের সহিত ঐকাত্ম্য পাওয়াইবে। পূজাহোমাদি বিহনেও উক্ত প্রকার অনুষ্ঠানে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইহা করিবার প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি বলিয়া এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিলাম। *

শিষ্য। এইরূপে মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া যদি পুরশ্চরণের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া হয়, তবে ত আমরা যাহা করি, তাহা নিষ্ফল!

গুরু। যাহারা পুরশ্চরণ বা মন্ত্র সিদ্ধি করিতে গিয়া তাহার অনু-ষ্ঠান না করিয়া অন্যপ্রকার করে, তাহারা নিষ্ফলতা লাভ না করিবে কেন? অন্নপাক করিতে গিয়া, কেবল হাঁড়ীতে জল চড়াইয়া জ্বাল দিলে কি অন্নপ্রাপ্ত হওয়া যায়? চাউল দেওয়া চাই।

* 'দীক্ষা ও সাধনা' নামক পুস্তকে দীক্ষা গ্রহণ হইতে মন্ত্রসিদ্ধি পর্য্যন্ত সাধকের যাহা কিছু প্রয়োজন, লিখিত হইয়াছে,—পুস্তক খানি একবার পড়িলে ভাল হয়।

শিষ্য। তবে এখনকার অধিকাংশ যজমান বা শিষ্য, গুরু বা পুরোহিতের নিকটে পুরশ্চরণ পদ্ধতি জানিয়া লইয়া, যে পুরশ্চরণ করে, তাহারা কেবল অনর্থক অর্থব্যয় ও উপবাসাদি করিয়া থাকে মাত্র?

গুরু। যাহারা না জানিয়া কার্য্য করে বা করায়, তাহা নিষ্ফল হইবে বৈ কি। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল কারণেই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে। কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া যে কার্য্য সমাপন করিল, তাহাতে যদি কোন প্রকার ফললাভ না করিতে পারে, তবে সে কার্য্য করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে গুরু ও পুরোহিতগণই সমধিক দোষী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জপের বিশেষ নিয়ম।

শিষ্য। জপনিয়ম কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন?

গুরু। জপের কি নিয়ম বলিব?

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, ওঁ এই মন্ত্র, অন্যান্য মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সংস্থাপন না করিয়া জপ করিলে, মন্ত্র কদাচ সিদ্ধ হয় না। তাহা কি সত্য?

গুরু। হাঁ। সেতু ভিন্ন জপ নিষ্ফল হয়, অতএব সেতুনির্ণয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রেরই ওঁ এই বীজ সেতু। জপের পূর্ব্বে ওঙ্কাররূপী সেতু না থাকিলে সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে ঐ মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়, অতএব মন্ত্র-জপের পূর্ব্বে ও পরে সেতুমন্ত্র জপ আবশ্যক। যেমন

সেতুবিহীন জল ক্ষণকাল মধ্যে নিম্ন প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ সেতুবিহীন মন্ত্র সাধকের ফলদায়ক হয় না। চতুর্দ্দশ স্বর ঔ, ইহাতে নাদবিন্দু যোগ করিলে ঔঁ এই বীজ হয়। ইহাই শূদ্রের সেতু জানবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি।

শিষ্য। পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি কাহাকে বলে? এবং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি না করিলে কি হয়?

গুরু। পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি-ব্যতিরেকে পূজা নিষ্ফল হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চশুদ্ধিকে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি বলে। যাবৎ পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি না করা হয়, তাবৎ তাঁহার পূজায় অধিকার হয় না। তাহা অভিচারার্থ হইয়া থাকে। তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ও ষড়ঙ্গন্যাস করিলে আত্ম-শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। যে স্থানে পূজাদিকার্য্য করিবে, সেই স্থানকে মার্জ্জন ও অনুলেপন করিয়া দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল করিবে। চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সেই স্থানকে সুশোভিত করতঃ পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা চিত্রিত করিবে, ইহাকে স্থান-শুদ্ধি বলে। মাতৃকাবর্ণ-দ্বারা অনুলোমবিলোমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হইয়া থাকে। পূজার দ্রব্যসকল কুশাগ্রদ্বারা মূল ও ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। সাধক পীঠশক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলী-করণ-

মুদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মাল্যাদি, ধূপ ও দীপ প্রোক্ষণ করিবে, এইরূপ করিলে দেবতা শুদ্ধি হয়।

এই প্রকারে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি করিয়া দেবতার আরাধনা করিতে হয়, নতুবা আরাধনা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র শুদ্ধির উপায়।

শিষ্য। আপনি মন্ত্র-পুরশ্চরণের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আপনার কথিত উপায় অবলম্বন করিয়াও যদি কেহ মন্ত্র-শুদ্ধি করিতে না পারে, অর্থাৎ আপনার কথিত ভক্তিভাবের উদয় দর্শন করিতে না পায়, তবে সে কি করিবে? কেবল আপনার কথিত মতে পুরশ্চরণ করিয়াই কি ক্ষান্ত থাকিবে?

গুরু। পুরশ্চরণ করিলে সাধকের ঐ ভাবের উদয় নিশ্চয়ই হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে মন্ত্রসিদ্ধি হয় নাই।

শিষ্য। তখন কি করিবে?

গুরু। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—

সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

গৌতমীয় তন্ত্রে।

সম্যকরূপে পুরশ্চরণাদি সিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্র-সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ করিবে। অর্থাৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ নিয়মে পুরশ্চরণাদি করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।

শিষ্য। এমন দুর্ভাগ্য যদি কেহ থাকে, এবারও যদি মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপ ফলের অনুভব না করিতে পারে ?

গুরু। শাস্ত্রে আছে,—

পুনরনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো নজায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ॥

গৌতমীয়ে।

পুনরনুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে তৃতীয়বার পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিবে।

শিষ্য। এমন কি কেহ নাই, যাহার পর পর তিনবার পুরশ্চরণাদি করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না ?

গুরু। হাঁ, তাহা আছে—বৈ কি।

শিষ্য। তাহার উপায় কি ?

গুরু। শাস্ত্রে সে নির্দ্দেশও আছে বৈ কি।

শিষ্য। কি আছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। শাস্ত্রে বলেন,—

পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং শোষপোষণে।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ॥

গৌতমীয়ে।

পুরশ্চরণাদি কার্য্য যথাবিধি তিনবার অনুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে শঙ্করোক্ত সপ্ত উপায় অবলম্বন করিবে। ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, শোষণ, পোষণ ও দাহন,—ক্রমতঃ এই সপ্তবিধি উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ইহাই শেষ উপায়।

শিষ্য। ভ্রামণ কাহাকে বলে, এবং কি উপায়ে তাহা সম্পাদন করিতে হয়?

গুরু। বং এই বায়ুবীজদ্বারা মন্ত্রবর্ণ সকল গ্রন্থন করিবে। অর্থাৎ শিলারস নামক গন্ধ দ্রব্য, কর্পূর, কুঙ্কুম, উশীর (বেণার মূল) ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা মন্ত্রান্তর্গত বর্ণসকল পৃথক্ পৃথক্ করতঃ একটি বায়ুবীজ এবং একটি মন্ত্রাক্ষর, এইরূপে যন্ত্রেতে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ লিখিবে। পরে, ঐ লিখিত মন্ত্র দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পূজা, জপ ও হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহাকেই মন্ত্রের ভ্রামণ বলে।

শিষ্য। রোধন কাহাকে বলে?

গুরু। ভ্রামণের দ্বারাও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবেই রোধন করিবে। ঐঁ এই বীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ জপের নাম মন্ত্রের রোধন।

শিষ্য। যদি রোধনক্রিয়াদ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়?

গুরু। তাহা হইলে বশীকরণ করিবে।

শিষ্য। বশীকরণ কি প্রকারে করিতে হয়?

গুরু। আলতা, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, ধুস্তূরবীজ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে,—এইরূপ করিলেই মন্ত্রের বশীকরণ হইয়া থাকে। বশীকরণের দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে মন্ত্রের পীড়ন করিবে।

শিষ্য। পীড়নক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হয়?

গুরু। অধরোত্তরযোগে মন্ত্র জপ করিয়া অধরোত্তররূপিণী দেবতার পূজা করিবে। পরে আকন্দের দুগ্ধদ্বারা মন্ত্র লিখিয়া পাদদ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক সেই মন্ত্রদ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে,—এই কার্য্যকে মন্ত্রের

পীড়ন বলে। যদি এইরূপ পীড়ন করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের পোষণ করিবে।

শিষ্য। মন্ত্রের পোষণ কি করিয়া করিতে হয়?

গুরু। মূলমন্ত্রের আদি ও অন্তে ত্রিবিধ বালাবীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং গোদুগ্ধ ও মধুদ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে। ইহাকেই মন্ত্রের পোষণ ক্রিয়া বলে।

শিষ্য। ইহাতেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না ঘটে, তাহা হইলে বোধ হয়, শোষণ-ক্রিয়া করিতে হইবে। শোষণ-ক্রিয়া কিরূপ?

গুরু। বং এই বায়ুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এবং ঐ মন্ত্র যজ্ঞীয়ভস্মদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে।

শিষ্য। যদি উহাতেও মন্ত্র-সিদ্ধি না ঘটে?

গুরু। তবে দাহন-ক্রিয়া করিবে।

শিষ্য। সে কি প্রকারে করিতে হয়?

গুরু। মন্ত্রের এক এক অক্ষরের আদি, মধ্য ও অন্তে রং এই অগ্নি-বীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং পলাশবীজের তৈলদ্বারা সেই মন্ত্র লিখিয়া স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে। মহাদেব বলিয়াছেন, এই প্রকার করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্র-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই যে সকল ক্রিয়া করিবার বিধান বলিলেন, ইহা অতি সহজ। কোন্ শক্তির বলে মন্ত্র এত শীঘ্র শক্তিমান্ হইয়া উঠে, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল না। যে মন্ত্র পুরশ্চরণরূপ অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ হইল না, তাহা এই সামান্য ক্রিয়াতে কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারিবে?

গুরু। প্রশ্নটি সমীচীনই হইয়াছে। কিন্তু তোমাকে আমি বলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—এই যে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সপ্তক্রিয়ার কথা বলা

হইল, ইহা কোন অভিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির দ্বারায় সম্পন্ন করাইতে হয়। পুরশ্চরণ-ক্রিয়া-দ্বারাতে যাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইল না, বুঝিতে হইবে হয় সে সাধকের ব্রহ্ম-পথ-মুক্তির উপায় হয় নাই, নয় তার গুরুদত্ত মন্ত্র স্বাভাবিক অর্থাৎ তাহার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে মন্ত্র একবার লওয়া হইয়াছে, সে মন্ত্র আর পরিত্যাগ করিতে নাই। শাস্ত্র বলেন, বিবাহিতা নারীর পতি অক্ষম ও অধার্ম্মিক হইলেও যেমন পত্যন্তর গ্রহণে ব্যভিচার ঘটে, নিষ্ফল মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিলেও তদ্রূপ ব্যভিচার ঘটে। অতএব তখনকার কর্ত্তব্য, কোন মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ঐ সপ্ত ক্রিয়ার যে কোন ক্রিয়া করাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া লইবেন। ঐ সকল দ্রব্যাদিদ্বারা ও বীজাদিদ্বারা তিনি সাধকের শরীরে ঐ মন্ত্রেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া দিয়া মন্ত্র চৈতন্য করিয়া দিতে পারেন। এ ক্রিয়া অতি সহজ,—চারি পাঁচ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রের দোষ শান্তি।

শিষ্য। তন্ত্রাদিতে পাঠ করিয়াছি, কোন কোন মন্ত্রে ছিন্নাদি দোষ আছে, এবং দুষ্ট মন্ত্রের জপাদি করিলে, কখনই সে সকল মন্ত্রে সিদ্ধি-লাভ করা যায় না। অতএব, সে দোষের কি প্রকারে শান্তি বিধান করিতে হয়?

গুরু। মন্ত্রের ছিন্নাদি যে সমস্ত দোষ নিরূপিত হইয়াছে, মাতৃকা-বর্ণ-প্রভাবে সেই সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। মাতৃকাবর্ণ দ্বারা

মন্ত্র বা বিদ্যাকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের পূর্ব্বে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের এক একটি বর্ণ পূর্ব্বে এবং এক একটি বর্ণ পরে যোগ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার (কলিতে চারিশত বত্রিশবার) জপ করিবে, তাহা হইলেই মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষের শান্তি হয়, এবং সেই মন্ত্র যথোক্ত ফলপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কেবল অক্ষরযোগে মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ শান্তি হয় কেন?

গুরু। অক্ষরে শব্দ উত্থাপিত করে। মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ এই যে, মন্ত্র সকল বহুদিন হইতে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, যদি কোন ভুল-ভ্রান্তিতে তাহার কোন অংশ পতিত বা ছাড় হইয়া থাকে, তবে কম্পন ঠিক হয় না। কাজেই মন্ত্রজপের উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। অন্য অক্ষরাদির একত্র যোগে জপ করিলে ঐ মন্ত্রের সে দোষের শান্তি হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাকে কম্পনযুক্ত করিয়া লইতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ।

শিষ্য। পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইলে, যে সকল লক্ষণের প্রকাশ পায় বলিয়া আপনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই সকল উপায়ে মন্ত্র সিদ্ধ হইলেও কি সেই লক্ষণ প্রকাশ পায়?

গুরু। হাঁ, তাহাও পাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। মনোরথ-সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। সাধক যখন যে অভিলাষ করে, তখন অক্লেশে সেই অভিলাষ পূর্ণ

হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। দেবতাদর্শন, দেবতার স্বর শ্রবণ, মন্ত্রের ঝঙ্কার-শব্দ-শ্রবণ প্রভৃতি মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে।

মন্ত্রের সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করিলে, মানুষ দেবতাকে দেখিতে পায়, মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে, পরকায়-প্রবেশ, পরপুর প্রবেশ, এবং শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারে, ভূচ্ছিদ্র দর্শন করে এবং পার্থিব-তত্ত্ব জানিতে পারে। এতাদৃশ সিদ্ধ পুরুষের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি হয়, বাহন ভূষণাদি বহুদ্রব্য লাভ হয়, এবং ঈদৃশ ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। রাজা এবং রাজপরিবার বর্গের বশীকরণ করিতে পারে, সর্ব্বস্থানে চমৎকারজনক কার্য্য প্রদর্শন করিয়া সুখে কালযাপন করে। তাদৃশ লোকের দৃষ্টিমাত্র রোগাপহরণ ও বিষ-নিবারণ হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রে অযত্নসুলভ চতুর্ব্বিধ পাণ্ডিত্য লাভ করে, বিষয়-ভোগের ইচ্ছা থাকে না, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া জন্মে, পরিত্যাগ-শক্তি জন্মে, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস হয়, এবং সর্ব্বজ্ঞতা গুণের স্ফূর্ত্তি হয়। এই সকল গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ। কীর্ত্তি ও বাহন—ভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্ব্বজন-বাৎসল্য, লোক-বশীকরণ, প্রভূত ঐশ্বর্য্য, ধন-সম্পত্তি, পুত্র-দারাদি সম্পদ্ এই সকল গুণ অধম সিদ্ধির লক্ষণ। প্রথম অবস্থায় এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাঁহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শিষ্য। যোগ-সাধনায় আর মন্ত্র-সাধনায় কোন প্রভেদ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। উদ্দেশ্যস্থান একই,—তবে পথের বিভিন্নতা এই মাত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রহশান্তি।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জীবের পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল লইয়া অদৃষ্ট সংগঠিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টবলেই মানুষ সুখী ও দুঃখী হয়। তবে লোকে বলে, আমার গ্রহ এখন ভাল নহে, এখন সময় মন্দ যাইবে,—এখন শুভগ্রহ, এখন যে কার্য্য করিব,—তাহাতে শুভ ফল পাইব, ইত্যাদি। এমন কি, গ্রহের ফলে নাকি জীব শুভাশুভ সমস্ত করিয়া থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ঐ কথারই প্রসঙ্গ আছে। আবার বিরুদ্ধ গ্রহের শান্তি-কার্য্য করিলে, তাঁহারাও শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে কোন্ কথাটা সত্য, তাহা জানিতে চাহি।

গুরু। অদৃষ্টই গ্রহদিগকে ভাগ্যদেবতা গড়াইয়া লয়! যাহার যেমন অদৃষ্ট, গ্রহ দেবতারাও সেই স্থলে দাঁড়াইয়া থাকেন। নতুবা তোমার আমার অদৃষ্টে গ্রহদেবতাগণ একই ভাবে দাঁড়াইতেন। জগতে দুইটি মানুষের কার্য্য এক প্রকারের নহে,—তুমি সহস্র সহস্র মানুষের কোষ্ঠি মিলাইয়া দেখ, দুইজনের কোষ্ঠিও একরূপ দেখিতে পাইবে না।

কোন না কোন বিষয়ে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকিবে। মানুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যেমন পৃথক্,—অদৃষ্টাধিষ্ঠাতা গ্রহদেবতার সমাবেশও তদ্রূপ বিভিন্ন। অতএব, মানুষ যেমন অদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, গ্রহ-দেবতাগণও তাহার রাশিচক্রে তেমনই ভাবে অধিষ্ঠিত হইবেন। অদৃষ্ট আর গ্রহ-দেবতা একই সূত্রে বাঁধা-বাঁধি।

শিষ্য। কর্ম্মফল বা অদৃষ্টকে বিলোপ বা তাহার সংস্কার-সাধন করা কি কাহারও সাধ্যায়ত্ত আছে?

গুরু। তা আছে বৈ কি।

শিষ্য। কাহার আছে?

গুরু। যোগীর—সাধকের। এই সাধনার নামই দৈব বা পুরুষাকার। গ্রহযাগ প্রভৃতি যাহা প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা সাধকগণ গ্রহশান্তি করিতে পারেন। কি করিয়া সে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা বোধ হয়, তোমার শিখিবার প্রয়োজন নাই?

শিষ্য। তাহা শিখিবার প্রয়োজন হইলে, আমি পুরোহিত-দর্পণ পাঠ করিয়া শিখিতে পারিব। আর একটি কথা জানিবার ইচ্ছা আছে।

গুরু। কি বল?

শিষ্য। যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার নাম দৈববাণী,—দৈববাণী কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দৈববাণী প্রকাশ।

গুরু। তুমি দৈববাণী-সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহা ভাল করিয়া বল?

শিষ্য। আমি বলিতেছিলাম যে, অনেক স্থলে শুনিতে পাই, দৈব-

বাণীতে অমুক কথা প্রকাশ পাইল। অনেকের প্রতি দৈবাদেশ হইল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আপনি বলিয়াছেন, দেবতা অদৃষ্টশক্তি।

গুরু। শক্তিভিন্ন জগতে কিছুই নাই,—তুমি আমিও মহাশক্তির মহালীলামাত্র। মানুষ যখন তন্মনা হয়, মানুষের চিত্তবৃত্তি যখন একমুখী হয়, তখন যে দেবতার উপরে তাহাদের চিত্তবৃত্তি একমুখী হয়, তখন সে তাহার বাঞ্ছিত দেবতার নিকটে বাঞ্ছিত আদেশ শুনিতে পাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তুমি যদি চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ একমুখী করিয়া একটি বৃক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে পার, দেখিবে—সেই বৃক্ষই তোমার সহিত কথা কহিবে। ভাবনার মূলকারণ ইচ্ছা। ইচ্ছোদ্রেক না হইলে যখন ভাবনা-প্রবাহ উৎপন্ন হয় না,—তখন অবশ্যই তাহার মূলকারণ ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা-স্রোত যে দিকে লইবে, সেই দিক হইতেই তাহার সাধন-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। জগতটা শব্দের ঝঙ্কার। সমস্ত শক্তিরই ঝঙ্কার বা শব্দ আছে। যে শক্তির উপরে ইচ্ছাশক্তির চালনা করিবে, সেই শক্তির নিকটেই উত্তর পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব দেবতা ও আরাধনা নিষ্ফল নহে। দেবতা ও আরাধনা হিন্দুর পুতুলখেলা নহে। বহির্জগতের কার্য্য কৌশল যেমন যোগ। তদ্রূপ অন্তর্জগতের কার্য্যকৌশলও যোগ। দেবতা ও আরাধনা এই যোগ বা মানস-ক্রিয়ার কৌশল বা যোগও সাধনার প্রথম সোপান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।